আমীন আহম্মেদ চৌধুরী

১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন

একাত্তরের জানুয়ারি-মার্চে ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে কর্মরত কয়েকজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা স্বাধীনতার পক্ষে গোপনে কিছু কাজ করেছেন। এর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এই বইয়ের লেখক, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৎকালীন ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী। পরে তিনি জেড ফোর্সের অধীনে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ বইয়ে তিনি প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধকালের এমন অনেক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, যার কিছু কিছু এই প্রথম লিপিবদ্ধ হলো। এ বই মুক্তিযুদ্ধ ও উত্তরকালের কিছু অজানা অধ্যায় সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহলই মেটাবে।
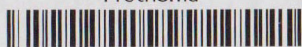
মেজর জেনারেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর সেনাজীবন ছিল গৌরবপূর্ণ। ১৯৭১ সালে তিনি ক্যাপ্টেন হিসেবে চট্টগ্রামে কর্মরত ছিলেন। তখন বাংলাদেশে কর্মরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা অনেকে যৌথভাবে আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও কিছু গোপন তৎপরতায় জড়িত ছিলেন। চট্টগ্রামেও তাঁদের অনেকে এ ধরনের কিছু কর্মকাণ্ড চালিয়েছেন। আমীন আহম্মেদ চৌধুরী সেরকম কিছু কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর দেশের কিছু ঘটনারও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী। এই বইয়ে তিনি সেই সব ঘটনা তুলে ধরেছেন। এমন কিছু ঘটনার কথা তিনি লিখেছেন, যেগুলো এর আগে কেউ লেখেননি। আমীন আহম্মেদ চৌধুরীর এই বইয়ের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি কেবল সেসব ঘটনারই বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার অংশ। বই পড়ে বা কারও কাছ থেকে শুনে তিনি কিছু লেখেননি। এ বই পাঠককে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলোতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।
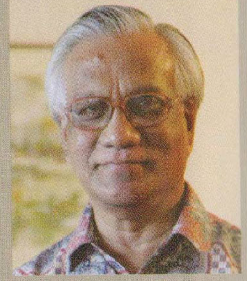
আমীন আহম্মেদ চৌধুরী

জন্ম ১৯৪৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি, ফেনীতে। পৈতৃক নিবাস ফেনী জেলার আনন্দপুর ইউনিয়নের আনন্দপুর গ্রামে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ময়মনসিংহ শহরে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার্স কোর্সে যোগ দেন। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর নেন। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অবস্থায় তিনি মিয়ানমারে বাংলাদেশ দূতাবাসে মিলিটারি অ্যাটাশে (১৯৭৬-৭৭), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (১৯৮৬-৮৯), বাংলাদেশ চা-বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯৮৯-৯২) ও সেনাকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান (১৯৯২-৯৫) ছিলেন । ১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন ওমানে। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় (১৯৮৫), ৬ষ্ঠ (১৯৯৩) ও একাদশ (২০১০) সাফ গেমসের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের ডিসপ্লে প্রদর্শনীর তিনি ছিলেন মূল সংগঠক। ২০১৩ সালের ১৯ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচ্ছদ : **কাইয়ুম চৌধুরী**

১৯৭১ ও আমার সামরিক জীবন

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : সৃষ্টি প্রিন্টার্স
৬/৩ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩২০ টাকা

1971 o Amar Shamorik Jibon
by Major General Amin Ahmed Chowdhury Bir Bikram
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone : 8180078-81
e-mail : prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 320 only

ISBN 978 984 91204 0 7

সূচিপত্র

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগেই পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে যে কজন সেনা অফিসার বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে জেনারেল (তখন ক্যাপ্টেন) আমীন ছিল একজন। এ কারণে তাকে ও ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে আসা হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে সে সেনানিবাস থেকে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল ও ২৫ মার্চ রাতের সেই ভয়াল তাণ্ডব কিছুটা নিজের চোখে দেখেছিল। যা তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। সব সময় সে সেই বিভীষিকার স্মৃতিচারণা করত।

১৯৭৫ সালে আমি নতুন বউ হয়ে শহীদ বেলায়েত রোডের (বীর উত্তম শহীদ বেলায়েত হোসেন ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সালদা নদীতে সম্মুখসমরে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন) বাসায় এলাম। দেখলাম, বাথরুমের সামনে সাদা কাগজের বিরাট এক স্তূপ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এত কাগজ কেন? আমীন বলল, বই লিখব তো, তাই। এর পরই তাঁর রংপুরে পোস্টিং হয়ে গেল। আমি সেই কাগজ বয়ে নিয়ে গেলাম ওখানে। বেশ কয়েকবার ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবে বই লিখতে শুরু করবে? বলত, লিখব লিখব। একদিন খেয়াল করে দেখলাম, কাগজগুলো নষ্ট হওয়ার পথে। আমি ওকে না জানিয়ে সেগুলো বিক্রি করে দিলাম। ও বলল, কী করলে? উত্তরে আমি বললাম, যখন বই লিখবে, তখন আমি কাগজ কিনে দেব।

এরপর চাকরির সুবাদে ঘন ঘন নানা জায়গায় পোস্টিং হওয়ার কারণেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে, বইটি সে লিখতে পারেনি। অবশেষে অবসর নেওয়ার পর আমি বারবার তাগিদ দেওয়ায় লিখতে শুরু করল। ব্যক্তিগত জীবনে আমীন ছিল খুবই আত্মভোলা, বন্ধুবৎসল, সাহসী ও সৃষ্টিশীল ধরনের একজন মানুষ। দেশের জন্য ছিল তার অসম্ভব ভালোবাসা। স্বপ্ন দেখত, এ দেশ একদিন সত্যিকারের সোনার বাংলায়

রূপান্তরিত হবে। অক্লান্ত পরিশ্রমী এই মানুষটির অভিধানে অসম্ভব বলে কোনো কিছু ছিল না। সেনাবাহিনীতে বা অন্যত্র তাকে যখন যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে এবং প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সে ছিল বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন মানুষ। শিল্প-সাহিত্য, ইতিহাস, ক্রীড়া—সব বিষয়ে তার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

তার স্মৃতিশক্তিও ছিল অত্যন্ত প্রখর। ইতিহাসের সাল, দিনক্ষণ সব ছিল তার নখদর্পণে, যা শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম। আয়োজক হিসেবেও ওর ছিল বিশেষ দক্ষতা। তিনটি সাফ গেমসের সফল আয়োজক ছিল সে। তখন দিন-রাত জেগে কাজ করেছেন, সহকর্মীদেরও কাজ করিয়েছে। যাঁরা তার সঙ্গে কাজ করেছে, তাঁরা জানেন কী কাজপাগল মানুষ ছিল সে। আর সকল অবস্থায় দেশই ছিল তার ধ্যানজ্ঞান। দেশে সামান্য রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দিলেও সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ত, রাতভর অস্থিরভাবে পায়চারি করে কাটাত।

জীবন ও রক্তের বিনিময়ে যাঁরা দেশকে স্বাধীন করেছেন, দেশমাতৃকার সেই বীর সন্তানদের স্মৃতি ছিল তার মনের মণিকোঠায়। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা স্মরণীয় করে রাখার তাগিদ বোধ করত সে। ১৯৭২ সালে তার পোস্টিং হয় জয়দেবপুরে। সেখানে সে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেয়। তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। তার মধ্যেও সে শিল্পী আবদুর রাজ্জাককে দিয়ে জয়দেবপুর চৌরাস্তার মোড়ে মুক্তিযোদ্ধার ভাস্কর্য নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। বোধ হয় সেটিই ছিল দেশে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য স্থাপনের প্রথম উদ্যোগ। সেই ভাস্কর্যের পাদদেশে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নাম শ্বেতপাথরে খোদাই করা হয়। সেই সময় শিল্পী আবদুর রাজ্জাক ও তাঁর সহকর্মীরা এ জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। পরে আমীন সিলেট ইনফেনট্রি স্কুলে কমান্ড্যান্টের দায়িত্ব পালনকালে বদলি হলে সিলেট ক্যান্টনমেন্ট গড়ে ওঠে। সেখানেও অসংখ্য গাছ লাগানো ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি শিল্পী আবদুর রাজ্জাক ও হামিদুজ্জামানের নির্মিত দুটি ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়। সাফ গেমসের সময় শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী, মুস্তাফা মনোয়ার, হাশেম খান ও আবদুর রাজ্জাক এবং সুরকার সমর দাস ও আলাউদ্দিন আলীসহ অনেকেই তাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের মতো বন্ধু পাওয়া ছিল আমীনের জন্য সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার।

সৃষ্টিধর্মী কাজের প্রতি তার আগ্রহ ছিল প্রচুর। যখন যেখানে পেরেছে

নতুন কিছু করতে চেষ্টা করেছে। সিলেট ক্যান্টনমেন্টের প্রতিটি ভবন, রাস্তা, তোরণ ও গাছপালা তার চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির ফসল। চাকরিজীবনে চড়াই-উতরাই থাকে, তারও ছিল। কিন্তু সে জন্য তাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। যেকোনো পরিস্থিতিতে সে নিজেকে মানিয়ে নিতে ও ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করতে কখনোই পিছপা হয়নি। তার চিন্তার কেন্দ্রে ছিল সেনাবাহিনীর নিরাপত্তা ও দেশের নিরাপত্তা। নিজের পরিণাম নিয়ে সে ভাবত না। সব সময় অকপটে সত্য কথা বলে ফেলত, সে কারণে অনেক ভুল-বোঝাবুঝিরও শিকার হতে হয়েছে তাকে।

আমীনের মধ্যে সব সময় স্বাধীনতাযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণের চিন্তা কাজ করত। এই লক্ষ্য থেকে সে যখন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের দায়িত্বে তখন স্বাধীন বাংলা বেতারের জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত গানগুলো নতুন করে আবার আপেল মাহমুদ ও অন্য শিল্পীদের দিয়ে ক্যাসেট ও এলপি আকারে প্রকাশ করেছিল। এ ছাড়া সে সময় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের আয়-উন্নতিকল্পে অনেক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা তৈরিরও আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সে।

যাঁদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছে, সেই সূর্যসন্তানদের অবদানের কথা সে লিখেছে তার বইয়ে। জানা-অজানা অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য-সহযোগিতা আর তাদের সবার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়েই এই বই রচিত হয়েছে। অনেকেই সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি ও আমার সন্তানেরা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। প্রসঙ্গত বলতে হয়, বইটি রচনাকালে আমীনকে আমি প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা লে. কর্নেল সাজ্জাদ আলী জহীরের (বীর প্রতীক) সঙ্গে আলোচনা করতে দেখেছি। বইটিতে সব মুক্তিকামী মানুষ, যাঁরা স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছেন, তাঁদের বীরত্বগাথা ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষ একাত্ম হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন। সেদিন কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তাঁরা লড়াই করেননি, মাতৃভূমির প্রতি ভালোবাসাই সেদিন তাঁদের যুদ্ধে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁরা অনেকেই হয়তো ছিলেন কৃষক কিংবা গরিব সাধারণ পরিবারের সন্তান, যাঁদের অনেকেই আর তাঁদের মায়ের কোলে ফিরে যাননি; কোথাও কোনো শিউলিতলায় বা বাঁশঝাড়ের শান্ত-শীতল ছায়ায় ঘুমিয়ে আছেন। আর যাঁরা এখনো বেঁচে আছেন, তাঁরা যদি তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি পান, সেটুকুই হবে তাঁদের কাছে পরম পাওয়া। যেসব মুক্তিযোদ্ধা দেশের আনাচ-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি রইল একজন

মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

একজন দায়িত্বশীল সেনা কর্মকর্তা হিসেবে আমীনকে বাইরের মানুষ যতটা সিরিয়াসরূপে দেখেছে, ঘরে সে ছিল তার একেবারে বিপরীত। খাবারদাবারের বেলায় তার কোনো বিলাসিতা ছিল না। দুধ-কলা-ভাত, বাদাম দেওয়া আইসক্রিম আর ডিম তার খুব পছন্দ ছিল। হয়তো সকালে একটি ডিম খেল, বিকেলে আবার বলল, একটি ডিম চট করে পোঁচ করে নিয়ে এসো তো। আমি বলতাম, দেখো, এখন বয়স হচ্ছে, বেশি ডিম খাওয়া ভালো না। ও বলত, ইসমে ক্যায়া হ্যায়? খাব-দাব, মরে যাব। এখনো কথাগুলো আমার কানে বাজে। ওর ভীষণ পছন্দ ছিল চকলেট, এ ব্যাপারে সে বাচ্চাদেরও হার মানাত। ওর জন্য চকলেট লুকিয়ে রাখতে হতো পরে দেওয়ার জন্য, না হলে মুড়ির মতো চিবোত। অনেক সময় এমনও হতো, ঘরে চকলেট না থাকলেও বিশ্বাস করত না। বলত, তুমি লুকিয়ে রেখেছ, আছে। আমি বলতাম, সত্যি, আর নেই। তোমার জন্যই তো লুকিয়ে রাখি, জানি যখন-তখন তুমি চাইবে। তখন সে এমন অট্টহাসি দিত, যা দেখার মতো—একেবারে বাচ্চাদের মতো। তার সেই প্রাণখোলা হাসি সবার কাছে তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। সেই হাসি এখন শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে, চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছে। আর কোনো দিন ওই হাসিমুখ দেখতে পাব না।

ওর চাকরিজীবন ছিল বিশাল অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। অনেক প্রতিষ্ঠানে চাকরি করার সুযোগ হয়েছিল তার। সৈনিক-জীবনের বাইরেও সমান দক্ষতার সঙ্গে সে কাজ করে গেছে ও নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, চা বোর্ড ও পরে ওমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছে। চা বোর্ডে কাজ করার সময় শ্রীমঙ্গল চা ইনস্টিটিউটকে কীভাবে ঢেলে সাজানো যায়, তা নিয়ে অনেক ভেবেছিল সে। তখন সে অনেককে বন্ধু পেয়েছে, যাঁদেরও অনেকে আজ আর বেঁচে নেই। তাঁদের মধ্যে সদরি ইস্পাহানি, রসুল নিজাম, ডানকান ব্রাদার্সের আবদুস সোবহান ও আহমেদুল কবীরের নাম উল্লেখ্য। আবদুস সোবহানের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়েছে সে।

আমীনকে যখন ওমানে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয় তখন সত্যি আমাদের খুব মন খারাপ হয়েছিল। তার জীবনের শেষ চাকরিতে আমাদের বাইরে কাটাতে হয়েছিল, তবে তা আমাদের জন্য শাপে বর হয়েছিল। কেননা, তার ফলে ছেলে দুটিকে আমরা বাইরে পড়াশোনা করাতে পেরেছি। আর তার ভালো কাজের জন্য ওমানের সুলতান কাবুজ বিন সাঈদের দেওয়া 'আল

নোমান' খেতাব ছিল আমাদের ও বাংলাদেশের জন্য একটি গৌরব। ওই পদক গত ৫০ বছরেও কোনো বাঙালি দূরের কথা, এশিয়ার কোনো রাষ্ট্রদূত পাননি। সেই পদক পাওয়া উপলক্ষে সুলতান আমাকেও দাওয়াত করেছিলেন—যদিও তিনি কোনো এশিয়ান দেশের রাষ্ট্রদূতের স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণত দেখা করতেন না। সেটা আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। আমি ও আমার ছেলেরা সেদিন সত্যিই ওর সৌভাগ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলাম। জীবনের সব কষ্ট ও বঞ্চনা, জীবনে পাওয়া না-পাওয়ার বেদনা পেছনে ফেলে সম্মানের সঙ্গে তার চাকরি থেকে অবসর নেওয়াও ছিল আমাদের জন্য বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। পরম করুণাময়কে এ জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

ব্যক্তিগত জীবনেও আমীন ছিল অতি সাধারণ একজন মানুষ। সংসারী বলতে যা বোঝায় সে তা ছিল না, সবকিছুতেই আমার ওপর নির্ভরশীল ছিল। কারও কোনো সমস্যা বা বিপদ দেখলে নিজের সংসারের প্রয়োজনের কথা না ভেবেই টাকা দিয়ে তাকে সাহায্য করত। তা ছাড়া ও ছিল ভীষণ ভুলোমনা। বন্ধুমহলেও সবাই এটা জানত। এমন সব কাণ্ড করেছে, ভাবা যায় না। একবার সেনাসদর মেসে ইফতার পার্টি ছিল। ও সেখানে পৌঁছে দেখে সবাই সস্ত্রীক গাড়ি থেকে নামছে। ও তখন ড্রাইভারকে বলল, এই মিয়া, তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘোরাও, বাসায় যাও। বাসায় এসে বলল, তাড়াতাড়ি তৈরি হও, তোমারও দাওয়াত আছে। আমি ইফতারি তৈরি করা ছেড়ে যতটা সম্ভব তাড়াহুড়ো করে ওর সঙ্গে গেলাম। তখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল নূর উদ্দীন। সবার সঙ্গে তিনিও তার দেরিতে যাওয়া খেয়াল করেছেন। তিনি বললেন, কী, আমীন আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিল নিশ্চয়ই? আমি হেসে বললাম, হ্যাঁ, সব সময় যা করে থাকে। অনেক সময় নাশতা না করেই সে অফিসে রওনা দিত। তখন আমি জিজ্ঞাসা করতাম, কোথায় যাচ্ছ নাশতা না করে? ও তখন বলত, নাশতা খাইনি?

জেনারেল হারুন আহমেদ চৌধুরী (বীর উত্তম) জেনারেল এম এ জি ওসমানীর মরদেহ নিয়ে লন্ডন থেকে ঢাকায় আসার পর আমীন তাঁকে একদিন বলল, স্যার, আজ রাতে আমার বাসায় ডিনার খাবেন। বেশ তৈরি হয়ে হারুন আহমেদ চৌধুরী রাতে এসে দেখেন, আমরা যথারীতি বাসায় নেই। তিনি ফিরে গেলেন যে বাসায় তিনি উঠেছেন, সেখানে। তাঁরা তো তাঁকে দেখে অবাক। বাসার গৃহকর্তী তাঁকে বললেন, ভাই, এত তাড়াতাড়ি ডিনার শেষ হয়ে গেল আমীন ভাইয়ের বাসার, নাকি না খেয়ে এসেছেন? হারুন আহমেদ চৌধুরী প্রথমে লজ্জায় কিছু বলেননি। পরে যখন ক্ষুধা অনুভব করলেন, তখন

বললেন, আপনাদের ফ্রিজে কি কোনো খাবার আছে? তখন গৃহকর্ত্রী বললেন, আমিও তো তা-ই বলি, এত তাড়াতাড়ি তো ওই বাসা থেকে আপনার আসার কথা নয়, ভাই যা গল্প করে। হারুন আহমেদ চৌধুরী তাঁকে বললেন, আর বোলো না ছোটটার কথা, ও বউকে নিয়ে কোথায় জানি বিয়ে খেতে গেছে, বাসা থেকে বলল। এই নিয়ে হাসাহাসি। জেনারেল হারুন প্রায়ই এই কথা সবাইকে বলতেন, সাবধান! আমীনের বাসায় দাওয়াত দিলে আর ভাবি না জানলে গিয়ে ফিরে আসতে হবে। এরকম অনেককে দাওয়াত দিয়ে আমাকে বলতে ভুলে যেত।

অবসরে সে যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতির আলোচনায় মশগুল হয়ে যেত। বুকের ভেতরে অনেক ক্ষত নিয়ে বলত, কত মায়ের ছেলে, যারা কোনো দিন বন্দুক চোখেও দেখেনি, তারাও কী আত্মবিশ্বাস নিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য বীরদর্পে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; কেউ হয়তো ফিরেছে, কেউ বা ফেরেনি যুদ্ধের ময়দান থেকে। হয়তো তারা কেউ ছিল গরিব কৃষকের একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে, কোথাও কোনো গাঁয়ের বাঁশঝাড়ের তলায় নীরবে ঘুমিয়ে আছে, তার খবর হতভাগী মা কোনো দিন জানতেও পারেনি। বারবার এসব শুনতে শুনতে বলতাম, কেন দেরি করছ, তাড়াতাড়ি লেখা শুরু করো। লিখতে শুরু করার পর এত বেশি ব্যস্ত হয়ে গেল, প্রায়ই নাওয়া-খাওয়ার হুঁশ থাকত না। রাতের পর রাত জেগে লেখা শেষ করল। হয়তো মনের অলক্ষ্যে বুঝতে পেরেছিল তার সময় ফুরিয়ে আসছে। বইটি শেষ করার জন্য সে রাতের পর রাত জেগে থেকেছে, কখন সময় গড়িয়ে যেত তার খেয়াল থাকত না। এমনও হতো, খাবার দিয়ে বারবার ডাকতে হতো, আসছি আসছি করেও কত সময় চলে যেত। তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে, তার জন্যও সময় বের করতে পারত না। বলত, দাঁড়াও, বইটা শেষ হোক, তারপর যাব। মাঝেমধ্যে জানতে চাইতাম, বইয়ের প্রচ্ছদ কি কাইয়ুম চৌধুরী নাকি মুস্তাফা মনোয়ার করবেন।

এ বইয়ে যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবু কিছু ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতা থাকতে পারে। যুদ্ধ-পরবর্তী কিছু ঘটনারও বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা সে করেছে। যথেষ্ট চেষ্টা করেছে সঠিক তথ্য খুঁজে বের করার। আর এ ব্যাপারে অনেকেই তাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমরা ঋণী। মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্ট বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়ায় আমীন বেশ আশ্বস্ত হয়। এ জন্য বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা ট্রাস্টের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সালাহ্‌উদ্দীন আহমদ, সদস্য

পরিচালক মঈদুল হাসানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আরও কৃতজ্ঞ *প্রথম আলোর* সম্পাদক মতিউর রহমান, মুহাম্মদ লুৎফুল হক, রাশেদুর রহমানের কাছে তাঁদের সহযোগিতার জন্য। গ্রন্থটি সফলভাবে সমাপ্ত করতে তরুণ গবেষক ও শিক্ষক মো. হাফিজুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁর সর্বাত্মক সহযোগিতা না পেলে বইটি শেষ করা দুরূহ হয়ে পড়ত।

শেষ করি করি করেও বইটি আমীন দেখে যেতে পারেনি, এটা ভাবতেই আমার হৃদয় হাহাকারে ভরে ওঠে। তবু বইটি যেন সবার হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে, এটাই একমাত্র কাম্য। দেশের সব মুক্তিকামী মানুষ, যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলার স্বাধীনতার জন্য অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা রেখে বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি।

লতিফা আমীন
ঢাকা, নভেম্বর ২০১৫

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায়

আমার দীর্ঘ সামরিক ও বেসামরিক কর্মজীবনে আমি নানা ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাক্ষী। কিছু ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলাম। প্রায়ই আমার মনে হতো, ঘটনাগুলো লিখে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু কোথা থেকে শুরু করব, এ কথা ভাবতে ভাবতেই অনেক দিন পেরিয়ে গেল।

১৯৭১ সাল আমার জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ওই সময় আমি চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে (ইবিআরসি) কর্মরত ছিলাম। তখন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) নিয়ে ছিল একটি দেশ, যার নাম ছিল পাকিস্তান। ১৯৭০ সালে সামরিক শাসনের অধীনে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয় বিপুল ভোটে। কিন্তু সামরিক শাসকেরা আওয়ামী লীগ-প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। এর পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হতে থাকে। আমরা বাঙালি যাঁরা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলাম, তাঁদের বেশির ভাগই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছিলাম। সামরিক শৃঙ্খলার আওতায় থাকার কারণে আমরা প্রকাশ্যে জনগণের আন্দোলনে শামিল হতে পারিনি। তবে অপ্রকাশ্যে এর পক্ষে, বিশেষত সশস্ত্র সংগ্রামের অনুকূলে নানা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

১৯৭১ সালের মার্চের সেই উত্তাল দিনগুলোতে সময় দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। ২৪ মার্চ সকাল আটটা অথবা সাড়ে আটটার দিকে চট্টগ্রামে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে একটা খবর ছড়িয়ে পড়ে। আমরা জানতে পারলাম, বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারকে[১] (এম আর

---

১. এম আর মজুমদার স্বাধীনতার পর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আগমন উপলক্ষে তাঁকে ঢাকায় যেতে হয়েছিল।

মজুমদার) দ্রুত ঢাকায় যেতে হবে। ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কী একটা সমস্যা হয়েছে। সেখানে সৈনিকদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্যই তাঁকে দ্রুত ঢাকায় নেওয়া হচ্ছে, যাতে তাঁরা উত্তেজিত না হয়ে পড়ে। এ ছাড়া ঢাকা সেনানিবাসে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের কনফারেন্সেও তিনি যোগ দেবেন। তাঁকে নেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ইবিআরসিতে একটি হেলিকপ্টার আসছে। আবার আভাস-ইঙ্গিতে এমন কথাও শুনতে পারলাম যে প্রয়োজনে তাঁকে ঢাকায় মার্শাল লর ডিউটি দেওয়া হতে পারে।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তখন পূর্ব পাকিস্তানে সবচেয়ে সিনিয়র বাঙালি সেনা কর্মকর্তা এবং চট্টগ্রাম ইবিআরসির কমান্ড্যান্ট ও স্টেশন কমান্ডার ছিলেন। একই সঙ্গে ৪ মার্চ থেকে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম (বর্তমান রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা) অঞ্চলের সামরিক প্রশাসক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি দ্বিতীয় গ্র্যাজুয়েট কোর্সে কমিশন পান ১৯৪৯ সালে। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে আহত হন এবং TQA খেতাব পান।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হবে—এ খবর দ্রুত ইবিআরসিতে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে, অর্থাৎ বাঙালি সৈনিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড থেকে আমার কাছে একটা টেলিফোন কল আসে। ফোনে জানানো হলো, করাচিতে সিভিল অ্যাভিয়েশনের অধীনে বিমানচালনার প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আমাকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে হাজির হতে হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে নেওয়ার জন্য যে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়েছে, তাতে চেপে আমিও যেন ঢাকায় যাই। এই নির্দেশ পেয়ে আমি দ্রুত কাপড়চোপড় ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র একটা ব্যাগে গোছগাছ করে প্রস্তুত হয়ে থাকি।

কিছুক্ষণ পর একটি হেলিকপ্টার ইবিআরসির প্যারেড গ্রাউন্ডে অবতরণ করে। আরেকটি হেলিকপ্টার পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি) মেজর জেনারেল মিঠাকে (আবু ওসমান মিঠা। সংক্ষেপে এ ও মিঠা) নিয়ে চট্টগ্রাম নেভাল বেইজে অবতরণ করে। ইবিআরসিতে যে হেলিকপ্টার অবতরণ করে, তাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা (পশ্চিম পাকিস্তানি) আসেন। তাঁরা হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ করেন। কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি

বন্দরে যান। তিনি তাঁর সঙ্গে বাঙালি ক্যাপ্টেন মহসিনকেও[২] নিয়ে যান।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়ে দেখেন, মেজর জেনারেল মিঠা সেখানে উপস্থিত। তিনি বন্দরে ভিড়ে থাকা 'সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার জন্য এম আর মজুমদারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। মজুমদার মেজর জেনারেল মিঠাকে বলেন, 'সোয়াত' থেকে এখন অস্ত্রশস্ত্র নামাতে গেলে শ্রমিক ও জনতার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য। এ ক্ষেত্রে উত্তেজিত জনতা যদি জেটি বিধ্বস্ত করে ফেলে বা তাতে অগ্নিসংযোগ করে, তাহলে খাদ্যশস্যসহ হাজার হাজার টন মালামাল বিনষ্ট হবে। উত্তরে উত্তেজিত মিঠা উচ্চস্বরে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে লক্ষ করে বলেন, 'If the fire engulfs the entire country and blood fills the Karnaphuli river, I don't care. I want my arms unloaded.' অর্থাৎ 'আগুন যদি সারা দেশকে গ্রাস করে এবং কর্ণফুলী নদী যদি রক্তে ভেসেও যায়, তাতে আমার কিছুই যায় আসে না। আমি চাই আমার অস্ত্র খালাস হোক।'[৩] এ কথা বলে মিঠা নাকি জোরে টেবিলের ওপর থাপ্পড় মারেন। এতে সেখানে উপস্থিত বাঙালিসহ সবাই, এমনকি পাকিস্তানিরা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে যায়। এ ঘটনা আমি সঙ্গে সঙ্গে জানতে পারিনি। জানতে পারি পরে, মিঠা সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অবশ্য একটা বই[৪] লিখেছেন। সেই বইয়ে ২৪ মার্চ তাঁর চট্টগ্রামে যাওয়ার উল্লেখ একেবারেই নেই। বরং মিঠা লিখেছেন, তিনি রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকায় এসেছিলেন ২৪ মার্চ বিকেলে।

যাহোক, চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পরে মেজর জেনারেল মিঠা নেভাল বেইজে চলে যান। সেখানে আরও কিছুক্ষণ অবস্থান করে চলে যান ঢাকায়। বাকি সেনা কর্মকর্তারা দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য বন্দর থেকে ইবিআরসিতে আসেন। আমাদের আগেই জানানো হয়েছিল ঢাকা থেকে আসা ঊর্ধ্বতন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে ইবিআরসিতেই লাঞ্চ করবেন। সকাল থেকে তাই সেখানকার অফিসার্স মেসে তার প্রস্তুতি চলছিল। আমি ছিলাম এই মেসের সেক্রেটারি। সে জন্য আমি লাঞ্চের তদারকির কাজে কিছুটা সময় ব্যস্ত ছিলাম।

---

২. মহসিন উদ্দীন আহমেদ বীর বিক্রম। পরে ব্রিগেডিয়ার।

৩. *Tormenting Seventy One: An account of Pakistan army's atrocities during Bangladesh Liberation War Of 1971*, edited by Shahriar Kabir, Dhaka 1999

৪. *Unlikely Beginning A Soldier's Life*, Major General A O Mitha, Oxford University Press, p 333-334, Karachi, Pakistan 2003

এদিকে ঢাকা থেকে আসা হেলিকপ্টারটি ইবিআরসিতে অবতরণের কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ট্যাংক এসে প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থান নেয়। সেটি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসা ও অফিসার্স মেস বরাবর ব্যারেল তাক করে থাকে। সিএমএইচের বিপরীতে ইউনিট লাইনের দিকে তাক করে থাকে আরেকটি ট্যাংক। এটা দেখে আমার মনে কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হয়। অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বন্দরে যাওয়ার পর দেড়-দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও তাঁর ফেরার নামগন্ধ নেই। এসব ঘটনায় আমি কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়ি। চট্টগ্রামে তখন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের পর বাঙালিদের মধ্যে দ্বিতীয় সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ছিলেন লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী (মুজিবুর রহমান চৌধুরী। দ্বিতীয় ওটিএস, কমিশন ১৯৫০। তখন ইবিআরসির প্রধান প্রশিক্ষক)। ওই সময় তিনি অসুস্থ অবস্থায় সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি তখন সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে জানাই যে, ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারকে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা কনফারেন্সের নাম করে বন্দরে নিয়ে গেছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা হতে চলল। তিনি এখনো ফেরেননি। আমার মনে হয়, পাকিস্তানিরা তাঁকে বন্দরে আটকে রেখেছে।

লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বললেন, 'তুমি এখনই হেডকোয়ার্টারে চলে যাও। দুই কোম্পানি বাঙালি সেনা প্রস্তুত করো। প্রয়োজন হলে বল প্রয়োগ করবে, যাতে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।' তাঁর নির্দেশ পেয়ে আমি দ্রুত ইবিআরসির হেডকোয়ার্টারে ফিরে আসি। সেখানে পৌঁছে দেখি ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ফিরে এসেছেন। তবে তিনি তাঁর অফিসকক্ষে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের হাতে প্রায় ঘেরাও হয়ে আছেন। কোনো বাঙালি সেনা কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না।

এদিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের ব্যাপারে লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী চিন্তা করবেন বলে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাঁকে ফোন করে মজুমদারের ফিরে আসার খবরটা জানিয়ে দিই। এ সময় তাঁকে আরও জানাই, ঢাকা থেকে আসা পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা এম আর মজুমদারের সঙ্গে দুপুরের খাবার খাবেন। লাঞ্চের পর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমাকে হেলিকপ্টারে করে পাকিস্তানিদের সঙ্গে ঢাকায় যেতে হবে। অসুস্থ লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীকে আমি আরও বললাম, এ অবস্থায় তিনি যেন ইউনিফর্ম পরে ফেলেন। অর্থাৎ ইবিআরসির দায়িত্ব নেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার এবং আমাকে ঢাকায় যাওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হলেও আমি তাঁকে জানালাম, কী কারণে আমাদের দুজনকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা খুব একটা স্পষ্ট নয়। রাতে আমি ঢাকা

সেনানিবাসে থাকব না। গুলশানে আমার এক মামা থাকেন। ৮৪ গুলশান অ্যাভিনিউতে তাঁর বাসায় থাকব। আমার মামার বাসার টেলিফোন নম্বর (সম্ভবত নম্বরটি ছিল ৬০২৯৮৬) কর্নেল এম আর চৌধুরীকে আমি জানিয়ে দিলাম, যাতে প্রয়োজনে তিনি আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে পারেন।

লে. কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অফিসকক্ষের দিকে যাই। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারলাম, তাঁর সঙ্গে কথা বলা প্রায় অসম্ভব। আমি সেখানে এমনভাবে দাঁড়াই, যাতে তিনি আমাকে দেখতে পান। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। ঢাকায় রওনা হওয়ার আগে আমাদের দুজনের মধ্যে একান্তে কথা হওয়ার প্রয়োজন। সে কারণেই আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারলেন। একপর্যায়ে তিনি কায়দা করে বাথরুমের দিকে রওনা হন। তখন ইবিআরসির কমান্ড্যান্টের অফিসকক্ষ-সংলগ্ন বাথরুম ছিল না। তিনি বাথরুমের দিকে রওনা দেওয়ামাত্র আমিও বাথরুমের দিকে যাই। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বাথরুমে ঢুকে জানালা দিয়ে নিচু স্বরে আমাকে বেসরকারি ফোনের মাধ্যমে ঢাকায় ফোন করে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা কর্নেল এম এ জি ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দেন। তিনি আমাকে যা জানাতে বলেন, তা হলো : এই মুহূর্তে যদি তিনি নির্দেশ পালন না করেন, তাহলে সেটা হবে একধরনের বিদ্রোহ। সেটার দায়দায়িত্ব ব্রিগেডিয়ার মজুমদার নিতে রাজি আছেন। তবে স্বয়ং বঙ্গবন্ধুকে বলতে হবে এই নির্দেশ তিনি তামিল করবেন কি করবেন না। আমি রেলওয়ে বোর্ডের ডিএস মকবুল ভাইয়ের (আমার কাজিন) বাসা থেকে টেলিফোনে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং মেসেজ দিয়ে রাখি যে, আমাদের যদি যেতে না হয় তাহলে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে যেন বঙ্গবন্ধু সরাসরি এই আদেশটা দেন। আদেশ দেওয়া না হলে এই আদেশ (সামরিক বাহিনীর) মেনে তিনি ঢাকায় চলে যাবেন এবং সেটা হলে চট্টগ্রামের ওপর আমাদের যে কমান্ড ছিল, কর্তৃত্ব ছিল তা ভেঙে যাবে। বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন কমান্ড ছাড়াই চলতে থাকবে।

ঢাকায় ফোন করার জন্য শহরে যাওয়ার আগে আমি মেজর জিয়া (জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, পরে সেনাপ্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) এবং ক্যাপ্টেন রফিকের (রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, পরে মেজর এবং বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করি। তাঁদের জানাই যে ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার ও আমাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেজর জিয়াকে

জানাই, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন। তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেন ইবিআরসির কমান্ডিং অফিস থেকে দূরে পাহাড়ের ওপারে হোল্ডিং কোম্পানির অফিসে এসে আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার খবর দেন।

মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে কথা বলার পর আমি শহরে যাওয়ার জন্য মার্শাল লর কাজে ব্যবহৃত একটা জিপ নিতে সেনা পরিবহন পুলে যাই। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি, মার্শাল লর কাজে ব্যবহৃত সব সরকারি-বেসরকারি অফিসের গাড়িসহ পাশাপাশি অন্যান্য রিকুইজিশন করা বেসামরিক গাড়ির চাবি পাকিস্তানি রেকর্ড অফিসার ক্যাপ্টেন বেগ নিজের কাছে জমা রেখেছেন। আমি কিছুটা রাগতস্বরে তাঁর কাছ থেকে একটা জিপের চাবি নিই। তারপর দ্রুত জিপ চালিয়ে রেলওয়ে কলোনিতে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মকবুল সাহেবের বাসায় যাই। মিসেস মকবুল আমাকে দেখে খুব চিন্তিত হয়ে বললেন, পুরো শহরে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আপনাকে গ্রেপ্তার করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি বললাম, এখন পর্যন্ত সে ধরনের কোনো আলামত দেখা যায়নি। আমি মিসেস মকবুলকে জানাই, আমি ঢাকায় ফোন করার জন্য এসেছি। মিসেস মকবুল আমাকে এক গ্লাস শরবত খেতে দেন। আমি ওই বাসা থেকে কর্নেল ওসমানীকে ফোন করি। কিন্তু তাঁকে ফোনে পাইনি। তাঁর বাসায় যিনি ফোন ধরেন, তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে আমি বলি কর্নেল ওসমানীকে দ্রুত খবর দিতে। মকবুল সাহেবের বাসার ফোন নম্বরটা তাঁকে দিয়ে বলি, কর্নেল ওসমানী যেন এই নম্বরে ফোন করেন। এখানে তাঁর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ রাখা আছে। ফোনের রিসিভার রেখে আমি কিছুক্ষণ ওই বাসায় অপেক্ষা করি। এর মধ্যে ফোন না আসায় মিসেস মকবুলকে বলি, 'আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কর্নেল ওসমানী যেকোনো সময় আপনাদের বাসার ফোন নম্বরে ফোন করতে পারেন। ফোন পেলে আপনি তাঁকে জানাবেন, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকায় যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন। তিনি এ নির্দেশ পালন করবেন কি করবেন না, সেটা তিনি যেন জানান।' আমি মিসেস মকবুলকে আরেকটা অনুরোধ করি। আমি ঢাকায় যাচ্ছি, এ খবরটা তাঁকে ময়মনসিংহে আমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিতে বলি।

এরপর আমি তাড়াতাড়ি রেজিমেন্টাল সেন্টারে ফেরত যাই। ফিরে মেস সেক্রেটারি হিসেবে আবার লাঞ্চের তদারকি শুরু করি। এ সময় দেখতে পাই, অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক (সিও) কর্নেল জানজুয়া সেখানে উপস্থিত। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর টু আইসি (সেকেন্ড ইন কমান্ড) মেজর জিয়াকে আমি কোথাও দেখেছি কি না? উত্তরে তাঁকে আমি

জানালাম, ইবিআরসির অফিসার ছাড়া শুধু ইউনিট-প্রধানদের এখানে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আমি শহর থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার মেজর রুহুল আমীন, সুবেদার সিরাজ, নায়েব মিজান ও অন্যরা মেসের বাইরে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে। তারা আমাকে বলে যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমি যেন চট্টগ্রামের কমান্ড ছেড়ে ঢাকায় না যাই। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমাকে হেলিকপ্টার থেকে ফেলে দেওয়া হতে পারে। তারা আরও বলল, বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব সৈনিক কোত (অস্ত্র রাখার সুরক্ষিত কক্ষ) থেকে অস্ত্র নিয়ে ওসমানী হিল থেকে শুরু করে আশপাশের সব টিলায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে পজিশন নিয়ে আছে। নির্দেশ পেলে সঙ্গে সঙ্গেই তারা ব্লেন্ডিসাইড দিয়ে ট্যাংক উড়িয়ে দেবে। ট্যাংক রেজিমেন্টের দুজন বাঙালি চালক আগেই বলে রেখেছিল, ইঙ্গিত পেলে তারা ট্যাংকের ইঞ্জিনে বালি দিয়ে দেবে, যাতে ট্যাংক চালু না হয়।

নির্ধারিত সময়ে লাঞ্চ শুরু হয়। ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের সম্মান প্রদর্শনের জন্য অফিসার্স মেসে ব্যান্ড পার্টি উপস্থিত ছিল। তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন বাঙালি। ব্যান্ড পার্টির বাঙালি সদস্যদের পক্ষে একজন আমাদের জানান, তাঁদের পোশাকের ভেতরে তাঁরা অস্ত্র লুকিয়ে ব্যান্ড বাজাচ্ছেন। নির্দেশ দিলে একজন পাকিস্তানি অফিসারও এখান থেকে ফেরত যেতে পারবে না। লাঞ্চে মেজর জেনারেল খাদেম হুসেন রাজা, মেজর জেনারেল ইফতেখার জানজুয়া, ব্রিগেডিয়ার আনসারী (পরে মেজর জেনারেল), কর্নেল তাজ, কর্নেল জানজুয়া (সিও, অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট), পাকিস্তান নৌবাহিনীর চট্টগ্রাম ঘাঁটির কমান্ডার কমোডর মমতাজ, 'বাবর' যুদ্ধজাহাজের কমান্ডার আজিম, চট্টগ্রাম এয়ার বেইজ কমান্ডারসহ ১৭ সিনিয়র পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা এবং ইস্ট বেঙ্গলের অবাঙালি অফিসার শ্রিম্রি, বেগ, বালুচ রেজিমেন্টের সিও ফাতেমিসহ অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা যদি আমাদের আক্রমণে মারা যেতেন, তাহলে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পুরো কমান্ড স্টাকচার ধ্বংস হয়ে যেত।

বিকেল চারটার দিকে ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদার ও আমি হেলিকপ্টারে ওঠার জন্য রওনা হই। এ সময় ইফতেখার জানজুয়া ও খাদিম হোসেন রাজা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। হেলিকপ্টারে ওঠার আগে ইফতেখার জানজুয়ার শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে সুবেদার সিরাজ এসে আমাকে বলল, 'স্যার, আপনাদের মতো বুদ্ধি আমাদের নেই। তবু বলছি, সময় ও সুযোগমতো এই হারামজাদারা আমাদের বলির পাঁঠার মতো জবাই করবে। '৬৫ সালের যুদ্ধে আমরা খেমকারান জয় করেছি। আর আজ আমাদের সামনে দিয়ে আমাদের

কমান্ডারদের নিয়ে যাবে, এ হতেই পারে না। আপনারা যাবেন না। হুকুম দেন সব উড়িয়ে দেব। আমরা লড়াই করে মরব।' তার কথা শুনে প্রচণ্ড অস্থিরতা সত্ত্বেও বিমর্ষভাবেই আমি তাকে বললাম, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলতে পারছি না বলেই আমরা সবাই এতটা অসহায় বোধ করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে কোনো হুকুম না পাচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আগেভাগে কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া ঠিক হবে না।' আমার কথা শুনে রুহুল আমীন ও সিরাজ প্রায় কেঁদে ফেলল।

এদিকে মেজর জিয়াকে আমি খবর দিয়েছিলাম ইবিআরসি হেডকোয়ার্টার-সংলগ্ন হোল্ডিং কোম্পানির হেডকোয়ার্টারে আসার জন্য। তিনি খবর পেয়ে সেখানে আসেন। কিন্তু আমি তখন জানতাম না যে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সেখানে এসে বসে আছেন। তিনি ক্যাপ্টেন এনামের মাধ্যমে আমার কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন এনাম সময়মতো আমাকে খবরটা দিতে পারেননি। হেলিকপ্টারে ওঠার সময় তিনি আমাকে বললেন, মেজর জিয়া আমার জন্য হোল্ডিং কোম্পানিতে ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করে ফেরত চলে গেছেন।

হেলিকপ্টারে উঠে দেখি যে প্রায় এক সেকশন সশস্ত্র কমান্ডো সেনা মেঝেতে বসে আছে। তারা হেলিকপ্টারে অস্ত্র নিয়ে সেই সকাল থেকেই বসে ছিল। এটা আমরা বাঙালিরা জানতাম না। ইবিআরসির সেনারা যদি ব্লেন্ডিসাইট দিয়ে হেলিকপ্টারের ওপর গোলাবর্ষণ করত, তাহলে হেলিকপ্টারের সঙ্গে সঙ্গে ওই এক সেকশন কমান্ডোও নিহত হতো। হেলিকপ্টারে আমরা যে যার নির্দিষ্ট আসনে বসেছিলাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের পাশে বসেছিলেন ইফতেখার জানজুয়া। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর আসনে মাত্রই বসেছেন। এমন সময় জানজুয়া তাঁকে একবার ধাক্কা দেন। এটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, তা জানি না। এরপর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর সিটবেল্ট আরও শক্ত করে আটকে বসেন।

সন্ধ্যা হওয়ার কিছু আগে আমরা ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছাই। এরপর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমাকে ৫৭ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাবের বাসায় নিয়ে যাওয়া হয় (বর্তমান ৫৬ শহীদ বাশার রোড, ঢাকা সেনানিবাস)। জাহানজেব আরবাব আমাকে তাঁর বাসায় থাকার জন্য বললেন। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে ইতিমধ্যেই করাচিতে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন। দেখতে পেলাম, তাঁর বাসার বিরাট লনে তাঁবু খাটিয়ে বহু অবাঙালি পরিবার আস্তানা গেড়ে বসে আছে। জাহানজেব আরবাবকে বললাম, গুলশানে (৮৪ গুলশান অ্যাভিনিউ) আমার মামা রয়েছেন। আমি তাঁর বাসায় থাকব। আমার মামা গাড়ি নিয়ে সেনানিবাসে আসছেন। আমার কথা শুনে আরবাব

বললেন, শহরে থাকাটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং সৈনিকদের জন্য তা মোটেও নিরাপদ নয়। আমি তাঁকে বললাম, শহরে থাকাটা আমার জন্য তেমন ঝুঁকিপূর্ণ হবে না।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের শ্বশুরবাড়ি ছিল গেন্ডারিয়াতে। তিনি রাতে সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কর্নেল তাজ একটা বেসামরিক গাড়ি জাহানজেব আরবাবের বাসায় পাঠিয়েছিলেন। যখন ওই গাড়িটি জাহানজেব আরবাবের বাসায় আসে, তখন আমরা নাশতা করছিলাম। আমাদের জন্য ব্রিগেডিয়ার আরবাব নাশতার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব বললেন, শহরে যেতে হলে কালো পতাকা লাগবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার হেসে তাঁকে বললেন, আজকাল চলাফেরার জন্য দুটি পতাকার প্রয়োজন পড়ে। সেনানিবাসের বাইরে কালো পতাকা, আর সেনানিবাসের ভেতরে পাকিস্তানের পতাকা। তারপর আরবাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এমন কিছু কোরো না যাতে মানুষ তৃতীয় পতাকার দিকে ধাবিত হতে বাধ্য হয়। ব্রিগেডিয়ার আরবাব কিছুটা রাগতস্বরে বললেন, 'মজুমদার, গিভ মি টু কোম্পানিজ। আই ক্যান স্ট্রেইটেন এভরি বডি ইনক্লুডিং ইউর শেখ মুজিব।' অর্থাৎ 'মজুমদার, আমাকে দুই কোম্পানি সৈন্য দাও। আমি তোমার বঙ্গবন্ধুসহ সবাইকে সোজা করে ফেলতে পারব।'

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর ওই কথার উত্তর না দিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। পরে ফিসফিসিয়ে আমাকে বললেন, 'দেখেছ, হারামজাদারা মাত্র দুই কোম্পানি দিয়েই বাংলাদেশ জয়ের কল্পনা করছে।' দুই কোম্পানি মানে ৩০০ ট্রুপস। অর্থাৎ তাদের ধারণাই ছিল যে দুই কোম্পানি সৈন্য (৩০০ জন) একসঙ্গে নিয়ে গেলেই বাঙালিরা ঠান্ডা হয়ে যাবে। এরকম চিন্তাধারা নিয়েই তারা এত বড় সমস্যাকে মোকাবিলা করেছে। যেখানে পরবর্তী সময়ে ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়েও আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। এই ক্যালকুলেশন যারা করতে পারেনি, তাদের ব্রিগেডিয়ার বানানো হয়েছে এবং জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যে দায়িত্ব ও সমস্যা সম্পর্কে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, সেই সমস্যার সমাধান করতে তাদের সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং সেটাই ছিল তাদের জন্য মারাত্মক ভুল। তাঁদের যাঁরা বিজ্ঞ বিশ্লেষক এবং রাজনীতিক ছিলেন, তাঁদের কারও কথাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শোনেনি। তখন সামরিক জান্তার নীতিনির্ধারক সেনা কর্মকর্তাদের সবাই ছিলেন পাকিস্তানি। এঁরা কাগজে-কলমে কেউ লেফটেন্যান্ট জেনারেল, কেউ মেজর জেনারেল বা ব্রিগেডিয়ার পদবির, চিন্তাচেতনার দিক দিয়ে তাঁদের বেশির ভাগই আসলে কোম্পানি কমান্ডারের ওপরে উঠতে পারেননি।

যাহোক, এই ঘটনার কিছুক্ষণ পর আমার মামা ইঞ্জিনিয়ার শাহ আলম চৌধুরী তাঁর নিজের গাড়ি (ভক্সল ভিভা ক ১৫৭) নিয়ে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের বাসায় উপস্থিত হন। প্রহরীরা ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে এ কথা জানালে তিনি তাঁদের আমার মামাকে বাসার ভেতরে পাঠাতে বলেন। মামাকে ব্রিগেডিয়ার আরবাবের সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম। পরে তাঁদের দুজনের মধ্যে সৌজন্য আলাপ হয়। আলাপকালে মামা হঠাৎ অতি উৎসাহে একটা কাগজে তাঁর বাসার ঠিকানা লিখে ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে দিলেন। কীভাবে তাঁর বাসায় যেতে হবে, সে ম্যাপও তিনি ওই কাগজে এঁকে দেন। ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে বাসার ঠিকানা দেওয়াটা ছিল মামার একধরনের বোকামি। কিন্তু এ কথা মামাকে তখন আমি সরাসরি বলতে পারিনি। আমি অবশ্য তাঁকে চোখের ইশারা দিয়েছিলাম। তিনি তা বুঝতে পারেননি।

পরে আমি মামার সঙ্গে তাঁর বাসায় যাই। রাতে খাবার টেবিলে মামার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এ সময় মামা খুব গর্বের সঙ্গে আমাকে বললেন যে জনগণ সামরিক জান্তার নাভিশ্বাস তুলে ছাড়বে। তিনি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বর্তমানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে পাস করেন। ১৯৬১ সালে লন্ডনে এমএসসি করে দেশে ফেরত আসেন। সেতু কেমন করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তার একটা নমুনাও মামা আমার কাছে পেশ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, মামা, আপনি আর্মির ফায়ার পাওয়ার সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন? উত্তরে মামা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'আরে, রাখো তোমার ফায়ার পাওয়ার, আমরা তোমাদের পানিতে মারব, ভাতে মারব... ।'

রাত দশটার দিকে কর্নেল এম আর চৌধুরী আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য মামার বাসায় টেলিফোন করেন। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। তিনিও আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমি তাঁদের জানালাম যে এখন পর্যন্ত ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমাকে আটক করা হয়নি। বরং আমাকে আগামীকাল সাড়ে সাতটায় এয়ার ফোর্সের মেডিকেল বোর্ডে হাজির হতে বলা হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সাড়ে আটটা-নয়টার দিকে জয়দেবপুরে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল ভিজিট করতে যাবেন। কর্নেল চৌধুরীকে আরও বললাম যে ক্যাপ্টেন রফিক যেকোনো সময় পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। তাঁরা যেন ক্যাপ্টেন রফিককে বলেন যে অযাচিতভাবে এখনই তিনি যেন কোনো অঘটন না ঘটান। কাল (২৫ মার্চ) কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে আমি দেখা করব। কর্নেল চৌধুরীকে জানালাম, তাঁর কাছে বার্তা পাঠানো হবে। কর্নেল চৌধুরী ওই দিন রাতে তাঁর খালাতো ভাই রেলওয়ের প্ল্যানিং অফিসার শফির বাসা থেকে

টেলিফোনটা করেছিলেন। এটা আমি তখন জানতাম না। স্বাধীনতার পর জানতে পারি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরে শফিকে তাঁর বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। অকথ্য নির্যাতনের পর হত্যা করে।

আমার টেলিফোন পাওয়ার পর লে. কর্নেল চৌধুরী ও মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন রফিকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে শান্ত থাকার এবং অপেক্ষা করার জন্য উপদেশ দেন। মেজর জিয়ার মাধ্যমে ক্যাপ্টেন রফিককে শান্ত থেকে পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছিলাম, পরবর্তীকালে তা আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে কথা পরের অধ্যায়ে লিখব।

২৪ মার্চ রাতে কর্নেল চৌধুরী তাঁর লাল রঙের ভক্সওয়াগন গাড়িতে মেজর জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শফির বাসায় গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তাঁরা দুজন দেখেন, শহরের বেশির ভাগ সড়কে জনতা ব্যারিকেড দিয়েছে। তাঁরা দুজন ব্যারিকেড সরানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এ অবস্থায় কর্নেল চৌধুরী তাঁর লাল রঙের ভক্সওয়াগন গাড়িটি রেলওয়ে কলোনিতে রেখে আসেন। এরপর তাঁরা হেঁটে ষোলশহর ও সেনানিবাসে ফিরে যান। বস্তুত ২৪ মার্চ রাত থেকেই সারা চট্টগ্রাম শহরে দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হতে থাকে। বিশেষ করে, সেনানিবাস থেকে শহর অভিমুখী এবং শহর থেকে বন্দর হয়ে হালিশহর ও ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবধি। তাতে সেনানিবাস থেকে ষোলশহর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২০ বালুচ রেজিমেন্ট আটকা পড়ে যায়। শহর এলাকা বন্দর থেকে প্রায় আলাদা হয়ে পড়ে। বন্দরে পাকিস্তান নৌবাহিনী তার এলাকায় আবদ্ধ হয়ে থাকে। অন্যদিকে হালিশহরে ইপিআর বাহিনী তার এলাকায় আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

২৫ মার্চ সকালে আমি মামার গাড়িতে করে এয়ার ফোর্স মেডিকেল বোর্ডে হাজির হই। বোর্ড আমাকে ২৭ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় আরাম-আয়েশ করে থাকতে এবং ওই দিন সকালে রিপোর্ট করতে বলে। এরপর আমি গাড়ি নিয়ে সেনানিবাসে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুইদ উদ্দিনের[৫]

---

৫. লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুইদ উদ্দিন আহমেদ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমির (পিএমএ) ১০ নম্বর কোর্সের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নবগঠিত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের পর পাকিস্তান সরকার সেনাবাহিনীর অধীনে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে চারটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এর নাম দেওয়া হয় ন্যাশনাল ব্যাটালিয়ন। ১৯৭০ সালে এর গঠনপ্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আওতায় গঠিত হয়েছিল। মুইদ উদ্দিনের পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

বাসায় যাই। তাঁর বাসায় নাশতার টেবিলে ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এয়ার ফোর্সে মেসে থাকতে হবে ভেবে আমি বেসামরিক পোশাক সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওই বাসায় ইউনিফর্ম খুলে আমি সেই কাপড় পরে ফেলি। পৌনে নয়টার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার জয়দেবপুরের উদ্দেশে রওনা দেন। গাড়িতে ওঠার আগে আমাকে বললেন, লাল ফিতা ওড়ানোর জন্য কর্নেল এম আর চৌধুরীকে বার্তা পাঠাও এবং তুমি এক্ষুনি চট্টগ্রামে ফেরত গিয়ে লাল ফিতা উড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে শামিল হও। তাঁর এ কথায় আমি কিছুটা অবাক হলাম। কারণ, চট্টগ্রামে এটা আমরা আগেই করতে পারতাম। ২৪ মার্চই সেখানে লাল ফিতা ওড়ানোর সুবর্ণ সুযোগ আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চলে যাওয়ার পর আমি কর্নেল ওসমানীর বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি বাসায় নেই। তাঁর বাসার কাজের লোক আমাকে চিনত। সে আমাকে জানাল, কর্নেল ওসমানী এখন ধানমন্ডিতে একটি বাসায় আছেন। সেখানে গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে। লোকটি আমাকে ওই বাসার ঠিকানা দেয়। এরপর আমি ধানমন্ডির ওই বাসায় গিয়ে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করি। আমাকে দেওয়া ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নির্দেশের কথা জানালাম তাঁকে এবং বললাম, লাল ফিতা উড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে আমি চট্টগ্রাম যাচ্ছি। আরও বললাম, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের আরও দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে আপনি চট্টগ্রাম যেতে পারলে আরও ভালো হয়। ওসমানীকে আরও বলি, আপনারা আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে চলেন। যদি আক্রান্ত হই, পাল্টা আক্রমণ করতে পারব। ঢাকায় আমাদের এত ট্রুপস নেই। আমার কথা শুনে তিনি ওই বাসার ওপরের তলায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর নেমে এসে বললেন, আজ (২৫ মার্চ) রাত আটটায় অথবা কাল (২৬ মার্চ) দুপুর একটায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিগত দশ দিনের আলাপ-আলোচনার ওপর ভিত্তি করে দিকনির্দেশনামূলক এক ভাষণ দেবেন। তাই এ মুহূর্তে কোনো হঠকারী বা অবাঞ্ছিত কর্মকাণ্ড করা সমীচীন হবে না। তাঁর এই কথায় আমি কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। মনে মনে চিন্তা করলাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার জয়দেবপুর থেকে ফেরত না আসা পর্যন্ত আমার অপেক্ষা করা উচিত। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম তাঁর সঙ্গে আবার আলাপ করে চট্টগ্রাম যাওয়ার।

এরপর বেলা আনুমানিক সাড়ে দশটার দিকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে যাই। তখন সেখানে ডাকসুর কয়েকজন সদস্য (সম্ভবত আ স ম আবদুর রবও ছিল) উপস্থিত ছিল। তাদের বলি যে তারা যেন জরুরি ভিত্তিতে

এই বক্তব্যসংবলিত একটা লিফলেট ছড়িয়ে দেয় যে সামরিক জান্তা একদিকে বলছে তারা সমঝোতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে, অন্যদিকে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৯ ও ১৬ ডিভিশনের সৈন্য আনা অব্যাহত রেখেছে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে হাজার হাজার মানুষের প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে 'সোয়াত' জাহাজ থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নামানোর জন্য তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে। এর ফলে বন্দরে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে। এই সব কিসের আলামত! পরে জানতে পারি, আমার ওই খবরের ভিত্তিতে ডাকসু দুপুরের মধ্যে একটা জরুরি বুলেটিন বের করে ছাত্র-জনতার মধ্যে বিতরণ করেছিল।

ডাকসু সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে আমি বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ মতিঝিলে হক ম্যানশনে মামার অফিসে যাই। সেখান থেকে (যত দূর মনে পড়ে টেলিফোন নম্বর ২৩২৩২৮ থেকে) চট্টগ্রাম ইবিআরসিতে ফোন করি কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলার জন্য। কিন্তু তাঁকে পাইনি। জানতে পারলাম, ব্যারিকেড সরানোর কাজে তিনি বায়েজিদ বোস্তামি এলাকায় দায়িত্ব পালন করছেন। টেলিফোনে তাঁকে না পেয়ে আমি চট্টগ্রাম রেলওয়ের মকবুল সাহেবের বাসায় ফোন করি। মিসেস মকবুল ফোন ধরেন। তাঁকে জানালাম, কর্নেল এম আর চৌধুরী ও মেজর জিয়া তাঁদের বাসায় আসতে পারেন। কর্নেল চৌধুরী এলে তাঁকে জানাবেন ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বলেছেন, 'লাল ফিতা উড়িয়ে দাও।' মিসেস মকবুল আমার কথাটা বুঝতে পারছিলেন না। মিসেস মকবুলকে বলি, আমি যা বলছি, আপনি তা লিখে রাখেন।

আমার মামা শাহ আলম চৌধুরী তখন অফিসে ছিলেন। তিনি আমার কথা শুনে চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। মিসেস মকবুলের সঙ্গে কথা বলে আমি চট্টগ্রামে ক্যাপ্টেন এনামের ফুফাতো শ্যালক শহীদকে টেলিফোন করি। তাকে বলি, আমি যদি চট্টগ্রামে রওনা দিই তাহলে ফেনীর পর পথে এক জায়গায় আমি অপেক্ষা করব। তুমি তোমার ভেসপা মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে এসে হাটহাজারীমুখী কাঁচা রাস্তা ধরে আমাকে সেনানিবাস এলাকায় পৌঁছে দিতে পারবা কি না? শহীদ ইতস্তত করে বলল, হালিশহর থেকে শুরু করে বন্দর ও শহর এলাকায় রেলের বগি, ট্রাক ও অন্যান্য ভারী জিনিসপত্র দিয়ে দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়েছে। গত রাতে শহরে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়েছে। তার পরও এলে আমি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে আপনাকে কোনো-না-কোনোভাবে সেনানিবাসে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করব।

শহীদের সঙ্গে কথা বলে আমি মামার অফিসেই বসে থাকি। বেলা দুইটা

বা আড়াইটার দিকে আবার ইবিআরসিতে ফোন করি। কর্নেল চৌধুরীকে ফোনে পাই। প্রথমে ফোন ধরেন ইবিআরসি অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন মহসিন। কর্নেল চৌধুরীকে আমি বলি, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার লাল ফিতা উড়িয়ে দিতে বলেছেন। এ কথা শুনে তিনি আমাকে বললেন, 'এই আদেশ ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সরাসরি দিতে হবে।' আমি তাঁকে বললাম, তাহলে আরও দেড়-দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার জয়দেবপুরে আছেন।

কর্নেল চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলে আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। সাড়ে তিন-চারটার দিকে জানতে পারলাম, তিনি জয়দেবপুর থেকে ফিরে ধানমন্ডিতে তাঁর ভাইয়ের বাসায় আছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য সেখানে ফোন করি। ফোন ধরেই তিনি প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেন আমি তখনো চট্টগ্রামে যাইনি বলে। তিনি কিছুটা শান্ত হলে আমি ফোনে কর্নেল ওসমানী আমাকে যে কথা বলেছিলেন, সেটা তাঁকে জানালাম। এ কথা শুনে তিনি আবার রাগতস্বরে বললেন, 'এরা কী চায় কিছুই তো বুঝতে পারলাম না!' এরপর আমাকে বললেন, তিনি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করবেন। তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

সন্ধ্যায় জানতে পারলাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা সেনানিবাসে ১০ বেঙ্গলের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুইদের বাসায় আছেন। তখন আমি সেখানে যাই। গিয়ে দেখি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চট্টগ্রামে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন। এরপর তিনি চট্টগ্রাম সেনা এক্সচেঞ্জকে বললেন তাঁকে এক্সটেনশন ৩৩ মিলিয়ে দিতে। এ নম্বর ছিল কর্নেল চৌধুরীর। কিন্তু তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেননি। এ সময় হঠাৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঢাকা সেনানিবাসের পিএবিএক্স থেকে তাঁকে জানানো হয়, লাইন ডাউন হয়ে গেছে। তারপর তিনি আরও কয়েকবার টেলিফোন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু লাইন আর পাননি।

রাত সাড়ে আটটার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ওই বাড়ি থেকে তাঁর শ্বশুরবাড়ির দিকে চলে গেলেন। আমি মামার যে গাড়িটা নিয়েছিলাম (ক-১৫৭), তার ড্রাইভার ছিল এক বিহারি, নাম আহমেদ। আমি তাকে নিয়ে শহরের দিকে যেতে চাইছিলাম যে শহরে কোনো টেলিফোন থেকে ফোন দেওয়া যায় কি না। আহমেদ বলল, শহরে থমথমে অবস্থা, না যাওয়াই ভালো। বাসায় চলে যাওয়াই ভালো হবে। সাড়ে নয়টার দিকে আমি আমার মামার গুলশানের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, পুরো সেনানিবাস ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা। রাত ১২টার দিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুধু পায়চারি করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না। মনে মনে চিন্তা

করতে লাগলাম, আমাদের এত দৌড়াদৌড়ি, এত প্রচেষ্টা—সবকিছু ভেস্তে গেল। পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সময়মতো জ্বলে ওঠার জন্য সুস্পষ্ট রাজনৈতিক আদেশ না থাকায় এবং সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করার প্রস্তুতির অভাবে একনিমেষে ঢাকা শহর নির্জীব হয়ে গেল। অবশ্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও শহরবাসী দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। ঘরে ঘরে প্রতিরোধের আগুনের উত্তাপে উত্তপ্ত হতে থাকে মানুষ। রাতে আমি আর ঘুমাতে পারিনি। সকাল হওয়ার অপেক্ষায় থাকলাম। সারা রাত মনে মনে চিন্তা করলাম আমার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে।

পরে জানতে পারি, ২৫ মার্চ রাত ১২টার দিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২০ বালুচ রেজিমেন্ট আমাদের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার আক্রমণ করে এবং প্রায় ২৩৫ জন সৈন্যকে মেরে ফেলে, ৯০০ জনের মতো অ্যারেস্ট করে জেলখানায় নিয়ে যায়। আবার ঢাকায় রাত ১০টা থেকে পিলখানায় ২২ এফএফ আমাদের ইপিআরকে নিরস্ত্র করতে থাকে। ইপিআর কন্ট্রোল রুমে মেজর দেলওয়ার ও কুতুবুদ্দীন ইপিআরের ওয়ারলেসে অনবরত মেসেজ পাঠাচ্ছিল যে আমাদেরকে নিরস্ত্র করা হচ্ছে। যে যেখানে আছ, তোমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাকশনে যাও। সাড়ে দশটা পর্যন্ত তারা এই মেসেজ দিতে পারে, তার পর তাদেরও নিরস্ত্র করা হয়। লতিফ বলে একজন ছিল যার সঙ্গে আমার ২৬ তারিখ দেখা হয়। তাকেও নিরস্ত্র করা হয়। দশটার দিকে রফিক চট্টগ্রামে এই মেসেজটাই পান। তখনই তিনি অ্যাকশনে চলে যান। আমাদের মধ্যে তিনিই প্রথম অ্যাকশনে যান এবং পুরোপুরি বিদ্রোহ করেন। উনি ওয়ারলেসে মেসেজ পাঠান 'Bring some wood for me'। এই মেসেজটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীন সবাই বিদ্রোহ করে। আমাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন রফিক তার সব ইউনিটে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন, আমাদের আঘাত করলে পাল্টা আঘাত করবো। তাঁর মেসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার যার জায়গা থেকে কাপ্তাই, রাঙামাটি—যে যেখানে ছিল সবাই বিদ্রোহ করে। তিনি নিজে হালিশহরে তার অফিসারদের অ্যারেস্ট করেন এবং ডিফেন্সে চলে যান টাইগার পাসের রেলওয়ে ক্লাবে।

এদিকে ১০টার পরে মেজর জিয়াকে তার সিও কর্নেল জানজুয়া চট্টগ্রাম বন্দরে পাঠান 'সোয়াত' আনলোড করার জন্য। অর্থাৎ সেখানে মেজর জিয়া নিরস্ত্রভাবে যাবেন এবং তাঁকে মেরে ফেলা হবে—এই হলো উদ্দেশ্য। তাঁকে নেভির গাড়িতে করে বন্দরের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়, কিন্তু দেওয়ানহাটের কাছে রেলের বগি দিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং সেখানে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। এর মধ্যে, সাড়ে দশটার পর প্রথমবারের মতো স্ট্যান্ডার্ড

ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার আবদুল কাদের ফোন করেন, কথা বলেন ক্যাপ্টেন অলির (বীর বিক্রম অলি আহমদ। পরে কর্নেল, বর্তমানে রাজনীতিবিদ) সঙ্গে। তিনি বলেন, ঢাকায় ক্র্যাকডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে, আর্মি মুভ করা আরম্ভ করেছে, আপনারা যে যা পারেন তাই নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যান। এ কথা জেনে ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান (৩৬ পিএমএ, পরে ব্রিগেডিয়ার) জিপে করে দেওয়ানহাটে এসে মেজর জিয়াকে রাস্তায় অপেক্ষা করতে দেখেন। মেজর জিয়া দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেন খালেক জিয়াকে বললেন, 'স্যার, ঢাকায় ক্র্যাকডাউন শুরু হয়ে গেছে, আপনি বন্দরের দিকে যাবেন না। আমি আপনাকে ইউনিট লাইনে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।' এ কথা শুনে মেজর জিয়া এক হাত দিয়ে অন্য হাতে মুষ্টাঘাত করে বললেন 'we will revolt'। মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামানকে সেখান থেকে চলে যেতে বলেন; তিনি বাকিদের নিয়ে আসছেন।

মেজর জিয়া পাকিস্তানিদের বলেন যে ওনার সিও কর্নেল জানজুয়া তাঁদের সবাইকে ইউনিটে ফেরত যেতে বলেছেন। তাই সবাই ফিরে গেলেন। ফিরে এসে ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান ও মেজর জিয়া সেপাইদের সঙ্গে নিয়ে পাকিস্তানিদের অ্যারেস্ট করেন। এরপর সবাইকে জড়ো করে ক্যাপ্টেন অলি, মেজর শওকত আলীসহ সকলকে বললেন, 'আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মানুষের পক্ষে অস্ত্র ধরব, যারা আমার সঙ্গে আছ, হাত তোলো।' সবাই হাত তুললে তিনি সবাইকে শপথ করান—আমরা সবাই আল্লাহর নামে শপথ করছি যে দেশের স্বাধীনতার জন্য, মানুষের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। এরপর তিনি চট্টগ্রামে কয়েকজনকেও ফোনে জানান, আমরা বিদ্রোহ করেছি। আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

সবকিছু করতে সাড়ে বারোটা-একটা বেজে যায়। কাপ্তাই থেকে ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী (বীর উত্তম, ৩৬ পিএমএ, পরবর্তী মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত) ট্রুপস নিয়ে এসে কালুরঘাটে মেজর জিয়ার সঙ্গে যোগ দেন পরদিন ভোরে (২৬ মার্চ)। এই ফোর্সই শেষ পর্যন্ত ৮ম বেঙ্গলের প্রধান ফোর্স হয়ে দাঁড়ায়। ২৫ মার্চ ১২টার দিকে প্রায় ১৫০ ট্রুপসকে চট্টগ্রাম বন্দরে হত্যা করা হয়। তা ছাড়া ইবিআরসিতে আরও ২৩৫ ট্রুপসকে হত্যা করা হয়। মেজর জিয়ার কাছে সৈন্য এবং অস্ত্র কোনোটাই তেমন ছিল না। তাই কাপ্তাই থেকে আসা ইপিআর ইউনিটটি একটা বিরাট ফোর্স হিসেবে কাজ করে। ওনারা পরে কালুরঘাট ব্রিজে পজিশন নেন। পরে মেজর জিয়া বোয়ালখালিতে চলে যান। এসব আমি পরে জানতে পেরেছি।

অবরুদ্ধ ঢাকায় কয়েক দিন

২৬ মার্চ সকালে মামার বাসায় রেডিও অন করে জানা গেল, সারা দেশে কারফিউ জারি করা হয়েছে। রাতে ঠিক করেছিলাম সকালেই বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সেটা সম্ভব হলো না। পাকিস্তান রেডিওর খবর শোনার পর মামা শাহ আলম চৌধুরী বললেন নাশতা খেতে। জীবন থেমে থাকে না। তাঁর সঙ্গে টেবিলে নাশতা খেতে বসলাম। মামা আমাকে বললেন, মুজিব একজন অর্বাচীন রাজনীতিবিদ। পাঞ্জাবিদের সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল। এখন তো আমাদের পাঞ্জাবিদের গোলাম বানিয়ে ছাড়ল। পরবর্তী সময়ে আমার মামা শাহ আলম চৌধুরী তাঁর বিহারি ড্রাইভার আহমেদের কাছ থেকে জানতে পারেন, ২৫ তারিখ সকালে আমি কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করেছি। তখন মামা ওই ড্রাইভারকে বিশেষভাবে বলে রাখলেন সে যেন এসব কথাবার্তা আর কাউকে না বলে। ওই বিহারি হয়তো মামার অনুরোধ রেখেছিল।

২৬ মার্চ কারফিউয়ের মধ্যেই আমি সকাল নয়টার দিকে মামার বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। গুলশান ২ নম্বরে খেলার মাঠের কাছে পার্কে ছিল আর্মি ক্যাম্প। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। সেখানে দায়িত্ব পালনরত লেফটেন্যান্ট হাফিজকে বললাম, সেনানিবাসের ভেতরে সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুইদের বাসায় আমি যেতে চাই। কারণ, তার বাসায় আমি আমার ইউনিফর্মসহ অন্যান্য কাপড়চোপড় রেখে এসেছি। লেফটেন্যান্ট হাফিজ আমাকে কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে বলল। কিছুক্ষণ পর সেখানে আসে পাকিস্তানি কর্নেল আনোয়ার শাহ। সে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলসে (ইপিআর) প্রেষণে ছিল। আনোয়ার শাহ আমাকে সেনানিবাসে যাওয়ার পরিবর্তে শহরে বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার কথা বলল। তার কথার মধ্যে কিছুটা আন্তরিকতার সুর পেলাম। আমার বাবা-মা ময়মনসিংহে থাকতেন।

ঢাকায় মামা ছাড়া আমার নিকটাত্মীয় আর কেউ ছিল না। কিন্তু আমি এই সুযোগটা কাজে লাগালাম। তাকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বড় ভাইয়ের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বললাম, ওখানে আমার চাচা থাকে। আমাকে ওখানে পৌঁছে দিতে বললাম। আনোয়ার শাহ রাজি হলো।

এই সময় সেখানে দেখতে পেলাম ইপিআরে প্রেষণে থাকা বাঙালি ক্যাপ্টেন লতিফকে[৬]। তিনি ঢাকা প্রেসক্লাবের সামনে ইপিআরের একটি দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করছিলেন। কর্নেল আনোয়ার শাহ তাঁকে নিরস্ত্র করে সঙ্গে এনেছে। প্রেসক্লাবের সামনে তখন পুলিশের এসপি ই এ চৌধুরীও কর্তব্যরত ছিলেন। ক্যাপ্টেন লতিফ ফিসফিস করে আমাকে এসব কথা বললেন। তিনি আমাকে আরও বললেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ও ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থান পাকিস্তানিরা প্রায় ধূলিসাৎ করে ফেলেছে। বস্তি এলাকাসহ অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার লোককে সেনাবাহিনী মেরে ফেলে তাদের লাশ গুম করে ফেলেছে বা মাটিচাপা দিয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে অপারেশনের প্রথম প্রহরেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

কিছুক্ষণ পর দেখলাম, পার্শ্ববর্তী বাড়ি থেকে বিয়ার, হুইস্কিসহ একজন অবাঙালি আনোয়ার শাহর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অবাঙালি ব্যক্তিটি সম্ভবত ওই বাড়ির মালিক। ব্যক্তিটি আনোয়ার শাহকে বলল, 'শুন্য হ্যায় চায়নিজ ভি আ গিয়া', অর্থাৎ 'শুনেছি চীনারাও এসে গেছে' বলে একটা পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন দূতাবাসের কয়েকজন দূতাবাস-প্রধান সেখানে এলেন। তাঁদের আনোয়ার শাহ বললেন, নিরাপত্তার কারণে এই মুহূর্তে তাঁদের অফিসে যাওয়া ঠিক হবে না। পরিস্থিতি শান্ত হলে তিনি নিজে তাঁদের অফিসে পৌঁছে দেবেন। সবাই আনোয়ার শাহর কথা শুনে চলে গেলেন। একমাত্র ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার এসে অফিসে যাওয়ার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। একপর্যায়ে তিনি আনোয়ার শাহকে বলেন, 'ডু ইউ নো উইথ হুম ইউ আর টকিং টু?' অর্থাৎ 'তুমি কি জানো, তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?' আনোয়ার শাহ বলেন, 'ইয়েস স্যার।' অর্থাৎ 'জানি স্যার।' ডেপুটি হাইকমিশনার বললেন, 'আই হ্যাভ টু ইনফর্ম মাই গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি', অর্থাৎ 'ঘটনা সম্পর্কে আমাকে আমার সরকারকে জানাতে হবে।' আনোয়ার শাহ বললেন, 'হোয়েন সিচুয়েশন পারমিটস আই অ্যাসিউর ইউ আই উইল এসকর্ট ইউ টু ইউর

---

৬. আবদুল লতিফ। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল।

অফিস। প্লিজ ডু নট ভেঞ্চার টু গো আউট অব গুলশান', অর্থাৎ 'যখন পরিবেশ শান্ত হয়ে আসবে, তখন আমি নিজে গিয়ে আপনাকে আপনার অফিসে পৌঁছে দেব। অনুগ্রহ করে এই মুহূর্তে গুলশানের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।' ডেপুটি হাইকমিশনার বললেন, 'কর্নেল, ইউ ক্যান নট রান দিজ কান্ট্রি ইন দিজ ওয়ে', অর্থাৎ 'কর্নেল, তোমরা এভাবে দেশ চালাতে পারবে না।' তারপর তিনি চলে গেলেন।

এরপর কর্নেল আনোয়ার শাহ আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গে শহরে যেতে। বাঙালি ক্যাপ্টেন লতিফকেও তিনি গাড়িতে নিলেন। আনোয়ার শাহকে বললাম, শহরে যাওয়ার আগে আমি আমার মামার বাসায় যেতে চাই। আনোয়ার শাহ রাজি হলেন। মামা শাহ আলম চৌধুরীর ৮৪ গুলশান অ্যাভিনিউয়ের বাসার সামনে গিয়ে দেখি, জানালার পাশে শিক ধরে হেনা মামি দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁকে বললাম, 'মামি, আপনারা গুলশান ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমার মনে হয় গুলশানই এখন সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।' মামি আমাকে বললেন, 'তুমি কোথায় যাও?' আমি বললাম, 'শহরে যাচ্ছি।' আমার কথা শুনে তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো বলে উঠলেন, 'তোমার মায়ের কাছে আমি কী জবাব দেব?' আমি তাঁকে বললাম, 'বলবেন, আমি ঠিক আছি।' এরপর আমি গাড়িতে উঠে পড়ি।

শহরে যাওয়ার পথে দেখলাম, প্রধান রাস্তা ময়মনসিংহ রোডের (বর্তমান নাম কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ) পাশে আওলাদ হোসেন মার্কেটে তখনো আগুন জ্বলছে। মার্কেটটি গোলার আঘাতে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। রাস্তার ব্যারিকেড দোমড়ানো-মোচড়ানো। আগুনে পুড়ে খাক হওয়া চার-পাঁচটা মৃতদেহ রাস্তার পাশে পড়ে আছে। মার্কেটের ভেতরে ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক দোকানি নিহত হয়েছে বলে মনে হলো। মার্কেটের বাইরে দুজন কমবয়সী ছেলের জ্বলেপুড়ে খাক হওয়া লাশ একেবারে সড়কের পাশেই পড়ে আছে। ডান দিকে গাছ ওপড়ানো। রাস্তায় ট্যাংক চলাচলের সুনির্দিষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল।

গাড়ি আওলাদ হোসেন মার্কেট অতিক্রম করে গেল আজিমপুরের দিকে। হোম ইকোনমিকস কলেজের পাশে রেললাইনের কাছাকাছি যাওয়ার পর গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। রেললাইনের পাশ দিয়ে অসংখ্য বস্তিতে আগুন দেওয়া হয়েছে। তখনো আগুন জ্বলছে। এখানে-ওখানে পড়ে আছে অগণিত লাশ। কর্নেল আনোয়ার শাহর সঙ্গে ছিল ওয়্যারলেস। তার কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিলাম। তাকে ওয়্যারলেসে ইকবাল হলের দিকে না

যাওয়ার জন্য বলা হচ্ছিল। একই সঙ্গে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে প্রায় ১০০ পুলিশের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলার জন্য বার্তা শুনতে পেলাম।

গাড়ি সায়েন্স ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে মিরপুরের দিকে যাওয়ার সময় দেখলাম, সোভিয়েত ইউনিয়নের (এখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে কোনো দেশ নেই। রাশিয়া ও আরও কয়েকটি দেশ নিয়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল চালিকা শক্তি ছিল বর্তমান রাশিয়ার হাতে। ১৯৯০ সালের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়) কনসাল জেনারেলের গাড়ি সৈন্যরা বন্দুক উঁচু করে থামিয়ে রেখেছে। কনসাল জেনারেল কর্নেল আনোয়ার শাহকে বললেন, তাঁর কাছে কারফিউ পাস আছে। আনোয়ার শাহ তাঁকে কিছু না বলেই সামনের দিকে রওনা দিলেন। একটু অগ্রসর হওয়ার পর তাঁর ওয়্যারলেসে বার্তা এল, বড় পাখিকে খাঁচায় পুরে ফেলা হয়েছে, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাই সেনারা আনন্দে গুলি ছুড়ছে। সাধারণত যুদ্ধে জয়ী সেনারা আনন্দে আকাশের দিকে গুলি ছোড়ে। আমি চমকে উঠলে কর্নেল আনোয়ার শাহ আমাকে বললেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

কর্নেল আনোয়ার শাহর মুখে সেনাদের জয়ের কথা শুনে অবাক হলাম। এখন লিখতে গিয়ে বিচারপতি এম আর কায়ানির (মুহাম্মদ রুস্তম কায়ানি) একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের প্রথম দিকে পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৯৬১ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত সিভিল সার্ভিস একাডেমির এক অনুষ্ঠানে সামরিক শাসক আইয়ুব খানের উপস্থিতিতেই তিনি বলেছিলেন, 'দ্য গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেন্ট অব পাকিস্তান আর্মি ইজ দ্যাট ইট হ্যাজ কনকার্ড ইটস ওউন কান্ট্রি', অর্থাৎ, 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবচেয়ে বড় অর্জন হলো, সে তার নিজ দেশ জয় করেছে।' এটা ছিল ঐতিহাসিক এক বক্তব্য। তেমনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশ জয় অভিযান শুরু করে। অথচ মাত্র নয় মাসের মধ্যে যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

যাহোক, কর্নেল আনোয়ার শাহর সঙ্গে শহর প্রদক্ষিণকালে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে বড় বড় ব্যারিকেড সরিয়ে রাখা অবস্থায় দেখলাম। মোড়গুলোতে তখনো ছোপ ছোপ রক্তের দাগ এবং দু-এক জায়গায় মৃতদেহ পড়ে আছে। মিরপুর ফায়ার ব্রিগেড অফিসে গিয়ে আনোয়ার শাহ ক্যাপ্টেন লতিফকে তাঁর বাবার বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সেখানে দেখলাম, ইপিআরের প্রায় ২০০ বাঙালি সদস্যকে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে। ওখানে আওলাদ নামের

একজন পাকিস্তানি মেজরকে দেখলাম। সে আনোয়ার শাহর কাছে রিপোর্ট করে বলল, 'স্যার, আই ওয়েটেড ফর ডন অ্যান্ড ওয়াইপড আউট থ্রি হান্ড্রেড বেংগলি ফ্যামিলিজ' অর্থাৎ 'আমি ভোরের আলোর জন্য অপেক্ষা করেছি এবং ৩০০ বাঙালি পরিবারকে আমি হত্যা করেছি।' আনোয়ার শাহ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিসক্রিয়েন্টস মাস্ট বি কিলড', অর্থাৎ 'দুষ্কৃতকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে।' আমি মাথা নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলাম। আনোয়ার শাহ আমাকে যাতে দুষ্কৃতকারীদের কাতারে শামিল না করেন, সে জন্য আমি এ অভিনয় করলাম। আমার ব্যাপারে তাঁর মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলো না। আনোয়ার শাহ আমাকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বড় ভাই সাজ্জাদ মজুমদারের ধানমন্ডির ১৪ নম্বর সড়কের বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁকে এই বাড়ির ঠিকানাই আমার চাচার বাড়ির ঠিকানা হিসেবে বলেছিলাম। তিনি কোনো সন্দেহ করেননি।

সন্ধ্যার দিকে (সূর্যাস্তের পরপরই) সেনারা রাতের খাবার খায়। তাই ভাবলাম, সূর্যাস্তের পর অন্তত এক ঘণ্টা কোনো প্যাট্রোল পার্টি রাস্তায় টহল দেবে না। আমি সাজ্জাদ মজুমদারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে এবাড়ি-ওবাড়ির আড়াল দিয়ে ৩২ নম্বর সড়কের দিকে রওনা হলাম। সেতু পার হয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছাকাছি গেলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম, বাড়িটির দরজা-জানালা সব খোলা। এমন সময় বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে সেনাবাহিনীর একটি ডজ গাড়ি উপস্থিত হয়। আমি পাশের বাড়ির দেয়াল টপকে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিই। বাড়িওয়ালা আমাকে খেদোক্তির স্বরে বললেন, কারফিউর ভেতরে এদিকে এসেছেন মরবার জন্য? কিছুক্ষণ পর সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাজ্জাদ মজুমদারের বাড়িতে ফিরে আসি।

মিসেস সাজ্জাদ মজুমদার তাঁর তিন মেয়ে ও স্বামীর নিরাপত্তা নিয়ে গভীর শঙ্কা বোধ করছিলেন। তাঁদের বাড়িতে ছিলেন পাকিস্তান কর বিভাগের কর্মকর্তা আবুল হোসেনের স্ত্রী ও তাঁর ছেলেমেয়ে। আবুল হোসেন করাচিতে কর্মরত ছিলেন। মিসেস হোসেনও আমার কাছে তাঁর স্বামীর নিরাপত্তার ব্যাপারে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। সন্ধ্যায় মিসেস সাজ্জাদ মজুমদার আমাকে বললেন, ইয়াহিয়া খান এই ধরনের মিলিটারি অ্যাকশন অনুমোদন করতে পারেন না। ভুট্টো-প্রভাবিত সেনাবাহিনীর কিছু অংশ বর্বরোচিত এই কাজটি করেছে। আমাদের আলাপ-আলোচনা চলতে চলতে রাত আটটা বেজে যায়। রাত আটটার পর ইয়াহিয়া খানের বক্তৃতা শুরু হলে আমরা রেডিওতে তাঁর বক্তৃতা শুনতে থাকি। বক্তৃতা চলার সময় মিসেস মজুমদার

ইয়াহিয়া খানের কথার ধরন শুনে বেশ রেগে যান এবং নিরীহ ফিলিপস রেডিওতে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আঘাত করে বলেন, 'হারামজাদা কয় পেগ মদ খেয়ে বক্তৃতা শুরু করেছে!' তিনি আরও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে রেডিও বন্ধ করে দিলেন। ফলে ইয়াহিয়া খানের পুরো বক্তৃতা আমার শোনা হলো না। সাজ্জাদ মজুমদারের বাড়িতে রাতে থাকলাম।

২৭ মার্চ কারফিউ কয়েক ঘণ্টার জন্য শিথিল করা হলে সাজ্জাদ মজুমদার তাঁর ব্যক্তিগত বন্দুক থানায় জমা দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। আমি তাঁকে বন্দুক জমা না দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললাম, বন্দুক জমা না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তা ছাড়া আপনি সরকারি কর্মকর্তা। আপনার ক্ষেত্রে এ বাধ্যবাধকতা প্রযোজ্য নয়। মিসেস মজুমদার আমার বক্তব্য সমর্থন করলেন। এরপর আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে আবার ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে যাই। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির কাছে অনেক লোকের মধ্যে মামাতো ভাই রেশাদ ও ময়মনসিংহের আনুর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তারা বলল, একটা ক্যামেরা জোগাড় করে ফটো তুলতে হবে। তাদের নিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির সামনে যাই। বাড়ির সামনে পড়ে ছিল একটি উইলি জিপ, একটি ভক্সওয়াগন ও একটি টয়োটা গাড়ি। সব গাড়িতে গুলির চিহ্ন। উইলি জিপের উইন্ডস্ক্রিন গুলির আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ। খালি বাড়িতে জনমানবের চিহ্ন নেই। দুয়ারগুলো খোলা অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। বেশ কিছু উৎসুক দর্শক ঘুরেফিরে বাড়িটি দেখছে। আশপাশের বাড়িতেও লোকজন নেই।

ওখান থেকে আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গেলাম। ইকবাল হলের (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) পাশে রাস্তার ধারে বেশ কিছু লাশ তখনো পড়ে ছিল। দেখলাম, এক পুলিশ সদস্য (সম্ভবত তার নম্বর ছিল ২৪৩২) একজন ছাত্রের হাত ধরে পড়ে আছে। মৃত। সম্ভবত ১০৬ আরআরের গোলার আঘাতে তারা মারা গেছে। রাস্তায় সর্বত্র রক্তের দাগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারের সিঁড়িতে রক্তের জমাট বাঁধা দাগ। দেখলাম, শিক্ষকদের কেউ কেউ ঠেলাগাড়ি-গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। একটা গ্যারেজের সামনে অনেক রক্ত দেখলাম। একটা কাটা হাত গ্যারেজের দরজার হ্যান্ডেল ধরে আছে। শরীরের বাকি অংশ নেই। ভয়াবহ সব দৃশ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দেখে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা কর্নেল মুইদের সেনানিবাসের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম। এ সময় একজন ভদ্রলোক আমাকে তাঁর গাড়িতে সেনানিবাসের এমপি চেকপোস্ট পর্যন্ত লিফট দিলেন।

তিনি নিজেকে ডাক্তার বলে পরিচয় দিলেন। তাঁর গাড়িতে যাওয়ার সময় তিনি জানালেন, ২৫ তারিখ রাত ১২টার দিকে মহাখালী ওয়্যারলেস স্টেশন থেকে তাঁরা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার বার্তা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ওই ডাক্তার আমাকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের (বর্তমানে সামরিক বিমানঘাঁটি) সামনে নামিয়ে দেন।

স্বাধীনতার পর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের বক্তব্য থেকে এই কথার সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি জানান, প্রকৌশলী নূরুল হক মহাখালী ওয়্যারলেস কলোনিতে থাকতেন। পাকিস্তানিরা ২৫ মার্চ রাতে হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর তিনি এই বার্তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ওয়্যারলেস অপারেটর বাংলাদেশের বিভিন্ন ওয়্যারলেস স্টেশনে জানায়, 'সামরিক জান্তা নিরীহ জনতার ওপর আক্রমণ শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এখন আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। যার যা আছে, তাই হাতে করে সবাইকে নিয়ে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা, ইকবাল হলসহ বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলছে। সবাইকে যুদ্ধে শামিল হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।' মহাখালী ওয়্যারলেস স্টেশন ২৬ তারিখ দুপুর পর্যন্ত বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এরপর সেখানে যায় এবং ওয়্যারলেস স্টেশনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেয়।

যাহোক, তেজগাঁও বিমানবন্দরের সামনে থেকে আমি হেঁটে সেনানিবাসের দিকে রওনা হই। এমপি চেকপোস্টের কাছে ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। এটা আমার জন্য সৌভাগ্যই বলতে হবে। ইউনিফর্ম পরিহিত ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর শ্যালকের গাড়িতে সেনানিবাসের ভেতরে যাচ্ছিলেন। এমপি চেকপোস্টের কাছে আমাকে (তখন আমি সিভিল ড্রেসে ছিলাম) দেখে তিনি তাঁর শ্যালককে গাড়ি থামাতে বলেন। আমি তাঁর সঙ্গে সেনানিবাসে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে যাই। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর শ্যালক এবং আমাকে জি-১ (আই)-এর অফিসে (গোয়েন্দা দপ্তর) বসতে বলেন। তিনি সম্ভবত পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার আল ইদ্রুসের[৭] অফিসে যান। আর আমরা দুজন ওখানে তাঁর অপেক্ষায় বসে

---

৭. ব্রিগেডিয়ার আল ইদ্রুস ছিলেন ভারত ভাগের সময় হায়দরাবাদের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইদ্রুসের ছেলে। হায়দরাবাদ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হলে জেনারেল ইদ্রুস তাঁর সৈন্যসামন্তসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জে এন চৌধুরীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

থাকি। সেদিন ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের স্ত্রী ও সন্তানদের চট্টগ্রাম থেকে হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

আমি জি-১ (আই) অফিসে বসে থাকার সময় বাঙালি ক্যাপ্টেন মাহতাবের (উইং অফিসার) সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে কানে কানে বললেন, তাঁদের যে পিস্তল দেওয়া হয়েছে, তাতে ফায়ারিং পিন নেই। এই সময় বাঙালি ক্যাপ্টেন সালামকে (৩১ পিএমএ। পরে মেজর জেনারেল) একঝলক দেখতে পাই। জি-১ (আই) ছিলেন পাকিস্তানি কর্নেল সিনওয়ারি। একটু পর তিনি তাঁর অফিসকক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার মজুমদার কি সাৎ যো ক্যাপ্টেন আয়া উয়ো কিধার গিয়া', অর্থাৎ 'ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে যে ক্যাপ্টেনটি এসেছে, সে কোথায়?' এ কথা বলে তিনি বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। আমিই সেই ক্যাপ্টেন, এ কথা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের শ্যালক বলতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমি দ্রুত তাঁর হাত চেপে তা বলতে নিষেধ করলাম। সিনওয়ারির অনুপস্থিতিতে আমি দ্রুত ওখান থেকে সরে পড়লাম। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের শ্যালক আমার অনুরোধে আমাকে গাড়িতে করে ওই অফিস থেকে দূরে এক জায়গায় এনে নামিয়ে দিয়ে আবার জি-১ (আই) অফিসে চলে গেলেন। আমি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকি। পরে মিসেস মজুমদার ও তাঁদের সন্তানদের নিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকেও তুলে নিলেন।

যাওয়ার পথে মিসেস মজুমদার ২৫ তারিখ রাত ১২টার পর ২০ বালুচ রেজিমেন্টে কীভাবে ইবিআরসি লাইনসহ তাঁর বাড়ি ও অফিসার্স মেস আক্রমণ করে, তার বর্ণনা দিলেন। বালুচ সেনারা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে বাড়ির একজন ওয়েটারসহ তিনজন গার্ডকে হত্যা করে। এ সময় মিসেস মজুমদার কর্নেল শ্রিঘ্রিকে ফোন করেন। টেলিফোন পেয়ে কর্নেল শ্রিঘ্রি এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। উদ্ধারের পর কর্নেল শ্রিঘ্রি মিসেস মজুমদারকে বলেছিলেন, 'কর্নেল চৌধুরী (এম আর চৌধুরী) বড়া গাধধার নিকলাহ। আওর আভি খোদ লাপাত্তা হ্যায়', অর্থাৎ 'কর্নেল এম আর চৌধুরী একজন বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতক এবং এখন নিজেই লাপাত্তা।' এটা শুনে চমকে উঠলাম। অনুমান করলাম, কর্নেল চৌধুরীকে পাকিস্তানিরা মেরে ফেলেছে।

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকায় এসে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে উঠেছিলেন। তাঁর শ্বশুরের বাড়ি ছিল গেন্ডারিয়ায়। মতিঝিল এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে দিলকুশা এলাকায় নামিয়ে দিলেন। গাড়িতে বলেছিলেন, 'আমীন,

এক কাজ করো, আমেরিকান কনস্যুলেট[৮] অফিসে যাও। নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করো। আমেরিকানদের মনোভাব জানার চেষ্টা করো। আরও জানার চেষ্টা করো যে তারা আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে কি না। আলাপ করে আমার শ্বশুরবাড়িতে আসো।' এরপর তিনি গেন্ডারিয়ার দিকে চলে গেলেন।

কনস্যুলেট অফিসে গার্ডকে নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললাম, কনসাল জেনারেলের সঙ্গে দেখা করব। গার্ড টেলিফোনে কারও সঙ্গে কথা বলল। তারপর আমাকে ভেতরে যেতে বলল। কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাড অফিসে ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমি আর্চার কে ব্লাডকে আমার পরিচয়পত্র দেখিয়ে বললাম যে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার। আমি ডিফেক্ট করেছি। আমি আমার দেশের লোকের জন্য সাহায্য চাচ্ছি। তোমরা আমাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে কি না? তাঁকে বললাম, 'আমেরিকা পাকিস্তানকে যে অস্ত্রপাতি দিয়েছে, তা কি যুদ্ধ করার জন্য দেওয়া হয়েছে, নাকি নিরীহ মানুষ হত্যা করার জন্য?' এ সময় একটি ট্যাংক গড়গড় করে ওই অফিসের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। জানালা দিয়ে ট্যাংকটি তাঁকে দেখিয়ে আমি আবারও বললাম, 'সুসভ্য আমেরিকান নাগরিকেরা কী করে পাকিস্তানকে এই ধরনের অস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দিচ্ছে!'

২৬ মার্চ আমি যা দেখেছি, তা এবং অন্য সব হত্যাযজ্ঞের বিবরণ শুনছিলেন, আর তা কনসাল জেনারেল সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করছিলেন। আমি সরাসরি কনসাল জেনারেল আর্চার কে ব্লাডকে বললাম, 'আমেরিকা প্রতিরোধকারী বাঙালিদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে কি না?' উত্তরে কনসাল জেনারেল বললেন, 'আমেরিকান সরকার ও জনগণের ধ্যানধারণা সব সময় এক ধারায় প্রবাহিত হয় না। আমেরিকান সরকারকে বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা ধরনের কৌশল ও কূটনীতি চালাতে হয়। আর অন্য সব দেশের আমজনতার মতোই আমেরিকান জনগণও বিবেক অনুযায়ী তাদের মতামত প্রদান করে। সরকারকে উপেক্ষা করে সহযোগিতার হাত বাড়াতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু সরকার শুধু বিবেকের তাড়নায় বা আবেগে আপ্লুত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। বরং বাস্তবতার নিরিখে স্ট্র্যাটেজিক কারণে এবং বিশ্বরাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ ও ভূমিকার ওপর নির্ভর করে নিতে হয়।

---

৮. তখন আমেরিকান কনস্যুলেট অফিস ছিল মতিঝিলের আদমজী কোর্টে। স্বাধীনতার পর সেখানেই দীর্ঘদিন আমেরিকান দূতাবাস ছিল।

তাই সাধারণ জনগণের মতামত বাংলাদেশের নিরীহ জনগণের দিকে গেলেও আমেরিকার সরকার সেভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে বলে মনে হয় না।' তার পরও আমি বললাম, 'যারা প্রতিরোধযুদ্ধ করছে, তাদের এই মুহূর্তে অস্ত্রের প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে, যারা গোপনে তাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে।' এ কথায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে কনসাল জেনারেল বললেন, 'হোয়্যার ইজ ইউর গভর্নমেন্ট', অর্থাৎ 'তোমাদের সরকার কোথায়?' তাঁর এ কথায় কিছুটা বিব্রত হলাম। মনে মনে ভাবলাম, আসলেই তো, আমাদের এখনো কোনো সরকার গঠিত হয়নি।

কনসাল জেনারেল আমাকে জুস খেতে দিলেন। এ সময় আমি তাঁকে বললাম, 'আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ আপন শক্তিবলে স্বাধীন হবে। তখন বাংলাদেশের মানুষের মনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।' কনসাল জেনারেল আমার কথায় একটু মুচকি হেসে বললেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিবেকবান লোক বাংলাদেশের মঙ্গল কামনায় থাকবে।' বিদায় নেওয়ার সময় বললাম, 'আই হোপ, ইউ উইল নট ইনফর্ম পাক আর্মি অ্যাবাউট মি', অর্থাৎ 'আমি আশা করি, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তুমি আমার ব্যাপারে কিছু জানাবে না।' উত্তরে কনসাল জেনারেল বললেন, 'হ্যাভ আ হার্ট আই অ্যাম আ জেন্টলম্যান টু', অর্থাৎ 'আমিও একজন ভদ্রলোক বৈকি।'

আমেরিকান কনস্যুলেট থেকে বেরিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে রওনা হলাম। বলাকা সিনেমা হলের কাছাকাছি যাওয়ামাত্র প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ পেলাম। আমি দৌড়ে বলাকা সিনেমা হলের পেছনে আশ্রয় নিলাম। পরে জানতে পারলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি দল নিউ মার্কেট কাঁচাবাজারে কসাইদের ওপর গুলি চালিয়েছে। গোলাগুলি করে ওরা চলে গেছে। গুলিতে কয়েকজন কসাই নিহত হয়েছে। তখন কারফিউ শিথিল সময়সীমা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এ অবস্থায় আমি রীতিমতো দৌড়ে এলিফ্যান্ট রোডে প্রিন্সিপাল নুরুল করীমের বাসায় আশ্রয় নিলাম। তিনি সম্পর্কে আমার নানা হতেন এবং ঢাকা কলেজে আমার সরাসরি শিক্ষক ও হোস্টেল সুপার (সাউথ হোস্টেল) ছিলেন। ১৯২০-এর দশকে ফেনী পাইলট স্কুল ও কলেজে তিনি ও আমার বাবা সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী সহপাঠী ছিলেন। তাঁর বাসায় যাওয়ার পরও কিছুক্ষণ পরপর গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ওই বাসায় গিয়ে দেখলাম, গুলি যাতে না লাগে, সে জন্য কাঠের দরজাগুলোর ওপর খাট-পালং, এমনকি লেপ-তোশক দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। সেটা দেখে আমি বললাম, এগুলো দিয়ে গুলি রোধ হবে না। বরং আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে

মাটিতে শুয়ে পড়লে গুলির হাত থেকে বাঁচা যাবে। রাতে আমি নানার ঘরে রাত কাটালাম।

২৮ মার্চ সকালে কারফিউ শিথিল করা হলে কলাবাগানে বশীর উদ্দিন রোডে গেলাম। সেখানে আমার বড় মামা আশরাফ হুসেন চৌধুরী থাকতেন। মামার ছেলে জসিম আমার অনুরোধে একটা ১৫০ সিসি মোটরসাইকেল জোগাড় করল। জসিম বেশ সাহসী ছিল। ওই মোটরসাইকেলে করে আমি ও জসিম গুলশানে যাই। উদ্দেশ্য ভারতের ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করা। হাইকমিশনারের বাড়ির অদূরে মোটরসাইকেল রেখে আমি হেঁটে রওনা হলাম। জসিম সেখানে মোটরসাইকেলের দু-তিনটি পার্টস খুলে নাড়াচাড়া করতে থাকে। যদি সেনা টহল এসে পড়ে অন্তত বলতে পারবে যে তার মোটরসাইকেল বিকল হয়েছে। মেরামত শেষ হলেই চলে যাবে।

ডেপুটি হাইকমিশনারের বাসার গার্ডকে উর্দুতে বললাম, আমি একজন ছাত্র। ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। গার্ড আমাকে বলল, বাঙালি ছাত্র হয়ে এত ভালো উর্দু কী করে বলছেন! সে আমাকে কিছুটা সন্দেহ করলেও শেষ পর্যন্ত ডেপুটি হাইকমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে সক্ষম হই। ড্রয়িংরুমে ডেপুটি হাইকমিশনার সি কে সেনগুপ্ত স্ত্রীসহ বসে ছিলেন। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা ডেপুটি হাইকমিশনারকে কিছুটা চিন্তিত মনে হলো। তাঁকে আমি আমার পরিচয়পত্র দেখালাম। আলাপকালে তিনি আমাকে বললেন, ভারত বাঙালি মুসলমানদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে কি না, সেটা বিরাট এক প্রশ্ন। হাইকমিশনারের স্ত্রী বললেন, পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাই পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিল। এখানে অসংখ্যবার দাঙ্গা হয়েছে। হিন্দুরা বারবার নির্যাতিত হয়েছে। আমাদের পরিবারই[৯] তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হাইকমিশনারের স্ত্রীকে রীতিমতো উদ্বিগ্ন মনে হলো। তাঁরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। জানতে পারলাম, ওই বাড়ির টেলিফোনের সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে। ডেপুটি হাইকমিশনার মি. সেনগুপ্ত কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বললেন, ২৫ মার্চ সকাল সাড়ে নয়টার দিকে তিনি আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের সঙ্গে কথা বলে ইসলামাবাদ হাইকমিশনকে তারবার্তায় জানিয়েছেন, 'স্টিল দেয়ার ইজ

---

৯. ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী সি কে সেনগুপ্ত ও মিসেস সেনগুপ্তার আদি বাড়ি ছিল বাংলাদেশের কুমিল্লায়। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার সময় তাঁরা বাবা-মায়ের সঙ্গে জন্মভূমি কুমিল্লা থেকে এক বস্ত্রে প্রথমে আগরতলা, পরে কলকাতায় চলে যান। সেখানেই তাঁরা বড় হন।

আ রিমোট পসিবিলিটি দ্যাট শেখ মুজিব ইজ বিকামিং পিএম অব পাকিস্তান অর ওয়ার্ডস টু দ্যাট ইফেক্ট', অর্থাৎ 'এখনো শেখ মুজিবের পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে।' আর সেদিনই রাত দশটায় সামরিক অভিযান শুরু হয়। এখন তাঁর চাকরিই থাকবে কি না সন্দেহ। তিনি যদি আগেই আকার-ইঙ্গিতে পাকিস্তানিদের সামরিক পদক্ষেপের বিষয়টি দিল্লিকে জানাতেন, তাহলে অন্তত ভারত সরকার পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সেনাসমাবেশ করে পাকিস্তানি মিলিটারি জান্তাকে চাপের মুখে রাখতে পারত।

ডেপুটি হাইকমিশনার শ্রী সেনগুপ্ত বললেন, ভারতীয় নীতিনির্ধারকেরা গ্রেটার বেঙ্গল কনসেপ্ট নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে, এটা তাঁরা ধারণা করতে পারেননি। এ ছাড়া ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের অধিকাংশই কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক ও উত্তর ভারতবাসী। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ত্রিপুরাবাসী বাংলাদেশ সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল ছিল। পশ্চিমবঙ্গের নকশাল আন্দোলন, নাগাল্যান্ড, আসাম, মেঘালয়, মিজোরামসহ আরও কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দাপট এবং ত্রিপুরা ও এর আশপাশের এলাকায় মাওবাদীদের কারণে ভারত সরকার বিব্রতকর অবস্থায় ছিল। এই অবস্থায় ভারত সরকার বাঙালি মুসলমানের হাতে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে। তবে বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের ভাগ্য কিছুটা সুপ্রসন্ন। কারণ, এই মুহূর্তে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর মতো উদারমনা ও সাহসী একজন মহিলা ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালিদের ব্যাপারে তাঁর যথেষ্ট সম্যক জ্ঞান ও রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে। তাই মানবতার খাতিরে বাঙালিদের সম্মান করতে তিনি এগিয়ে আসতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁকে সময় দিতে হবে।

এরপর আমি শ্রী সেনগুপ্তকে অনুরোধ করলাম তাঁর গাড়িতে করে আমাকে ঢাকার বাইরে নিরাপদ কোনো জায়গায় পৌঁছে দিতে। তিনি বললেন, 'আমার গাড়ি গুলশান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলে সেনাবাহিনী আটকাতে পারে। তুমি নিজ উদ্যোগেই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে যাও।' আমি তাঁকে বললাম, 'ভারতীয় সেনাবাহিনী বা বিএসএফ আমাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে যদি বন্দী করে ফেলে!' শ্রী সেনগুপ্ত আমাকে বললেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রাখবেন। সীমান্ত অতিক্রম করতে পারলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আমার

ব্যাপারে যাতে খোঁজখবর নেয়, তা তিনি নিশ্চিত করবেন। তবে এ জন্য একটি সাংকেতিক চিহ্ন বহন করতে হবে। সেটা নেওয়ার জন্য আমাকে প্রথম সচিবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি ধানমন্ডিতে থাকেন। শ্রী সেনগুপ্ত প্রথম সচিবের বাসার ঠিকানা দিয়ে আমাকে সেখানে যেতে বললেন। আমি প্রথম সচিবের বাসার উদ্দেশে রওনা হলাম। এর আগে মিসেস সেনগুপ্তা আমাকে জুস দিয়ে আপ্যায়িত করেন।

মামাতো ভাই জসিম সাহস করে আমাকে ধানমন্ডিতে নিয়ে গেল। ওই বাড়ি সম্ভবত পুরোনো ২ নম্বর সড়কে ছিল। আমি প্রথমে সাজ্জাদ মজুমদারের বাসায় গেলাম তাঁর ভাই ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারের খোঁজ নিতে। সাজ্জাদ মজুমদার জানালেন, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর বাসায় আসেননি। তিনিও তাঁর কাছে যাননি। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মেজর জিয়া কে?

আমি বললাম, কেন, কী হয়েছে?

সাজ্জাদ মজুমদার বললেন, তাঁর ভয়েস আমি শুনেছি, উনি রেডিওতে ভাষণ দিয়েছেন।

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠে বললাম, তাই নাকি!

এরপর আমি প্রথম সচিবের বাড়িতে যাই। প্রথমে তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে আমি আমার পরিচয় দিলাম এবং কেন এসেছি, তা জানালাম। তিনি প্রথম সচিবের কাছে খবর পাঠালেন। একটু পর প্রথম সচিব একজন অবাঙালি ভারতীয়কে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। প্রথম সচিব আমাকে একটি লাল ক্রসচিহ্ন-সংবলিত সাদামাটা কাগজ দিয়ে বললেন সেটি যত্ন করে রাখতে। কাগজটি দিলেন সীমান্তে বিএসএফকে এবং ভারতে প্রবেশের পর সামরিক বা সরকারি সংশ্লিষ্ট লোকজনকে দেখানোর জন্য। ওই বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে প্রথম সচিবের স্ত্রী আমাকে ডিম সেদ্ধ, ডালসহ ভাত খেতে দিলেন। খাওয়ার সময় প্রথম সচিবের মেয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, 'শেখ মুজিব তাদের বাসায় এসে পড়লে তারা তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দিতে পারত। এখন এই বর্বর পাঞ্জাবিরা তাঁকে মেরে ফেলবে।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাদের কাছ থেকে অস্ত্র চাচ্ছেন? দুই দিকের পাঞ্জাবিরা একত্র হয়ে বাঙালিদের একেবারে পিষে ফেলবে।' এ কথা বলে আবারও অঝোরে কাঁদতে থাকল। প্রথম সচিবের ওই মেয়ের নাম ছিল সম্ভবত কৃষ্ণা। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করত। প্রথম সচিবের স্ত্রীর আদি বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। তাঁর স্ত্রী ও তিনি বার্মিজ ভাষা জানতেন।

প্রথম সচিবের বাসা থেকে বেরিয়ে সরাসরি বড় মামা আশরাফ হুসেন

চৌধুরীর বাসায় গেলাম। রাতে মামাতো বোন সদ্য রান্না করা গরম খাবার পরিবেশন করল। ২৫-২৬ মার্চের পর এই প্রথম সুস্থ মনে গরম খাবার খেলাম। এ সময় রেডিও চালু ছিল। আমরা স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনছিলাম। একটু পরে ঘোষণা শুনতে পেলাম। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ভেসে আসছিল, 'আই মেজর জিয়াউর রহমান...।' মেজর জিয়া ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার যে ঘোষণা দিয়েছেন, তা ২৮ মার্চ বারবার পঠিত হচ্ছিল। পাঠ করছিল লে. শমসের মবিন চৌধুরী (বীর বিক্রম, ৪১ পিএমএ, পরে মেজর ও রাষ্ট্রদূত, বর্তমানে রাজনীতিক) এ ঘোষণা শুনে আমরা উজ্জীবিত হলাম।

এদিকে ২৮ মার্চ বিকেল থেকেই আমার বন্ধু প্রকৌশলী ফিরোজ আমাকে ঢাকা থেকে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু গাড়ি না পাওয়ায় তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ২৯ মার্চ সকাল থেকেই আমি ঢাকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করলাম। দুপুরে আমার এক মামা চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ের নাহেরপুর চৌধুরী বাড়ির ছেলে আলাউদ্দীন চৌধুরী (দুলু মামা) আমাকে তাঁর মোটরসাইকেলে করে ভারতীয় সীমান্তে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডেমরা ফেরিঘাটের উদ্দেশে দুপুর নাগাদ রওনা দিলেন। যাওয়ার পথে গেন্ডারিয়াতে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের শ্বশুরবাড়িতে গেলাম। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা। গিয়ে শুনলাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে আগেই গ্রেপ্তার করে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে গেছে। ফলে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। পরে জানতে পারি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে সেনানিবাসে আটকে রেখেছে।

ডেমরা ফেরিঘাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থাকতে পারে, এই আশঙ্কায় আমি মামাকে বললাম আরও উত্তর দিকে নৌকা দিয়ে ফেরি পার হতে। ফেরিঘাট থেকে বেশ দূরে এক জায়গায় আমরা নৌকা দিয়ে নদী পার হলাম। তারপর গ্রামের আলের ওপর দিয়ে মোটরসাইকেল চালিয়ে আমরা আবার প্রধান সড়কে উঠলাম। আমরা দেখলাম, হাজার হাজার লোক ঢাকা থেকে পালিয়ে গ্রামের দিকে রওনা হয়েছে। মাথায় পোঁটলাপুঁটলি, সঙ্গে পরিবার-পরিজনসহ অগণিত মানুষের কাফেলা হেঁটে চলেছে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে। ভীতসন্ত্রস্ত মানুষ পাকিস্তানের হানাদার সেনাবাহিনীর নৃশংস বর্বরতার শিকার হয়ে আপন দেশেই উদ্বাস্তু হয়েছে। রাস্তার ধারে হাজার হাজার গ্রামবাসী চিড়া, মুড়ি, গুড়, ডাব, পানি ইত্যাদি দিয়ে মানুষজনকে আপ্যায়ন করছে। কোথাও কোথাও পরিশ্রান্ত মানুষ গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছে।

একদিকে দুর্গত মানুষের হাহাকার, আরেকদিকে আর্তমানবতার সেবায় উদ্ভাসিত গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ। ধনী-দরিদ্র, শহুরে ও গ্রামবাসী সবাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে এক কাতারে শামিল। কেউ কেউ পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। নিরীহ ও নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের অমিত শক্তি প্রদর্শনের এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। তাদের মুখে ছিল না ভাষা, কিন্তু চোখে ছিল আগুন।

কুমিল্লা সেনানিবাসকে পাশ কাটিয়ে রাতে আমি ও আলাউদ্দীন মামা বরুড়া থানার এক গ্রামে পৌঁছালাম। সেখানে এক রিকশাওয়ালার বাড়িতে রাতে আমরা থাকলাম। দেখতে পেলাম, ওই গ্রাম এবং আশপাশের এলাকার বিভিন্ন বাড়ির আঙিনা ও উঠানে অসংখ্য উদ্বাস্তু পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। যে বাড়িতে আমরা আশ্রয় নিলাম, সেই বাড়ির লোকেরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে মাছসহ রাতের খাবার খেতে দিল। তারা আমাদের উঠানের পাশে শণের ছাউনির নিচে শুতে দিল। কোনো বালিশ ছিল না। আমরা মাথার নিচে ইট রেখে ঘুমালাম। পরদিন লাকসাম হয়ে ফেনী পৌঁছালাম। যাওয়ার পথে জলসকরাতে যাই। সেখানে ছিলেন রেলওয়ে অফিসার মকবুল সাহেবের বড় ভাই। তাঁকে চট্টগ্রামে মকবুল সাহেবের খবর নেওয়ার জন্য বললাম। পরে জানতে পারি, ক্র্যাক ডাউনের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী রেলওয়ে অফিসার মকবুল আহমেদকে আটক করার জন্য তাঁর বাসা ও অফিসে হানা দেয়। অল্পের জন্য ধরতে পারেনি। তিনি তার আগেই গা ঢাকা দেন। তাই প্রাণে বেঁচে যান। স্বাধীনতার পর তিনি রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে অবসর নেন।

আলাউদ্দীন চৌধুরীকে পরবর্তীকালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। খুব মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হওয়ার আগেই আলাউদ্দীন মামা বুদ্ধি খাটিয়ে সেনাবাহিনীকে বলল যে তার ভাগনে ক্যাপ্টেন আমীন কোয়েটাতে চাকরিরত আছে, তাকে সে কেমন করে বর্ডার পার করে ভারতে পাঠাবে। বস্তুত মামার আরেক ভাগনে আমার কাজিন ক্যাপ্টেন জহিরুল আমীন খান (পরে মেজর জেনারেল, জেড এ খান নামে বেশি পরিচিত) তখন কোয়েটাতে ইনফেন্ট্রি স্কুলে কর্মরত ছিলেন। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান আলাউদ্দীন মামা। পরে এনবিআরের মেম্বার হিসেবে তিনি অবসর নেন।

ফেনীতেই ছিল আমাদের গ্রামের বাড়ি। বাড়িতে পৌঁছে আমি আমার বড় ভাই আজিজ আহম্মদ চৌধুরীকে বললাম, তাঁরা যেন ফেনী ছেড়ে অন্য কোনো অঞ্চলে চলে যান। বড় ভাই বললেন, ফেনী তো স্বাধীন। এ এলাকা

ছেড়ে কোথায় যাব? তারপর তাঁকে ও দাদা হোসেন উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরীকে সালাম করে কেউ কিছু বোঝার আগেই গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। স্থানীয় এমপিএ খাজা আহমদের কাছ থেকে একজন গাইড নিয়ে বর্তমান ফেনী স্টেডিয়ামের পেছন দিয়ে রেললাইন অতিক্রম করে বর্ডার আউট পোস্টে গেলাম। তার আগে ফেনীর ডাকবাংলোতে নোয়াখালীর আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মালেক উকিল (স্বাধীনতার পর মন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার), সরকারি কর্মকর্তা মঞ্জুরুল করিম (স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকারের সচিব) ও অন্যদের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা শুভপুর ব্রিজ দখল ও সেখানে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। সীমান্তে দেখা হলো ইবিআরসি ব্যান্ড পার্টির হাবিলদার বাশারের সঙ্গে। সীমান্তের ওপারে যাওয়ার পর দু-তিনজন হিন্দু ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। তাঁরা আমার বাড়ি কোথায় জানতে চাইলেন। আমি টিলার ওপর দাঁড়িয়ে রেললাইনের ওপারে মাইল তিনেক দূরে আনন্দপুর গ্রাম দেখিয়ে বললাম যে আমি ওই গ্রামের হাসানপুর চৌধুরীবাড়ির ছেলে। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি ওই এলাকার হোসেন উদ্দিন চৌধুরীকে চিনি কি না। বললাম, তিনি আমার দাদা। একজন আমাকে বললেন, তিনি ১৯৪০ সাল থেকে হাসানপুর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার ছিলেন। আর আমার দাদা[১০] ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কয়েক মেয়াদে ৩৭ বছর ইউনিয়ন বোর্ডের (বর্তমানে পরিষদ) প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে চেয়ারম্যান) ছিলেন। দুই টার্ম একজন উকিল প্রেসিডেন্ট হন। তিনি আরও বললেন, ১৯৫০ সালের পর তাঁরা হাসানপুর গ্রাম থেকে ভারতে চলে এসে এই টিলা এলাকায় বসবাস শুরু করেন। এ টিলাগুলো ভারত বিভক্তির আগে আমার দাদাদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। ১৯৫৮ সালের আগ পর্যন্ত তাঁরা টিলা থেকে শণ ও ধানের কিয়দংশ আমার দাদার বাড়িতে পৌঁছে দিতেন। ভদ্রলোক চট করে আমার পকেটে ১০০ ভারতীয় রুপি গুঁজে দিলেন। তখন মনে পড়ল, আমার পকেটে মাত্র পাকিস্তানি দশ টাকা আছে। টাকার ব্যাপারটি আমার আদৌ মনে ছিল না। তখন মনে হলো, কিছু টাকা সঙ্গে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল।

---

১০. আমার দাদা হোসেন উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী ব্রিটিশ আমল থেকে নোয়াখালী জুরিবোর্ডেরও সদস্য ছিলেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন

১৯৭০ সালে আমি চট্টগ্রামে ইবিআরসিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। সে বছর পাকিস্তানে দুটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একটি জাতীয় পরিষদের, অপরটি প্রাদেশিক। নির্বাচন উপলক্ষে আমাকে সীতাকুণ্ড থেকে শুরু করে বর্তমান কক্সবাজার জেলার (তখন চট্টগ্রাম জেলার মহকুমা) বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে হয়।

৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত এলাকার (বৃহত্তর বরিশাল) কয়েকটি আসনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো সারা দেশে (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান) সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং এক উন্নত পদ্ধতির নির্বাচন। নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন পরিচালনা করে। কেউ তাদের কার্যক্রমে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান সামরিক আইন প্রশাসক এবং ভাইস অ্যাডমিরাল আহসান গভর্নর ছিলেন। তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেন। অবশ্য পরে জানা যায়, পাকিস্তানের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) ও কয়েকটি ইসলামি দলকে নির্বাচনী খরচ বাবদ অর্থ দিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে যাঁরা ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের এই অর্থ দেওয়া হয়। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মনে করেছিল, তাদের পছন্দের দলগুলো বড় দুই দল, অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনকালে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য এলাকার মতো চট্টগ্রামেও সেনাসদস্যরা সহায়তা করে। তখন চট্টগ্রামে এক ঘটনা ঘটে। নির্বাচনের দিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন আজিজ রাউজান থেকে ফজলুল কাদের চৌধুরীকে[১১] একটি জিপে এবং তাঁর ছেলেকে একটি পুলিশ ভ্যানে তুলে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে নিয়ে আসে। কারণ, তাঁর লোকজন হিন্দু ভোটার ও তাঁর বিরোধী ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে আসতে বাধা দিচ্ছিল। তাঁর লোকজন কাউকে কাউকে ছুরিকাঘাত পর্যন্ত করে। প্রায় ৩৬ জন ভোটার আহত হয়। এ অবস্থায় কর্তব্যরত ক্যাপ্টেন আজিজ ওই এলাকায় ফজলুল কাদের চৌধুরীকে বলে, 'স্যার, লেট আস গো টু সার্কিট হাউস টু মিট কর্নেল ফাতেমি, হু ইজ ওয়েটিং ফর ইউ' অর্থাৎ, 'স্যার, চলুন সার্কিট হাউসে যাই, সেখানে কর্নেল ফাতেমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' তখন ফজলুল কাদের চৌধুরী গলা উঁচিয়ে বলেন, সোহরাওয়ার্দীর যুক্তফ্রন্ট আমাকে নির্বাচনে পরাজিত করতে পারেনি, আর এই মুজিব আমাকে কী করে নির্বাচনে পরাজিত করবে।

ক্যাপ্টেন আজিজ পুলিশকে ইশারা করেন। পুলিশ ফজলুল কাদের চৌধুরীর সামনেই তাঁর ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভ্যানে তোলে। এরপর ক্যাপ্টেন আজিজ আবারও তাঁকে সার্কিট হাউসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তখন ফজলুল কাদের চৌধুরী বলে ওঠেন, ক্যাপ্টেন, ডোন্ট ট্রাস্ট ড্যাডাস। আজিজ এবার তাঁকে দৃঢ়তার সঙ্গে জিপের দিকে যেতে বলে। এরপর তিনি জিপে ওঠেন। আজিজ তাঁকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়।

ফজলুল কাদের চৌধুরীকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়ার পর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমি ক্যাপ্টেন আজিজের পদক্ষেপকে দারুণভাবে সাপোর্ট করেন। ফজলুল কাদের চৌধুরীকে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আর যেতে দেওয়া হয়নি। তবে রাতেই তাঁকে তাঁর চট্টগ্রাম শহরের বাসায় (চট্টগ্রাম কলেজের বিপরীতে) পৌঁছে দিতে হয়। হাতেগোনা কয়েকটি কেন্দ্র ছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চলের সব নির্বাচনী কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন এবং গণনাকাজ সুসম্পন্ন হয়।

---

১১. মুসলিম লীগের নেতা। আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পিকার ও দিন কয়েকের জন্য অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট। ১৯৭১ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। স্বাধীনতার পর জেলে আটক থাকাবস্থায় মারা যান।

পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে মোট আসন ছিল ৩০০টি। এর মধ্যে ১৬২টি আসন পূর্ব পাকিস্তানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশে ১৩৮টি আসন বরাদ্দ ছিল। ১৩টি মহিলা আসনের মধ্যে ৭টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। ৬টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মহিলা আসনসহ ১৬৭টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপলস পার্টি মহিলা আসনসহ মোট ৮৮টি আসনে জয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৮টি আসনে জয়ী হয়। প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত ১০টি মহিলা আসনের সব আসন লাভ করে। ভোটের এই ফলাফল সামরিক জান্তার সব হিসাব-নিকাশ পাল্টে দেয়।

একাত্তরের উত্তাল মার্চ

নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের কাছে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। শুরু হয় টালবাহানা ও নানা ষড়যন্ত্র। সময় গড়াতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ করে। এ সময় মালিক সরফরাজসহ পশ্চিম পাকিস্তানের বেশ কয়েকজন জননেতা সেখানে উপস্থিত থাকেন। এদিন বাংলাদেশ সময় দুপুর একটা পাঁচ মিনিটে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে জাতীয় পরিষদের আসন্ন অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। ৩ মার্চ ঢাকায় এই অধিবেশন শুরু হওয়ার কথা ছিল। এ জন্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান পিপলস পার্টি ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য দলগুলোর ৪৮ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩ জন সদস্য ঢাকায় এসেছিলেন। এ অবস্থায় ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা যেন বারুদে আগুন লাগাল। মুহূর্তের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান, অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। সমগ্র দেশবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারা দেশের মানুষ যেন রাস্তায় নেমে পড়ে। চট্টগ্রামও এ থেকে পিছিয়ে ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে শহরেও মিছিল বের করা হয়।

স্থানীয় আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও সংগঠন সভা-সমাবেশ করার পর খণ্ড খণ্ড প্রতিবাদ মিছিল বের করতে থাকে। সাধারণ মানুষ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। চট্টগ্রাম সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বেলা তিনটার দিকে আইএস (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) ডিউটি পালনের জন্য ২০ বালুচ রেজিমেন্টের দুই কোম্পানি সেনাকে চট্টগ্রাম শহরে মোতায়েন করে। ২০ বালুচের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমি চট্টগ্রাম সার্কিট

হাউসে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে আইএস ডিউটি পালনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ২০ বালুচের নতুনপাড়া সেনানিবাস থেকে বের হয়ে ত্বরিত প্রস্তুতি গ্রহণ করা দেখে মনে হচ্ছিল, এ ইউনিট আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। তাদের সাহায্য করার জন্য ইবিআরসি থেকে আমার নেতৃত্বে প্রশিক্ষণরত দুই কোম্পানি সেনাকে মোতায়েন করা হলো। সন্ধ্যার দিকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা আমার নেতৃত্বে নিয়াজ স্টেডিয়ামে (বর্তমান নাম এম এ আজিজ স্টেডিয়াম) অবস্থান নিল।

এ সময় আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পরীক্ষার্থী ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর আই চৌধুরীর উৎসাহেই আমি ওই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। ১ মার্চ সকালের সেশনে সামরিক বিধান মোতাবেক ইউনিফর্ম পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইভেট শিক্ষার্থী হিসেবে আমি পরীক্ষা দিচ্ছিলাম। শেষ প্রশ্নোত্তর তখনো শেষ করিনি। রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. অনুপম সেন কানে কানে আমাকে বললেন, 'আপনি এক্ষুনি খাতা জমা করে হলরুম ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে চলে যান।'

আমি বললাম, 'কেন?'

অনুপম সেন বললেন, 'ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণায় ছাত্র-জনতা উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। তারা জঙ্গি মিছিল বের করতে যাচ্ছে। সামরিক জিপ ও ইউনিফর্ম আপনার জন্য মারাত্মক পরিস্থিতি ডেকে আনতে পারে। তাই এক্ষুনি চলে যান।' তিনি আমাকে জিপ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। সেনানিবাসে ফিরে এসে ২০ বালুচের সঙ্গে ডিউটি করার নির্দেশ পেলাম। গান শোনার জন্য আমার একটি রেকর্ড প্লেয়ার ছিল। সেটি সঙ্গে নিয়ে আইএস ডিউটি পালন করার জন্য মেস থেকে বের হয়ে শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুজিবুর রহমান চৌধুরী (এম আর চৌধুরী) আমাকে ডেকে বললেন, 'আমীন, এদিকে আসো'। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার পর বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ? ইয়াহিয়া ইজ অ্যান ইডিয়ট। এ দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। এনামকে বলো মেশিনগানগুলো পরিষ্কার করে রাখতে।' আরও বললেন, 'চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ প্রস্তুত করে রেখো, শেষ পর্যন্ত ওদের (পশ্চিম পাকিস্তানি) বলতে হবে জাহাজ প্রস্তুত আছে, ভাই, চলে যাও।' এম আর চৌধুরী সপরিবারে থাকতেন। মিসেস মুজিব নাশতা পরিবেশন করলেন। পরিবেশনকালে তাঁর স্বামীকে বললেন, 'তোমার নাম মুজিবুর রহমান বলে

তুমি তো শেখ মুজিব নও। এ ধরনের কথা বলে কেন নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছ।' লে. কর্নেল এম আর চৌধুরী আমাকে সাবধান করে বললেন, 'চোখ-কান খুলে ডিউটি করবে এবং আমাকে জানিয়ে রাখবে কী হচ্ছে। কোনো ফায়ারিং-টায়ারিং করবে না। হুকুম দিলেও ফাঁকা ফায়ারিং করবে।' সেদিন চট্টগ্রামে কোতোয়ালি থানাসহ লালদীঘি ময়দান এলাকা এবং বন্দর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলো। ডিসি মুস্তাফিজুর রহমান ও এসপি সামসুল হক জনগণের জানমাল রক্ষায় তাঁদের অধীন পুলিশ ফোর্সকে শহরের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। সিভিল প্রশাসনকে সাহায্য করার জন্য অবাঙালি মেজর ইকবালের নেতৃত্বে এক কোম্পানি ইপিআর নিয়োগ করা হলো।

দুপুর থেকেই চট্টগ্রামের ঝাউতলা, আমতলা, পাহাড়তলী, ফয়'স লেক, ওয়্যারলেস কলোনি, রেলওয়ে কলোনি, শের শাহ ও ফিরোজ শাহ কলোনি, হাফিজ জুট মিল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব জায়গায় প্রচণ্ড উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে। খণ্ড খণ্ড মিছিল বের হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবাদ সভা এবং সভা শেষে বিরাট এক মিছিল বের করে।

২ মার্চ বেলা তিনটার দিকে চট্টগ্রামে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল পলো গ্রাউন্ডের কাছাকাছি পৌঁছালে কে বা কারা মিছিলের ওপর প্রথমে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। এতে তাৎক্ষণিকভাবে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। খবর ছড়িয়ে পড়ে, রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যানের অবাঙালি (বিহারি) গাড়িচালক একটি থি নট থ্রি রাইফেল থেকে গুলিবর্ষণ করেছে। ফলে প্রচণ্ডভাবে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গা শুরু হয়। বেসামরিক ব্যক্তি থ্রি নট থ্রি রাইফেলসহ অন্য অস্ত্রশস্ত্র কীভাবে পেল, তা নিয়ে নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়। পুলিশ সোর্স থেকে খবর পাওয়া গেল, গোয়েন্দা সংস্থাসহ বালুচ রেজিমেন্টের কিছু সেনা (কমান্ডো ট্রুপস) এবং ইপিআরের কিছু অবাঙালি সেনা সাদা পোশাকে গোপনে বিহারিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র বিতরণ করেছে। ইপিআরের পশ্চিম পাকিস্তানি মেজর ইকবালকে কারণে-অকারণে এদিকে-ওদিকে, বিশেষ করে ঝাউতলায় যেতে দেখা গেছে। আরও শোনা গেল, তিনি তাঁর অধীন ইপিআরের সেনাদের আগুন নেভানোর কাজে যাওয়ার সময় অস্ত্র জমা রেখে যেতে বলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশ যুক্তিপূর্ণ হলেও ইপিআরের বাঙালি সেনারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সব সময় অস্ত্র সঙ্গে রাখত। অবসরপ্রাপ্ত অবাঙালি ব্রিগেডিয়ার হাস্কি বেগকেও লোকে সন্দেহ করতে শুরু করে। তিনি চট্টগ্রামে থাকতেন। হাস্কি বেগ বিখ্যাত পলো

খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুল হাসানের প্রথম কমান্ডিং অফিসার। পরবর্তীকালে হাস্কি বেগ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান।

২ ও ৩ মার্চ চট্টগ্রামে নানা ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭ নম্বর জেটিতে অস্ত্রবোঝাই 'সোয়াত' জাহাজ নোঙর করা ছিল। জাহাজটির দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী। সেনা কর্তৃপক্ষ তখন আনলোড করার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বন্দরের শ্রমিকেরা আওয়ামী লীগের শ্রমিকনেতা মান্নানের নেতৃত্বে বন্দর এলাকায় বিশাল প্রতিবাদ মিছিল করেন। 'সোয়াত' জাহাজের নিরাপত্তার জন্য ক্যাপ্টেন আজিজের (৬ ইস্ট বেঙ্গলের অফিসার, ৪র্থ ওয়ার কোর্স) নেতৃত্বে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই প্লাটুন সেনা জেটি ও বন্দর এলাকায় মোতায়েন করা হয়।

বিহারি কিংবা সাদা পোশাকধারীরা দেয়ালের পেছন থেকে, বাড়ির ছাদ থেকে অথবা ঝোপঝাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে পালিয়ে যায়। এর ফলে আইনশৃঙ্খলাগত অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। পরে জানা যায়, ১৮৭ জনের বেশি আহত ব্যক্তিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ৯৫ ভাগ বাঙালি। তারা বেশির ভাগ গুলিবিদ্ধ। বিহারি যারা ছিল, তাদের অধিকাংশই ছোরা, লাঠি ও ইটপাটকেলের আঘাতে আহত। গুলিবিদ্ধ বেশির ভাগ মারা যায়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক নুরুল আমীনের (পরে অধ্যাপক ও সাহিকের প্রতিষ্ঠাতা) ভাষ্যমতে, তিনি ১০৫ জনের লাশ মর্গে পাঠিয়ে নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিকও তাঁর বইয়ে ৭৫ জনের নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি এ জন্য অবশ্য ব্রিগেডিয়ার এম আর মজুমদারকে দোষারোপ করে বলেছেন, তাঁর উদাসীনতার কারণেই এতগুলো লোকের প্রাণহানি ঘটে। নিহত অধিকাংশ ব্যক্তিই ছিল বিহারি। আরেক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা রাও ফরমান আলীও[১২] তাঁর লেখা বইয়ে ২ ও ৩ মার্চ শতাধিক লোকের নিহত এবং তিন শতাধিক লোকের আহত হওয়ার কথা লিখেছেন।

১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমি তাঁর বালুচ রেজিমেন্ট নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

---

১২. মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ১৯৭০ ও '৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করেন। সেই নীলনকশা অনুযায়ী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশীয় সহযোগী সংগঠন আলবদর ও আলশামস বাহিনী বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগমুহূর্তে এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করে।

ইবিআরসি থেকে আমাকে দুই কোম্পানিসহ পাঠানো হলেও তখন পর্যন্ত কোনো ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়নি। ৪ মার্চ থেকে বাঙালিরা সংঘবদ্ধভাবে বিহারি কলোনি ও বিহারি জনগোষ্ঠীর ওপর আঘাত হানতে শুরু করে। এতে আমতলা, ঝাউতলা, পাহাড়তলী, হাফিজ জুট মিল, ওয়্যারলেস কলোনি, ফয়'স লেক, শের শাহ, ফিরোজ শাহ কলোনিসহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অভিযোগ ওঠে, বাঙালিরা জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে কিছু বিহারিকে জীবন্ত অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে। হৃদয়বিদারক ও রোমহর্ষ নানা ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঘটনায় শতাধিক হতাহত হয়, যার সিংহভাগই ছিল বিহারি নর-নারী।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমি দাঙ্গা নিরসনে শুরু থেকেই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের কাজে লাগাতে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। ২ মার্চ থেকে দাঙ্গাবাজেরা বিভিন্ন জায়গায় হামলা ও আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। আমি নিজ উদ্যোগে ছোটাছুটি করে কয়েক জায়গায় আগুন নেভাতে যাই। দাঙ্গাবাজদেরও দমন করার চেষ্টা করি। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্মকর্তা বিহারি সাইদের (৩৭ পিএমএ) পরিবারকে বাঙালি ক্যাপ্টেন অলি[১৩] ও অন্যরা নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করে। তার পরও বলা যায়, ১ মার্চ সন্ধ্যা থেকে ৪ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনারা অনেকটা নির্জীবের মতো স্টেডিয়াম চত্বরেই থাকে। শহরের আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতি ও দাঙ্গায় সৃষ্ট ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে সরাসরি অবহিত করতে থাকি।

এ অবস্থায় ৪ মার্চ সন্ধ্যার আগে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চট্টগ্রামের উপ-আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসক হিসেবে লেফটেন্যান্ট জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুবের কাছে টেলিফোন করেন। তাঁর অনুমোদন নিয়ে চট্টগ্রাম শহরের শান্তিশৃঙ্খলার দায়িত্বভার নিজে গ্রহণ করে তিনি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে সর্বত্র নিয়োজিত করেন। আর বালুচ রেজিমেন্ট ও ইপিআরের অবাঙালিদের ব্যারাকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার জালালের অধীনে এক প্লাটুন বাঙালি সেনা আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশনে মোতায়েন করা হয়। ইপিআরের এক সেকশন বাঙালি সেনাকে বিমানবন্দরে মোতায়েন করা হয়। পরে অবশ্য বিমানবন্দরের দায়িত্ব ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টকে দেওয়া হয়। ইপিআর সেনাদের অধিনায়ক হিসেবে মেজর ইকবাল আগের মতোই কর্মরত থাকেন। ২০ বালুচ রেজিমেন্টের কিছু সেনা

---

১৩. অলি আহমদ তখন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত।

সার্কিট হাউসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকে।

এদিন সন্ধ্যার দিকে রেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট মকবুল আহমেদের টেলিফোন পেয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন সেনা রেলওয়ে কলোনিতে যায়। সেখানে মারামারিতে লিপ্ত বাঙালি-বিহারি দাঙ্গাবাজদের মাঠ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সেনারা নিরাপত্তার খাতিরে রেলওয়ে কলোনি থেকে ৫০-৬০ জন অবাঙালি নারীকে সার্কিট হাউসে নিয়ে যায়। সারা রাত তারা সার্কিট হাউসে অবস্থান করে। ভোরবেলা তারা নিজ নিজ বাসায় ফিরে যায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে বাঙালি ইপিআর ও পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা দুর্গত এলাকায় টহল দিতে থাকে। বিশেষ করে ঝাউতলা, আমতলা, ওয়্যারলেস কলোনি, পাহাড়তলীসহ অন্যান্য দুর্গত এলাকায় টিলার ওপর ছোট ছোট ক্যাম্প স্থাপন করে। ৪ মার্চ রাত ১০টার পর এবং ৫ মার্চ সকালে তারা মাইকে জনগণকে হুঁশিয়ার করে। ঘোষণায় বলা হয়, বাঙালি-বিহারিনির্বিশেষে কোনো অস্ত্রধারীকে রাস্তাঘাটে, এমনকি বাড়ির দেয়ালের পেছনে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে। সব বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেকে সামনে-পেছনে সারা রাত লাইট জ্বালিয়ে রাখতে বলা হয়। এসব নির্দেশ সঠিকভাবে প্রতিপালন করা হচ্ছে কি না, তা আমি নিজেও তদারক করি। ঝাউতলায় এক বিহারির বাড়ি পরিদর্শনকালে দেখা গেল, বাড়ির দেয়ালের সঙ্গে স্যান্ডব্যাক স্থাপন করে রীতিমতো ট্রেঞ্চ করে রাখা হয়েছে। ভেতরে গিয়ে দেখা গেল, তিনটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও দুটি পয়েন্ট টু টু বোর রাইফেল তারা বাইরের দিকে তাক করে রেখেছে। তাদের এভাবে অস্ত্র নিয়ে পাহারায় না থেকে আগের মতো প্রতিবেশীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকার এবং সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা বলা হলো। পরিবারটিকে অবশ্য প্রচণ্ডভাবে ভীতসন্ত্রস্ত মনে হয়েছিল। তাদের কলেজপড়ুয়া মেয়েরা একটা স্টোর রুমে খড়ের নিচে লুকিয়ে ছিল। অদ্ভুত এক পরিস্থিতি।

৫ মার্চ ওয়্যারলেস কলোনিতে রাতের বেলা টহল দেওয়ার সময় গ্রিবস ক্রমটন কোম্পানির[১৪] বিহারি প্রকৌশলী মতিন লাফিয়ে আমার চলন্ত জিপে

---

১৪. পূর্ব পাকিস্তানের পূর্বতন গভর্নর গোলাম ফারুক ব্রিটিশ এই কোম্পানির পাকিস্তান চ্যাপ্টারের প্রধান ছিলেন।

উঠে পড়ে। বাঙালি দাঙ্গাবাজেরা তাকে আক্রমণ করেছিল। পরবর্তীকালে সে করাচি চলে যায়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য রাতদিন কাজ করে। তারা কঠিনভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখায় ৬ মার্চের মধ্যেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে শান্ত হয়ে আসে। ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনা ছাড়া বড় ধরনের তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। বেসামরিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এসপি সামসুল হকও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি অস্ত্রের দোকানগুলো সিলগালা করে দেন। 'প্রবর্তক সংঘ'সহ অন্যান্য নাজুক স্থানে ২৪ ঘণ্টা পুলিশ প্রহরা ও টহলের ব্যবস্থা করেন।

১ মার্চ থেকে দেশ যখন চরম অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছিল, তখন বাংলাদেশের প্রায় সব নাগরিক অস্থিরতায় ভুগছিল। আমরা বাঙালি সেনারাও ব্যতিক্রম ছিলাম না। কী হবে, সামরিক জান্তার পরিকল্পনা কী, পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কী—এসব প্রশ্ন আমাদের সবার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছিল।

২ মার্চ কর্নেল শ্রিগ্রি চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্মরত সব অফিসারকে ব্রিফ করার জন্য একটি সভা ডাকেন। সভায় যোগ দেওয়ার জন্য কনফারেন্স রুমের দিকে যাওয়ার সময় পাকিস্তানি মেজর মেহের কামাল বলে উঠলেন, 'বাস্টার্ড শেখ মুজিব ইজ আ ট্রেইটর', অর্থাৎ 'বেজন্মা শেখ মুজিব একজন বিশ্বাসঘাতক'। এ কথা বলামাত্র শান্তশিষ্ট বাঙালি ডাক্তার মেজর সিরাজুল ইসলাম মেজর মেহের কামালের প্রায় কলার ধরে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ইউ আর আ বাস্টার্ড, ইউ অল আর ট্রেইটরস', অর্থাৎ 'তুমি বেজন্মা, তোমরা সব বিশ্বাসঘাতক।' অপ্রস্তুত মেহের কামাল জবাবে বলে, 'ক্যায়া হো গিয়া ডক্টর সাব, ম্যায় থোড়াই আপ কো বল রাহা', অর্থাৎ 'কী হলো ডাক্তার সাহেব, আমি তো আপনাকে কিছু বলছি না।' সিরাজুল ইসলাম রাগতস্বরে বলেন, 'সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন পিপল ভোটেড টু শেখ মুজিব অ্যান্ড উই অল ভোটেড টু শেখ মুজিব। ডু ইউ থিংক দ্যাট, উই অল আর ট্রেইটরস। উই অল আর বাস্টার্ড, নেভার আটার দিজ টাইপ অব ওয়ার্ডস অ্যাগেইন ইন ইওর লাইফ টাইম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টে উইথ আস', অর্থাৎ 'সাড়ে সাত কোটি মানুষ শেখ মুজিবকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। তুমি কি মনে করো যে তাদের সবাই বেজন্মা! আমরা সব বিশ্বাসঘাতক! যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও, তাহলে এ ধরনের কথা কখনো বলবে না।' দুজনের মধ্যে এই বাক্যালাপ যখন চলছিল, তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্য অফিসাররা ডাক্তার সিরাজুল ইসলামকে শান্ত হতে অনুরোধ করেন।

এ সময় আরেকটি ঘটনা নিয়ে বেশ তোলপাড় হয়। ইস্ট বেঙ্গল

রেজিমেন্টাল সেন্টারের কোয়ার্টার গার্ডে ক্যাপ্টেন এনাম সেনাদের অ্যাটেনশন (সোজা হয়ে দাঁড়াও) না বলে 'জয় বাংলা' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলেন। এনাম আরও বলেন, 'জিন্নাহ ইজ আ ট্রেইটর', 'জিন্নাহ একজন বিশ্বাসঘাতক'। সংগত কারণেই তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়। তদন্তের ভার পড়ে কর্নেল শ্রিগ্রির ওপর। তিনি তদন্ত শুরু করেও শেষ পর্যন্ত বেশি দূর অগ্রসর হননি। কর্নেল শ্রিগ্রি একসময় ক্যাপ্টেন এনামের সিও ছিলেন।

এদিকে চট্টগ্রাম ইপিআরের হেডকোয়ার্টারের অ্যাডজুট্যান্ট ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম (৩২ পিএমএ) ১ মার্চের পর থেকে নিজ উদ্যোগে চট্টগ্রাম ইপিআর সেক্টরের অধীন বাঙালি সেনাদের গোপনে সংগঠিত করতে থাকেন। ৩ মার্চের পর তিনি বাঙালি হাবিলদার ওয়াদুদকে দিয়ে গোপনে চট্টগ্রাম সেক্টরের বাঙালি-অবাঙালি অফিসারসহ সাধারণ সেনাদের তালিকাও প্রস্তুত করেন। হাবিলদার সোবহানকে দিয়ে গোপনে চট্টগ্রামের হাটহাজারী এলাকায় গোলাবারুদের ডিপো স্থাপনের উদ্যোগ নেন। তিনি (রফিকুল ইসলাম) তাঁর সারসন রোডের বাসা থেকে ডা. জাফর, এম আর সিদ্দিকী, আবদুল হান্নান, আতাউর রহমান খান কায়সার, মোশাররফ হোসেন প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতার[১৫] সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। তাঁর বিশ্বস্ত এনসিও (ননকমিশন্ড অফিসার) ও জেসিওদের (জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার) আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে উপদেশ দেন। এ সময় একবার ক্যাপ্টেন রফিক চট্টগ্রাম সেনানিবাসে আসেন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আমাকে বললেন, বালুচ সেনারা পাহাড়ের পাদদেশে সৈনিক লাইনে (ব্যারাক) থাকে। সেসব পাহাড়ে আগুন লাগিয়ে ফায়ার ব্রিগেডের পানির পাইপ দিয়ে পানির বদলে পেট্রল ছিটিয়ে লাইনটি পুড়িয়ে ছারখার করে দিলে কেমন হয়! দিশাহারা বালুচরা লাইন থেকে বের হয়ে ছোটাছুটি শুরু করবে। তখন পাহাড়ের ওপর থেকে কর্ডনেইটেড ফায়ারিং

---

১৫. এম আর সিদ্দিকী : ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী ছিলেন।

আবদুল হান্নান : ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

আতাউর রহমান খান কায়সার : ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন : ১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সক্রিয় সদস্য। স্বাধীনতার পর মন্ত্রী [১৯৯৬-২০০১]

শুরু করে সব ইউনিট শেষ করে দেওয়া সম্ভব। আমি তাঁর প্রস্তাবটি চিন্তা করে দেখার কথা জানাই। শেষ পর্যন্ত ওই প্রস্তাব কাজে লাগানো হয়নি। তবে এটি ব্যতিক্রমধর্মী এবং একটি বাস্তবধর্মী কার্যকর প্ল্যান ছিল।

পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন একরামুল মজিদ সায়গল[১৬] ৩ মার্চ হেলিকপ্টার নিয়ে চট্টগ্রামে আসে। সায়গল হেলিকপ্টারের পাইলট ছিল। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়। সার্কিট হাউসে ছিল চট্টগ্রাম মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার। সেখানেও আমি ডিউটি করতাম। সায়গল কথা প্রসঙ্গে চাপাস্বরে আমাকে বলল, দেশ সাংঘাতিক পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলপ্রসূ কোনো সমঝোতা হবে বলে মনে হয় না।

৬ মার্চ বা পরদিন ৭ মার্চ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউটিসির শিক্ষক লেফটেন্যান্ট এনামুল হক চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁর অধীন ক্যাডেটদের কিছু করার আছে কি না, জানতে চান। আমি তাঁকে সব সময় প্রস্তুত থাকার কথা জানিয়ে বললাম, সময়মতো তাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

এসপি সামসুল হকও সেদিন সার্কিট হাউসে আসেন। তিনি বললেন, জব্দ করা এবং বিভিন্ন অস্ত্রের দোকানে সিলগালা করে রাখা অস্ত্রগুলো কোথায় রাখা হবে? তাঁকে বলা হলো, যেসব অস্ত্র দোকানে আছে, সেগুলো সেখানে তালাবদ্ধ করে রাখাই শ্রেয় হবে। অথবা পুলিশ লাইনে রাখা যেতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল্লাহ ও ফিরোজ এবং তাঁদের বন্ধু মোশারফ হোসেন, আক্তারুজ্জামান বাবু, আতাউর রহমান খান কায়সার, আবদুল হান্নান, ডা. মান্নান প্রমুখ রাজনীতিবিদকে সঙ্গে নিয়ে প্রায়ই সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে দেখা করতেন খবরাখবর আদান-প্রদানের জন্য। সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী আবদুল হাইও মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করতেন। তিনি ল্যাবরেটরির কেমিক্যালসহ বিজ্ঞান গবেষণাগার কীভাবে দেশের দুর্দিনে দেশবাসীর কাজে আসবে, তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন। তাঁর চিন্তাভাবনা তিনি আমাকে জানাতেন এবং খবরাখবর আদান-প্রদান করতেন।

৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা শোনার জন্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা সার্কিট হাউসে সমবেত হন। বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি

---

১৬. একরামুল মজিদ সায়গলের সঙ্গে আমার বেশ অন্তরঙ্গতা ছিল। আমরা দুজন বন্ধু ছিলাম। তার প্রসঙ্গ পরেও রয়েছে।

সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসেন। একইভাবে অবাঙালি সেনা কর্মকর্তা ও বালুচ রেজিমেন্টের কর্মকর্তারা টেবিলের অপর পাশে মুখোমুখি বসেন। সামরিক বাহিনীর রীতি অনুযায়ী খাবার ঘরে কেউ অস্ত্রসহ প্রবেশ করে না। সেদিন সবাই কোমরে পিস্তল বাঁধা অবস্থায় বসে। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের ডাইনিংরুমে সেগুন কাঠের বিশাল এক খাবার টেবিল ছিল। সেই টেবিলে ৫০ জন লোক একসঙ্গে বসে খাবার খেতে পারত। সেই টেবিলের এক পাশে বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, অপর পাশে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা। একটি রেডিও টেবিলের ওপর রাখা। সবাই চরম উত্তেজনায়। বক্তৃতা শুরু হলে আমরা নিবিষ্ট মনে শুনছি। কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। সবাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজেদের কোমরে বাঁধা পিস্তলের ওপর হাত রাখলেন। অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলো। তারপর নিজেরাই অপ্রস্তুত হয়ে কেউ কেউ বলে উঠলেন, আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করা কঠিন। কেউ কেউ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। কেউ কেউ খবর নিতে শুরু করলেন। একজন চট্টগ্রাম রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালক নাজমুল আলমের কাছে ফোন করলেন খবর নিতে। দু-একজন ধারণা করেছিলেন, শেখ মুজিবকে আটক অথবা জনসভায় হয়তো বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। ফলে মুজিবের জনসভা ভন্ডুল হয়ে গেছে। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি বললেন, নাজমুল আলম তাঁকে জানিয়েছেন, শেখ মুজিবের বক্তৃতা তখনো চলছে। সামরিক জান্তা বক্তৃতা সরাসরি প্রচার করতে না দেওয়ায় রেডিওতে কর্মরত সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রতিবাদে একযোগে রেডিও স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছে। তাই বক্তৃতা টেপে ধারণ হতে থাকলেও সম্প্রচার করা হচ্ছে না।

সার্কিট হাউসে শেখ মুজিবের বক্তৃতা শোনার সময় কর্নেল শিগ্রি বলে উঠলেন, 'আই অ্যাম নট আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ল্যাংগুয়েজ বাট দ্য রেডিও ইজ ভাইব্রেটিং', অর্থাৎ 'ভাষা আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু রেডিও ভীষণভাবে কাঁপছে।' তিনি আরও বলেছিলেন, শেখ মুজিব যদি বাংলাদেশের একটা পাথরকেও মিছিলে যোগ দিতে বলেন, সে মিছিলে যোগ দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (পাকিস্তানিরা) বঙ্গবন্ধুকে মেনে নিতে পারেনি।

রাতে জানতে পারলাম, শেখ মুজিবের বক্তৃতা চট্টগ্রাম রেডিওতে টেপে ধারণ করে রাখা হয়েছে। ক্যাপ্টেন আজিজ আমাকে এ কথা জানাল। আজিজ বাঙালি সেনাদের টেপে ধারণ করা বক্তৃতা শোনানোর উদ্যোগ নিল। রাত ১০টার পর ইবিআরসির সেনাদের তা বাজিয়ে শোনানো হলো। বক্তৃতা শোনার পর সেনাদের গোপনে জিজ্ঞেস করা হলো, এই বক্তৃতা থেকে কী

বোঝা গেল? উত্তরে প্রায় সবাই বলল, 'দেশকে স্বাধীন করতে হবে।'

৮ মার্চ সকাল দশটার দিকে কর্নেল এম আর চৌধুরী আমাকে টেলিফোনে বললেন, মেজর জিয়াকে খবর দাও। সন্ধ্যায় নিয়াজ স্টেডিয়ামে তিনি যেন আসেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চাকরিজীবনে জিয়াউর রহমান বেশির ভাগ সময় গোয়েন্দা বিভাগে ছিলেন। অফিসার হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। তা ছাড়া তিনি করাচিতে উর্দু স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। এ জন্য তাঁর ব্যাপারে আমার একটা সন্দেহ ছিল। আমি কর্নেল এম আর চৌধুরীকে এ কথা জানিয়ে বললাম তাঁকে ডাকলে বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে। উত্তরে কর্নেল চৌধুরী বললেন, তিনি ক্যাপ্টেন অলির সঙ্গে কথা বলেছেন। অলি তাঁকে বলেছেন তিনি সমমনা লোক।

আমি যখন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলাম, তখন কর্নেল এম আর চৌধুরী, অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল রশিদ জানজুয়া (পাকিস্তানি), সদ্যগঠিত নবম ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক মেজর আবু ইউসুফ মুশতাক আহমেদ, কর্নেল খিজির হায়াত খান (পাকিস্তানি), মেজর শাফায়াত জামিল (বীর বিক্রম, পরে কর্নেল), ক্যাপ্টেন মুহাম্মদ আইনউদ্দিন (বীর প্রতীক। পরে মেজর জেনারেল), কর্নেল মুইদ, মেজর কাজেম কামাল খান (পাকিস্তানি), ক্যাপ্টেন মাহমুদ (প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে নিহত), মেজর সাদেক নেওয়াজ (পাকিস্তানি), ক্যাপ্টেন মতিন (এম এ মতিন বীর প্রতীক। পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল), ক্যাপ্টেন গাফফার (বীর উত্তম। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং এরশাদের শাসনামলে মন্ত্রী), মেজর খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম। পরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পর মেজর জেনারেল পদে উন্নীত ও সেনাপ্রধান হন। তবে এ ব্যাপারে কোনো গেজেট না হওয়ায় তাঁর র‍্যাংক ব্রিগেডিয়ার জেনারেলই রয়ে গেছে। একই বছর ৭ নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হন), ক্যাপ্টেন জারিফ বাঙ্গোস (পাকিস্তানি), মেজর আলী আহম্মদ ও ক্যাপ্টেন অলি আহমদ চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলে ছিলেন। সে হিসেবে ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল আমাদের প্রত্যেকের জীবনের এক ক্রান্তিলগ্ন। মেজর কাজেম কামাল খান পাঞ্জাবি ছিলেন। তবে পাঞ্জাবি বলতে আমরা যেমন বুঝি, তিনি তেমন ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তিনি আমাদের যথেষ্ট সম্মান করতেন। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে তিনি টাঙ্গাইলে নিহত হন। তখন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের অনেক বাঙালি অফিসার কেঁদেছিলেন।

কাজেম কামাল খান ও ক্যাপ্টেন মাহমুদ জয়দেবপুরে ও লাহোরে চতুর্থ

ইস্ট বেঙ্গলে কর্মরত ছিলেন। কাজেম কামালের বাবা ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল ছিলেন। ১৯৬৭ সালে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জের রোহনপুর এলাকায় মোজাহিদ প্রশিক্ষণের জন্য কাজেম কামাল ও আমি আমাদের কোম্পানি নিয়ে যাই। কাজেম কামাল সেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে আমার ওপর দায়িত্ব দিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। আমি তখন লেফটেন্যান্ট। তিনি আমাকে বললেন, 'ছোটা চৌধুরী সাব, মাই আয়েশ করনে ঢাকা যা রাহাহু। আওর তুম আভিসে কোম্পানি কমান্ডার। স্রেফ ফোন করকে মুঝে রিপোর্ট কর না, লেকিং তাং না কর না।' অর্থাৎ 'আমি ঢাকায় যাচ্ছি আয়েশ করার জন্য। তুমিই এখন কোম্পানি কমান্ডার। টেলিফোনে আমাকে খবরাখবর দেবে। তবে বিনা কারণে বিরক্ত করবে না।'

তখন আমার এক খালাতো বোনের ছেলের ঠোঁটের অপারেশন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মেজর কাজেম কামালকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে ছেলেটির অপারেশনের ব্যবস্থা করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। খালাতো বোনের ছেলের নাম ছিল রাজন (আহমেদ ইমরান)। স্বাধীনতার পর রাজন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়। মেজর হিসেবে অবসর নিয়ে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরায় অধ্যাপনা পেশায় জড়িত। ক্যাপ্টেন মাহমুদ ১৯৭১ সালে চতুর্থ বেঙ্গলে থাকাবস্থায় কুমিল্লার রিয়ারে পোস্টেড ছিল। কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার সময় ক্রসফায়ারে সে নিহত হয়। কাজেম কামাল ও মাহমুদ চতুর্থ বেঙ্গলে থাকলে তারা নিহত হতো না বলে আমার বিশ্বাস।

যাহোক, মেজর জিয়া ও ক্যাপ্টেন অলিকে টেলিফোনে নিয়াজ স্টেডিয়ামে আসতে বলা হয়। আমি সেখানে আগে যাই এবং তাঁদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। এই সভায় আরও কয়েকজন যোগ দেন। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ক্যাপ্টেন অলি সেখানে একা আসেন। তিনি আমাকে জানালেন, জিয়া পরে আসবেন। কারণ, অষ্টম বেঙ্গলের পল্টনে বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা সবাই জিয়ার সঙ্গে আছেন। কর্নেল এম আর চৌধুরী তখনো আসেননি। সন্ধ্যা আটটা অথবা সাড়ে আটটার দিকে তিনি আসেন। এম আর চৌধুরী নিয়াজ স্টেডিয়ামে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সেক্রেটারির কক্ষে অবস্থান নেন। আমরা সবাই তাঁর কাছে যাই। ক্যাপ্টেন অলি কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে যান। তিনি যাওয়ার পর মেজর জিয়া সেখানে আসেন।

কর্নেল এম আর চৌধুরী সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর বসে মেজর জিয়া ও অন্যদের প্রথমে পরিস্থিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্রিফিং দেন। তারপর

আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার শুরুতেই এম আর চৌধুরীর কাছে জিয়া জানতে চাইলেন, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের অবস্থান কী? উত্তরে কর্নেল চৌধুরী বললেন, 'আমি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের প্রধান প্রশিক্ষক, তোমার সামনে বসে আছি। আর কারোর থাকার দরকার নেই। তাহলে মাথার ওপর থেকে ছাতা সরে যাবে।' তাঁর এ কথায় মেজর জিয়া কিছুটা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'সবাইকে একই ওয়েভ লেনথে থেকে কাজ করতে হবে। সে জন্যই আমার এই জিজ্ঞাসা।' কর্নেল চৌধুরী বললেন, 'জিয়া, তুমি আমাদের মধ্যে একমাত্র ট্রেইনড ট্রুপস কমান্ড করেছ...।' জিয়া সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আপনি সিনিয়র, আপনি যা হুকুম করবেন, সেই মোতাবেক আমি ও আমাদের ব্যাটালিয়ন কাজ করবে।'

তারপর কর্নেল এম আর চৌধুরী মেজর জিয়ার সঙ্গে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করলেন। সেই আলোচনায় আমিও যোগ দিলাম। যা আলোচনা হলো, তার সার কথা হলো : ঢাকার চেয়ে চট্টগ্রামকে ডিফেন্ড করা সহজতর। কারণ, চট্টগ্রামে পাকিস্তানি ট্রুপস মাত্র শ তিনেক। আমাদের ট্রেইনড ট্রুপস শ চারেক, কিন্তু রিক্রুট আছে এক হাজারের বেশি। ঢাকায় আমাদের কোনো ব্যাটালিয়ন নেই। ছাত্রদের নিয়ে ঢাকায় একটি ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এখনো তেমন কোনো প্রগ্রেস হয়নি। নবম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের রেইজিং শুরু হয়েছে। তবে তারা এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের অবস্থান জয়দেবপুরে। তাদের টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহের দিকে ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে। অবশ্য পিলখানায় দেড়-দুই হাজারের ওপর ইপিআর আছে।

চট্টগ্রামে অষ্টম বেঙ্গল ও ইবিআরসি ছাড়াও প্রায় দেড় হাজার ইপিআর, নেভিতে ৩৬ জন বাঙালি মেরিন ছাড়াও সৈনিক রয়েছে। এয়ার ফোর্সে বাঙালি পাইলট ছাড়াও সামান্যসংখ্যক সৈনিক আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে ফার্মবেস বানিয়ে সাব্রুম বিওপি খুলে দিয়ে এবং বিশাল সমুদ্র ও নদীপথে নিরাপদ এলএফসির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজতর হবে বলে সবাই একমত হলেন। কারণ এতে লাইন অব কমিউনিকেশন সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে হবে।

জিয়া বললেন, তাঁর সমস্যা হলো, তাঁদের ব্যাটালিয়ন জেড স্কেলে। ব্যাটালিয়ন লাহোর যাচ্ছে। তাই সৈনিকদের কাছে ভারী অস্ত্র ইস্যু করা হয়নি। লাহোরের ডিভিশন যে ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে, সেই ধরনের অস্ত্র অষ্টম বেঙ্গলকে দেওয়া হবে। এ ছাড়া যুদ্ধ করতে হলে ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্রের

প্রয়োজন। কর্নেল চৌধুরী জিয়াকে বললেন, তার ব্যবস্থা করা যাবে। পাকিস্তান আর্মি জনগণের ওপর হামলা করতে পারে। এর আগে তারা বাঙালি সৈনিকদের ডিসআর্ম করতে পারে। বাঙালি সৈনিকদের ডিসআর্ম করার চেষ্টা করলে তা অবশ্যই প্রতিহত করতে এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী না বানিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দিয়ে জনগণের ওপর হামলা চালালে বাঙালি সেনারা জনগণের পক্ষ নিয়ে সেই হামলা প্রতিহত করবে।

সিদ্ধান্ত হলো, যদি এরকম পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, তাহলে মেজর জিয়া অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সেনাদের নিয়ে নতুনপাড়া এলাকা দিয়ে ২০ বালুচকে আক্রমণ করবেন। আমি ইবিআরসির দুই কোম্পানি সেনা নিয়ে ইপিআরদের সহায়তায় পাকিস্তান নেভিতে আক্রমণ করে তাদের ডিসআর্ম করব। ক্যাপ্টেন রফিক ইপিআরদের সহায়তায় শুভপুর সেতু উড়িয়ে দিয়ে ফেনী নদী বরাবর ডিফেন্স নেবেন। ৫২টি ট্রাক রিকুইজিশন করা আছে। সেগুলো সেনাদের চলাচলে ব্যবহৃত হবে। ইপিআরের সেনারা হালিশহর এলাকায় সেকেন্ড লাইন ডিফেন্স তৈরি করবে, যাতে প্রয়োজনে করেরহাট ও হাটহাজারীর দিকে রাস্তা দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্ত ডিফেন্স ও ফার্মবেস তৈরি করা যায়। কুমিল্লা থেকে চতুর্থ বেঙ্গলকে নিয়ে এসে শুভপুর বরাবর ডিফেন্স তৈরি করে এলএফসির নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। রেলওয়ের মকবুলকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, প্রয়োজনে স্পেশাল ট্রেন তিনি যেকোনো সময়ে চালু করতে সক্ষম কি না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ২৪ ঘণ্টার নোটিশে তিনি ময়মনসিংহের মতো বড় স্টেশন থেকেও স্পেশাল ট্রেন চালু করতে পারবেন। স্পেশাল ট্রেনের মাধ্যমে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলকে ময়মনসিংহ থেকে শুভপুর নিয়ে আসা সম্ভব। যশোরে অবস্থানরত প্রথম বেঙ্গলকেও নদীপথে শুভপুর এলাকায় জড়ো করা হবে। তৃতীয় বেঙ্গলের অবস্থান ছিল সৈয়দপুরে। তাদের ব্যাপারে সেদিন আলোচনা হয়নি। ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহারের কথা তখনো কারোর মাথায় আসেনি।

আলোচনাকালে মেজর জিয়া বললেন, তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন। এই এলাকা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কম। হাটহাজারী কোথায়, সেটা ম্যাপ এঁকে দেখালে ভালো হয়। আমি আইস্কেচ এঁকে তাঁকে বোঝালাম হাটহাজারী ও নতুনপাড়া সেনানিবাসের প্রবেশপথের তুলনামূলক অবস্থান। কর্নেল এম আর চৌধুরী বললেন, 'নাথিং শুড বি রিটেন...', অর্থাৎ 'কোনো কিছু লিখিত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।' সবকিছুই অলিখিতভাবে মাথায় রাখতে হবে। এই মুহূর্তে

আমাদের প্ল্যানিং সম্পর্কে কাউকে বিস্তারিত কিছু বলা যাবে না। আলোচনা করাও ঠিক হবে না। মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা যাবে না। কোনো ধরনের অ্যাডভেঞ্চারিজম করা একেবারেই সমীচীন হবে না। আমাদের প্রথমে ঢাকা থেকে সঠিক খবর সংগ্রহ করতে হবে। তবে সবাইকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। অস্ত্রপাতি ও জনবলের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাখতে হবে।' ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিককে এম আর চৌধুরী নিজে ব্রিফ করবেন বলে জানালেন। তিনি আরও বললেন, প্ল্যান নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা না করে যার যা দায়িত্ব সে সম্পর্কে শুধু আভাসে 'নিড টু নো বেসিসে', অর্থাৎ যার যেটুকু জানা প্রয়োজন, সেটুকুই কেবল বলে রাখা ভালো। প্রাথমিকভাবে বাঙালি সেনাদের বলে রাখতে হবে, যখনই অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ আসবে, তখনই বুঝতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার সময় এসে গেছে। কোনো অবস্থাতেই অস্ত্র জমা করা যাবে না। প্রয়োজনে কোত (অস্ত্রাগার) থেকে আগেই অস্ত্র বের করে সেনাদের অস্ত্রে সজ্জিত করতে হবে। শেষে কর্নেল এম আর চৌধুরী আমাকে বললেন আইস্কেচটি পুড়িয়ে ফেলতে। আমি আইস্কেচটি পুড়িয়ে ফেললাম। রাত তখন ৯টা ৪৫ মিনিট।

সেদিন থেকেই নিয়াজ স্টেডিয়ামে রাতের নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ানো হলো। রাতে দুটি হেভি মেশিনগান গ্যালারির ওপর থেকে পাকিস্তান নৌবাহিনীর কমোডর মমতাজের বাড়ির দিকে তাক করে অবস্থান নিত। সকাল হওয়ার আগেই তা নামিয়ে আনা হতো। ইতিমধ্যে সামস জাহাজে করে তিন শ তিন টনি ট্রাকসহ বিভিন্ন ধরনের হালকা সামরিক সরঞ্জাম এসেছিল। অধিকাংশ ট্রাকের চালক ছিল বাঙালি। তাদের অনুরোধে ট্রাকগুলো আনলোড করার অনুমতি দেওয়া হয়।

৯ মার্চ সকাল নয়টার দিকে কর্নেল এম আর চৌধুরী ক্যাপ্টেন মহসীনকে (৩৪ পিএমএ) সঙ্গে নিয়ে আগ্রাবাদে রেডিও পাকিস্তান ভবন পরিদর্শনে যান। সুবেদার জালালের নেতৃত্বে একদল বাঙালি সেনা সেখানে প্রহরারত ছিল। তিনি ওই সেনাদের পরিদর্শন করে ঘোষণাকক্ষটি দেখেন। কীভাবে রেকর্ডিং করা হয়, তা-ও তিনি দেখেন। কিন্তু চট্টগ্রাম রেডিওর সবকিছু যে কালুরঘাট রিলে স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়, তা আমরা জানতাম না। সেখানে কর্তব্যরত সেনা কর্মকর্তা ও সেনারাও তা জানত না।

এদিন একটা ঘটনা ঘটে। বেলা ১১টার দিকে সেনানিবাসে হাবিলদার কবিরের ছেলেকে বালুচ সেনারা মারধর করে। এ কারণে গোটা সেনানিবাসে

ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। বাঙালি সেনা ও বালুচ রেজিমেন্টের সেনারা একেবারে মুখোমুখি অবস্থানে চলে যায়। এ সময় আমি স্টেডিয়াম থেকে নিকটবর্তী রেলওয়ে কলোনিতে মকবুল সাহেবের বাসায় ছিলাম। চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করছিলাম। সেনানিবাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে এম আর চৌধুরী নিয়াজ স্টেডিয়ামে আমার কাছে ফোন করেন। আমাকে না পেয়ে ভীষণ রাগও করেন। সাড়ে ১২টার দিকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে বাঙালি ও বালুচ সেনাদের শান্ত করা হয়। এ ঘটনা আমি জানতাম না। বস্তুত মিসেস মকবুলই আমাকে বললেন, 'কি ক্যাপ্টেন সাব, ক্যান্টনমেন্টে বাঙালি-পাঞ্জাবি প্রায় লেগে গেছে!' কার কাছে শুনলেন, ব্যতিব্যস্ত হয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। মিসেস মকবুল বললেন, এইমাত্র টেলিফোনে মিসেস সফি জানালেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়াজ স্টেডিয়ামে ছুটে গেলাম। গিয়ে শুনলাম, কর্নেল চৌধুরী আমার কাছে ফোন করেছিলেন। আমি তাঁকে ফোন করলাম। কর্নেল চৌধুরী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন এবং বিরক্তভরা স্বরে বললেন, 'ফোন নম্বর না রেখে কোথায় ঘোরাফেরা করছ?'

সন্ধ্যার দিকে আমি ক্যাপ্টেন রফিকের সারসন রোডের বাসায় গেলাম। আমরা দুজন দেশের চলমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম। আলোচনার একপর্যায়ে ক্যাপ্টেন রফিক আমাকে বললেন, আক্রান্ত হলে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। তিনি আমাকে আরও বললেন, মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে যেন ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু, বিশেষত আপডেট সম্পর্কে অবহিত রাখি।

১০ মার্চ সার্কিট হাউসে সকাল নয়টায় স্টেশনের অফিসারদের সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সভা করেন। এই সভায় ক্যাপ্টেন পর্যায় থেকে ওপর স্তরের সব সেনা কর্মকর্তা যোগ দেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সভায় পাকিস্তানের সংহতির ওপর উদ্দীপনামূলক ভাষণ দেন। তিনি বললেন, শিগগির রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সৈনিক হিসেবে আমাদের প্রধান কাজ হবে সরকার এবং দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশপূর্বক সরকারের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা। এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য বিন্দুমাত্র সহ্য করা হবে না বলে তিনি অত্যন্ত শক্ত ভাষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন। আরও বললেন, সেনা কর্মকর্তাদের কেউ কেউ তাঁদের পরিবার সেনানিবাস থেকে বাড়িতে বা অন্যত্র পাঠাচ্ছেন। এরপর টেবিল থাবড়ে বললেন, এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আজ থেকে আর কেউ

তাঁর পরিবার সেনানিবাস থেকে বাড়িতে পাঠাবে না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমীন, রেসট্রিক্ট ইওর মুভমেন্ট', অর্থাৎ আমীন, তুমি তোমার চলাফেরা সংযত করবে।' তাঁর এ কথায় আমার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। সম্ভবত কর্নেল শ্রিগ্রি মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে রাজনীতিবিদ ও বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা ও আলোচনাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা তো মহা খুশি। তাঁরা বলতে থাকেন, 'ইয়ে তো সাচ্চা পাকিস্তানি নিকলাহ', অর্থাৎ 'একজন সাচ্চা পাকিস্তানি।' পরে মিলিটারি সার্ভিসেস কোরের বাঙালি ক্যাপ্টেন বাশার (৩২ পিএমএ) আমাকে বললেন, 'ইওর ব্রিগেডিয়ার ইজ আ ডিজগ্রেস', অর্থাৎ 'তোমার ব্রিগেডিয়ার এক কলঙ্ক।'

সভা শেষে আমি কর্নেল এম আর চৌধুরীর নির্দেশে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে যাই। তাঁর ছেলে মাহমুদুর রহমান চৌধুরী[১৭] ক্যাডেট কলেজের শিক্ষার্থী ছিল। তিনি আমাকে তাঁর ছেলেকে হোস্টেল থেকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। আমি মাহমুদুর রহমান চৌধুরীকে হোস্টেল থেকে নিয়ে বাসায় পৌঁছে দিই। মাহমুদের সঙ্গে মেজর (পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল) মংকিউর ছেলে বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের ছেলেও আসে। ক্যাডেট কলেজের অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন ক্যাপ্টেন বুখারি (২৭ পিএমএ)। তিনি তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সেখানে থেকে যান। তিনি তখন এমএ ফাইনাল পরীক্ষার্থী ছিলেন। পরীক্ষা শেষ করে পাকিস্তানে ফিরে গিয়ে মেজর পদবি গ্রহণ করে তাঁর নিজের ব্যাটালিয়নে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। ক্যাডেট কলেজ থেকে তখন বেশির ভাগ ছাত্র চলে গেছে। শিক্ষকেরাও অনেকে চলে গেছেন। বাকিরাও যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ক্যাডেট কলেজ এলাকায় মানুষজন নেই বললেই চলে। বুখারি তাঁর পরিবারসহ বসবাস করছিলেন। তাঁর ব্যাচের অফিসাররা উনসত্তর সালের শেষের দিকে মেজর পদে প্রমোশন পেয়েছিলেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ এবং পূর্ব পাকিস্তানের নৈসর্গিক সৌন্দর্যকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন। ভালোবেসেছিলেন গ্রামবাংলার শান্ত-সমাহিত চিরসবুজের সৌন্দর্যকে। আমি বুখারি ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দুপুরের লাঞ্চ করি। দুই ছাত্রকে জিপে তুলে চট্টগ্রামে ফিরে আসি। জিপে ওঠার সময় মাহমুদ বলল, 'আংকেল, যদি যুদ্ধ লাগে, কোন দিকে যাবেন?

---

১৭. মাহমুদুর রহমান চৌধুরী তখন নবম শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং কর্নেল পদ থেকে অবসর নেন।

জনতার দিকে, নাকি সামরিক জান্তার দিকে?' আমি হেসে তাকে বললাম, আগে সময়মতো চট্টগ্রাম পৌঁছাই, তারপর দেখা যাবে। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রতি বুখারির অকৃত্রিম ভালোবাসাই বুঝি কাল হলো। ক্র্যাক ডাউনের পর উন্মত্ত জনতা বুখারি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। হৃদয়বিদারক এই নির্মম হত্যাকাণ্ড আজও আমার সংবেদনশীল মনকে কাঁদিয়ে ফিরছে, অর্থাৎ এ কান্নার কোনো শেষ নেই।

সন্ধ্যার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমার অধীন সেনাদের পরিদর্শন করতে নিয়াজ স্টেডিয়ামে আসেন। পরিদর্শন শেষে আমাকে সঙ্গে করে একটু দূরে গিয়ে খুব নিচুস্বরে বললেন, কর্ণফুলী নদীর মোহনায় জাহাজ ডুবিয়ে বন্দর অকেজো করে দিতে হবে। পরিকল্পনাটি আরও ভালোভাবে করা যাবে, যদি আগেই সঠিকভাবে জানা যায়, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আসল উদ্দেশ্য কী? আরও বললেন, রোববারের মধ্যে চাকরিরত ও প্রাক্তন সেনাদের নাম-ঠিকানাসহ তালিকাটি কর্নেল ওসমানীর কাছে পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। ওই তালিকায় ৩ হাজার ৩৯ জনের নাম ও ঠিকানা ছিল।

মার্চ মাসের প্রথম দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে বলেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে স্টেশন কমান্ডার থাকার সুবাদে তিনি পাকিস্তানের সেনাসদরের একটি চিঠি পড়ার সুযোগ পেয়েছেন। বিশেষ সরকারি ডাকে চিঠিটি চট্টগ্রাম স্টেশন হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। চিঠিতে সব স্টেশন কমান্ডারকে জানানো হয়, দেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের কারণে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৬ ও ৯ ডিভিশনের সেনাদের বিমানে করে ত্বরিত পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। সম্প্রতি সেনাসদরে এক বৈঠকে এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই চিঠিতে সেনাসদরের বিশ্লেষণমূলক মন্তব্যের সারাংশও ছিল। তাতে লেখা ছিল : ছয় দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা হলে পাকিস্তানের সংহতি হুমকির সম্মুখীন হবে। সেনাবাহিনীর অধিকাংশ জেনারেলই এই অভিমত পেশ করেছেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের গোপন পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ায় কোনো বাঙালি সেনা কর্মকর্তাকে রাখেনি। পাকিস্তানের সেনাসদর সব স্টেশন কমান্ডার ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসককে ওই চিঠিটি পাঠায়। অখণ্ড পাকিস্তানের একমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চল ছাড়া অন্য সব অঞ্চলের স্টেশন কমান্ডার ও সামরিক আইন প্রশাসক ছিল

পশ্চিম পাকিস্তানি। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তখন চট্টগ্রামের স্টেশন কমান্ডার ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক। আমার ধারণা, সেনাসদরে যে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা চিঠিটি বিতরণের দায়িত্বে ছিলেন, তাঁর হয়তো বাঙালি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের কথা মনে ছিল না। ভুলক্রমে তিনি চট্টগ্রাম স্টেশনেও চিঠি পাঠিয়ে দেন।

যাহোক, ওই দিন রাত ১২টার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আবার আমাকে তাঁর বাসায় ডাকলেন। আমি দ্রুত তাঁর বাসায় গেলাম। আমি যাওয়ার পর রেডিও অন করে আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে নিয়ে করিডরে গেলেন। চেয়ারে বসে নিচু অথচ উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'সোয়াত' জাহাজ উড়িয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। শ' খানেক ছাত্রকে গ্রেনেড ছোড়া এবং গ্রেনেড ছোড়ার পর কীভাবে পালিয়ে যাবে, তার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারা সোয়াত জাহাজে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যাবে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনারা 'সোয়াত' জাহাজ যেখানে নোঙর করা আছে, সেখানে গার্ড ডিউটিতে নিয়োজিত আছে। তাই কাজটা করা সহজতর হবে। তারপর গম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, যে গ্রেনেডগুলো ছাত্রদের দিয়ে থ্রো করানো হবে, সেগুলোর হিসাব কীভাবে দেওয়া হবে? আমি হকচকিয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আমতা আমতা করতে থাকি। তিনি বিরক্তির স্বরে সিলেটি ভাষায় বললেন, 'তোমাদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আরে, গ্রেনেডের পিনগুলো খুলে জমা করে দেবে আর পিনগুলোর জায়গায় শক্ত লোহার পিন লাগিয়ে রাখবা।' আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে জানালাম, কিছু ছাত্র এ কাজের জন্য জোগাড় করা যায় কি না সকালে চেষ্টা করে দেখব। এরপর আমি চলে আসি।

তখন তাঁর মনমেজাজ তেমন ভালো ছিল না। পরে জেনেছিলাম, ওই দিন সন্ধ্যায় লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তাঁর কাছে ফোন করেছিলেন। টিক্কা খান 'সোয়াত' জাহাজ থেকে ত্বরিত অস্ত্র খালাস করার জন্য ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে রীতিমতো ধমকের সুরে গালমন্দ করেন। শেষে তাঁকে বলেন, এ কাজের জন্য কোম্পানির একজন সিনিয়র সুবেদারই যথেষ্ট ছিল। তার পরও তিনি নিজেই যেন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে মালামাল খালাস করার ব্যবস্থা করেন।

১১ মার্চ সকালে আমি চট্টগ্রাম 'প্রবর্তক সংঘ'র সক্রিয় সদস্য শ্রীকালীপদের সঙ্গে গোপনে দেখা করি। তাঁর মাধ্যমে বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের অনুসারী শ্রীপূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁকে জানাই, সম্ভাব্য যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য কিছু ছাত্র-যুবককে গ্রেনেড ছোড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এ জন্য বিশ্বস্ত

এক শ যুবক প্রয়োজন। তিনি যদি এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেন, তাহলে খুব ভালো হয়। পূর্ণেন্দু দস্তিদার আমার কাছে খবর পাঠালেন, দশ বছর আগে হলে তিনি ও তাঁর সাথিরা নিজেরাই গ্রেনেড ছোড়ার প্রশিক্ষণে শামিল হতেন। আমি ভেবেছিলাম, পূর্ণেন্দু দস্তিদারের মাধ্যমে ছাত্র-যুবক অবশ্যই পাওয়া যাবে। এ প্রচেষ্টা সফল না হওয়ায় আর কোথায় যোগাযোগ করা যায়, তা ভাবতে থাকি।

বেলা ১১টার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে ফোন করলেন। তিনি আমাকে আওয়ামী লীগের নেতা এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে রাতে দেখা করতে বললেন। আরও বললেন, এম আর সিদ্দিকী এখন চট্টগ্রামে নেই। রাতে ঢাকা থেকে আসবেন। তাঁর বড় কোস্টার আছে। এই কোস্টারগুলো বন্দরের চ্যানেলে ডুবিয়ে দিলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কয়েক মাস বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না। তিনি আমাকে বিষয়টি নিয়ে এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে আলাপ করতে বললেন। আমি বললাম, সিদ্দিকী সাহেব ব্যবসায়ী এ কে খানের মেয়ের জামাই। তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলাটা আমাদের ঝুঁকির কারণ হতে পারে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার বললেন, একজনের সঙ্গে কথাবার্তা না বলেই তাঁর সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করা কোনো বুদ্ধিমান লোকের কাজ নয়। তিনি আমাকে রাতে এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে অবশ্যই দেখা করে প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা করতে এবং অনুমতি নিয়ে আসতে বললেন।

রাত ১১টার পর আমি এম আর সিদ্দিকীর লালখান বাজারের বাড়িতে গেলাম। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলাম তাঁর দোভাষী জানে আলম বসে আছেন। এম আর সিদ্দিকী আমি যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে ঢাকা থেকে এসেছেন। জানতে পারলাম, আসার পথে তিনি দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। হাতে সামান্য চোট পেয়েছেন। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ড্রয়িংরুমে এলেন। আমি তাঁকে জানালাম, একটি বিশেষ বিষয় নিয়ে একান্তে কথা বলতে চাই। তিনি আমাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেলেন। আলোচনা শুরুর আগেই তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁদের জন্য কতটুকু নির্ভরযোগ্য? বললাম, আমি তাঁর বিশেষ বার্তা নিয়ে এসেছি। নির্ভরযোগ্যতার প্রশ্নে এটাই যথেষ্ট। তবে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নাম বেশি উচ্চারিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পাকিস্তানিরা তাঁকে চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে সরিয়ে দিলে আমরা, বাঙালি সেনা কর্মকর্তারা অসহায় হয়ে পড়ব। তারপর আমি সরাসরি তাঁকে বললাম, আমরা শুনেছি, বাঙালিদের মধ্যে একমাত্র আপনারই সমুদ্রগামী বড় কোস্টার আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের প্রবেশপথে কর্ণফুলী নদীর

মোহনায় বড় কোস্টার ডুবিয়ে দিলে চট্টগ্রাম বন্দর অকেজো হয়ে যাবে। এ জন্য আপনার কোস্টারটি দরকার। এম আর সিদ্দিকী আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'যে দেশে জানের নিরাপত্তা নাই, সে দেশে কোস্টার দিয়ে কী করব? দেন ডুবিয়ে, যা হবার হবে। পরে দেখা যাবে।' এরপর আরও কিছুক্ষণ চুপ থেকে হাসতে হাসতে বললেন, 'বাংলাদেশ হলে কিন্তু দুটি জাহাজ আমাকে দিতে হবে।'

এম আর সিদ্দিকী এত সহজে রাজি হয়ে যাবেন ভাবিনি। প্রস্তাবটি দেওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি সংশয়ে ছিলাম। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উৎফুল্ল মনে ঝাউতলায় ইদ্রিসের বাড়িতে গেলাম। তাঁরও কোস্টার ছিল। তবে আকারে ছোট। ইদ্রিস আমার প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। তিনিও আওয়ামী লীগ করতেন। কট্টর আওয়ামী লীগার। পোর্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। ইদ্রিস আমাকে কর্ণফুলী নদীর মোহনা তথা চট্টগ্রাম বন্দরে প্রবেশ চ্যানেলের দামি ফটোগ্রাফগুলোও দিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাত একটার দিকে নিয়াজ স্টেডিয়ামে ফিরে আসি।

সামস নামে একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করা ছিল। ৯ মার্চ থেকে সেই জাহাজটি চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু চট্টগ্রামের সাব জোনাল মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। রিপোর্ট ছিল, কিছু অবাঙালি গোপনে তাদের দামি জিনিসপত্র ওই জাহাজে বোঝাই করেছে। ব্যাংকে রাখা সোনাদানা ও টাকা ব্যাংক থেকে তুলে (প্রায় ১০ কোটি টাকা) তারা করাচির উদ্দেশে চলে যাচ্ছিল। মানুষের মধ্যেও এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে এক দিন ছাত্রদের বিশাল একটি মিছিল বন্দর এলাকা প্রদক্ষিণ করে, যাতে সামস জাহাজ করাচিতে যেতে না পারে।

১২ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী চট্টগ্রাম সাব জোনাল মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারে আসেন। তিনি বললেন, জাহাজ সামসকে চলে যেতে দেওয়াই উচিত হবে। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বাঙালি রয়েছে, বিশেষ করে করাচিতে। সামস জাহাজ যেতে না দিলে পাকিস্তানিরা তাদেরও আটকে রাখবে। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডও মনে করে, জাহাজ সামস চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে যাক। তার এ কথায় চট্টগ্রাম সাব জোনাল মার্শাল ল কর্তৃপক্ষ ওই দিন অনুমতি প্রদান করে। তবে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের (বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক) চট্টগ্রাম শাখার ব্যবস্থাপক জাহাজটির চলে যাওয়ার ব্যাপারে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও জাহাজ সামস ওই দিনই চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলে যায়।

দুপুর ১২টার দিকে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সার্কিট হাউসে আসেন। তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতেমি, কর্নেল শ্রিগ্রিসহ অন্য অবাঙালি সেনা কর্মকর্তারা তাঁকে প্রায় ঘিরে থাকে। আমি পেছনে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ামাত্র পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের ফাঁক দিয়ে ইঙ্গিতে তাঁকে জানালাম এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে আমি দেখা করেছি। সাংকেতিক ভি চিহ্ন দেখিয়ে বলি, সফল হয়েছি। এরপর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চলে গেলেন।

লাঞ্চের পর আমি নিয়াজ স্টেডিয়ামে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। মেজর জিয়া এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। তখন আনুমানিক বিকেল চারটা। জিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলেন কোনো খবর আছে কি না? জানালাম, এখনো উল্লেখযোগ্য তেমন খবর নেই। দু-এক দিনের মধ্যে খবর সংগ্রহের জন্য আমাকে বা অন্য কাউকে হয়তো ঢাকায় পাঠানো হবে। তখন সঠিক খবর জানা যাবে।

তারপর জিয়াকে আমি বললাম, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুপযোগী করলে কেমন হয়? ইদ্রিসের দেওয়া চ্যানেলের ছবিগুলো তাঁকে দেখালাম। বললাম, জাহাজ প্রবেশ চ্যানেলের কোনো নাজুক জায়গায় আড়াআড়িভাবে দুটি জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে বন্দরের প্রবেশপথ বন্ধ করা সম্ভব। এ ছাড়া আন্ডারগ্রাউন্ড ক্রেনের সংযোগকারী কেবলের (যার মাধ্যমে ক্রেন চলাচল করে) জংশন পয়েন্ট বিচ্ছিন্ন করা হলে বা গ্রেনেড দিয়ে উড়িয়ে দিলে বন্দরের জেটিগুলোও অকেজো হয়ে যাবে। এতে পাকিস্তানিরা আর বন্দর ব্যবহার করতে পারবে না।

জিয়া তাঁর স্বভাবসুলভ ভারী গলায় বললেন, 'আরে, রাখো এসব প্ল্যানিং। এটা কি সামরিক অভিযান? উই নিড ইট অ্যাট দ্য রিকোয়ার্ড টাইম। বাকি সব কার্যক্রম সংবেদনশীল ডেটোনেটরের বিস্ফোরণের ফলে আপনা-আপনি ঘটতে থাকবে। আগে থেকে এসব প্ল্যানিং করতে গেলে ধরা খাওয়ার আশঙ্কা প্রায় ষোলো আনা।' পাকিস্তান সামরিক একাডেমির একসময়ের প্রখ্যাত একজন প্রশিক্ষক জিয়া। তাঁর মুখে এসব কথা আমার মনঃপূত হয়নি। বরং তাৎক্ষণিকভাবে জিয়ার ভাবমূর্তি আমার কাছে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে অবশ্য দেখা গেল, সময়মতো গর্জে উঠতে না পারলে এসব প্ল্যানিং ভেস্তে যায় বা কোনো কাজে আসে না। ইবিআরসির ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছিল। ক্যাপ্টেন রফিক ও মেজর জিয়া তাৎক্ষণিকভাবে জ্বলে উঠতে পেরেছিলেন বলেই মিলিটারি ক্র্যাক ডাউনের প্রথম প্রহরেই অবিশ্বাস্যভাবে

প্রতিরোধের আগুন ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। অবশ্য রফিক ক্র্যাক ডাউন শুরুর আগেই জ্বলে উঠেছিলেন।

যাহোক, এরপর মেজর জিয়া চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম সম্ভব হলে তিনি যেন এম আর সিদ্দিকী ও আওয়ামী লীগের অন্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বললেন, রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আমার মতো জুনিয়র অফিসারদের যোগাযোগ রাখাই অধিকতর যৌক্তিক। সিনিয়র কেউ আগে থেকে যোগাযোগ স্থাপনে তৎপর হলে পাকিস্তানিরা সজাগ হয়ে সবাইকে বদলি করে দিতে পারে। এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন।

১৩ মার্চ সকালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম আর চৌধুরী আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি একটি কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। দেখি, সেটি ছুটির অনুমোদনপত্র। ১৪ মার্চ আমাকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বিস্মিত আমি কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, তুমি তোমার এক কাজিনের বিয়ে উপলক্ষে ফেনীতে যাচ্ছ। ফেনী পৌঁছার আগে তোমাকে যেন কেউ দেখতে না পায়। কারও সঙ্গে যদি দেখা হয়েই যায়, ব্যক্তিগত কাজের কথা বলে কেটে পড়বে। আজ দুপুরে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করবে। তিনি তোমাকে কিছু কাগজপত্র দেবেন। সেগুলো তুমি ঢাকায় গিয়ে কর্নেল ওসমানীকে দেবে এবং তাঁর নির্দেশনা জেনে আসবে। সম্ভব হলে রাজনৈতিক বা ছাত্র-যুবনেতা কারও সঙ্গে আলাপ করে প্রকৃত পরিস্থিতি জানার চেষ্টা করবে।

আমি দুপুরে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাকে কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাদের তালিকা দিলেন এবং কর্নেল ওসমানীকে কী বলতে হবে, সংক্ষেপে তা ব্রিফ করলেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রেজিমেন্টাল রি-ইউনিয়ন হওয়ার কথা ছিল। ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের নির্দেশে ইবিআরসি থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া সেনাদের সবার নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করানো হয়। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন রেকর্ডের হেডক্লার্ক অবাঙালি (বিহারি) নাসির। রেকর্ড অফিসার ছিলেন পাকিস্তানি মেজর বেগ। ইনচার্জ ছিলেন বাঙালি মেজর এ টি এম এন হুসেন। তালিকার মোট ছয়টি কপি করা হয়। একটি কপি ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর কাছে রেখে দেন। সেই কপি তিনি আমাকে দেন কর্নেল ওসমানীকে দেওয়ার জন্য। এই তালিকায় তিন হাজার উনচল্লিশ জন সেনার নাম ছিল।

অন্যদিকে মার্চ মাসের ৩ বা ৪ তারিখ ইস্টার্ন কমান্ড হেড কোয়ার্টারে

জিটুআই মেজর মসিউদ্দৌলাহ তাঁর সহকর্মী ক্যাপ্টেন সালামকে দিয়ে পাকিস্তানি ও বাঙালি সৈনিকদের তুলনামূলক সৈন্যসংখ্যা ও শক্তির পরিসংখ্যান তাঁর বোন ফিরোজা বেগমের নজরুল সংগীতের এলপি রেকর্ডের কভারের ভেতরের অংশে চার্ট করে ফিরোজা বেগমের মাধ্যমে শেখ মুজিবের কাছে প্রেরণ করেন। বিশ্লেষণে তিনি বলেন যে, অতি সহজেই পাকিস্তানিদের নিরস্ত্র করা সম্ভব। মেজর মসিউদ্দৌলাহ ঢাকাস্থ ৫৭ ব্রিগেডের বিএম মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গেও দেখা করেন। এ ঘটনা তখন আমার জানা ছিল না। পরে জেনেছি।

১৪ মার্চ খুব সকালে মার্শাল ল হেডকোয়ার্টারের একটা উইলি জিপে করে আমি ঢাকার উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। ফেনীতে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করে সন্ধ্যার কিছুটা আগে ঢাকায় পৌঁছাই। কর্নেল ওসমানীর বাসায় গিয়ে শুনলাম, তিনি নেই। তাঁর ব্যাটম্যান জানাল, 'সাহেব হাইড আউটে (গোপন আস্তানায়) আছেন।' কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না। সে আমার পরিচিত ছিল। তাকে বললাম, জরুরি প্রয়োজনে কর্নেল ওসমানীর কাছে এসেছি। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করতেই হবে। তা না হলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে। অনেক বোঝানোর পর শেষ পর্যন্ত ব্যাটম্যান আমাকে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করল।

তারপর একজন যুবক ভক্সওয়াগন গাড়িতে করে আমাকে একটি বাড়িতে নিয়ে গেল। সেখানে কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা হলো। আমি তাঁর হাতে ৩ হাজার ৩৯ জন সেনার তালিকা দিয়ে বললাম, ঢাকায় বাঙালি সেনাদের সংখ্যা কম এবং ফাইটিং এলিমেন্ট নেই বললেই চলে। তবে পিলখানায় হাজার দেড়েক ইপিআরের সেনা আছে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার পরিকল্পনা করেছেন, 'সোয়াত' জাহাজ যদি দখল করা সম্ভব না হয়, তাহলে কর্ণফুলীর মোহনায় দুটি জাহাজ আড়াআড়িভাবে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দর অকেজো হয়ে যাবে। একই সময় ইপিআরের সেনাদের সহায়তায় ইবিআরসি সেনাদের দিয়ে নেভিকে ডিসআর্ম করা হবে। পাশাপাশি শুভপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে ফেনী নদী বরাবর ডিফেন্স নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে ফার্মবেস বানিয়ে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। ষোলশহর থেকে অগ্রসর হয়ে নতুনপাড়া দিয়ে প্রবেশ করে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অবস্থানরত ২০ বালুচকে ডিসআর্ম করে সম্পূর্ণ এলাকা প্রাথমিকভাবে শত্রুমুক্ত করে চট্টগ্রাম বেতারকে ব্যবহার করতে হবে। এভাবে ক্রমাগত যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব। এই কাজ করতে হলে আওয়ামী লীগের হাইকমান্ডের

অন্তত অর্ধেক নেতার চট্টগ্রামে অবস্থান করা দরকার।

কর্নেল ওসমানী সব কথা শুনে বললেন, এ বিষয়ে হাইকমান্ডের সঙ্গে আলোচনা না করে কিছু বলা সম্ভব নয়। তিনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দোতলায় গেলেন। কিছুক্ষণ পর নেমে এসে আবার গেলেন। কয়েকবার এভাবে গেলেন, আবার এলেন। তিনি সম্ভবত টেলিফোনে বঙ্গবন্ধু বা হাইকমান্ডের কারও সঙ্গে আলাপ করার জন্য দোতলায় যাচ্ছিলেন। অথবা দোতলায় গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিলেন, যেটা আমি জানতাম না। তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য হয়তো কর্নেল ওসমানী দোতলায় যাচ্ছিলেন। শেষে আমাকে বললেন, তিনি (ওসমানী) তাদের (বাঙালি সেনাদের) দুশ্চিন্তার কারণগুলো চিহ্নিত করতে পারছেন। তাদের পরিকল্পনার সারবত্তাও উপলব্ধি করতে পারছেন। কিন্তু তাঁরা (আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড) এ সম্পর্কে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত। সংগত কারণেই তাঁরা আলোচনায় বসে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে রাখার জন্য আলোচনার কোনো বিকল্প নেই। তা ছাড়া চট্টগ্রাম হলো 'কর্নার সিটি'। সেখানে তাঁরা গিয়ে কী করবেন? কর্নেল ওসমানী আরও বলেন, বিশ্ব জনমত গঠন এবং তা আমাদের দিকে রাখার জন্য আলোচনায় যেতে হবে। সে জন্য তোমরা খুব বেশি মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িত হবে না।

আমি তাঁর কথা শুনে মনে মনে বেশ রেগে গেলাম। তার পরও বিনয়ের সঙ্গে বললাম, যদি হাত-পা গুটিয়ে সবাই বসে থাকি, তাহলে তো ওরা (পাকিস্তানি) সময় ও সুযোগমতো বাঙালিদের ঘুমের ভেতরই মেরে ফেলতে পারবে। তারা যদি ডায়ালগে বিশ্বাসী হয়, তাহলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোপনে ৯ ও ১৬ ডিভিশনের সেনাদের উড়োজাহাজে করে নিয়ে আসছে কেন? তারা 'সোয়াত' জাহাজ থেকে গোলাবারুদ ও মিলিটারি সরঞ্জাম আনলোড করার জন্য ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে রীতিমতো গালমন্দ করছে। তারা সন্তর্পণে মিলিটারি বিল্ডআপ করছে। এটা হয়তো শো অব ফোর্স হতে পারে। আলোচনাই যদি করতে চায়, তাহলে এক ডিভিশন ট্রুপস থাকা সত্ত্বেও আরও দুই ডিভিশন ট্রুপস কেন আনছে? কর্নেল ওসমানী তেমন কোনো সদুত্তর তিনি দেননি। কিছুটা চিন্তিত স্বরে শুধু বললেন, 'ডু ইউ থিঙ্ক ইয়াহিয়া উড বি দ্যাট স্টুপিড দ্যাট হি উড অ্যালাউ ট্যাংক টু রোল ওভার সেভেন্টিফাইভ মিলিয়ন পিপল হু আর ইউনাইটেড টোগেদার লাইক সলিড রক অব জিব্রালটার আন্ডার ওয়ান ইউনিফাইড কমান্ড অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান? অ্যান্ড ইফ হি ডাজ দ্যাট উডবি দ্য অ্যান্ড অব পাকিস্তান', অর্থাৎ 'তুমি

কি মনে করো ইয়াহিয়া এত বড় বোকামি করবে? সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যারা বঙ্গবন্ধুর একক নেতৃত্বে রক অব জিব্রাল্টারের মতো এক হয়ে আন্দোলনরত, তাদের ওপর দিয়ে সে (ইয়াহিয়া) ট্যাংক চালাবে? আর যদি চালায়, তাহলে তা ডেকে আনবে পাকিস্তানের শেষ পরিণতি)। তারপর কিছুক্ষণ থেমে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, ' মাই সন, হোয়াই দে শুড বি সো ক্রুড? দে ক্যান সলভ দ্য প্রবলেম অ্যাক্রোস দ্য টেবিল', অর্থাৎ 'প্রিয় বৎস, তারা এতটা নৃশংস কেন হবে, টেবিলে বসেই তো তারা এই সমস্যার সমাধান বের করবে।'

চাকরিজীবনে ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল গুল হাসানের সঙ্গে কর্নেল ওসমানীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। ১৯৬৬ সালে ইয়াহিয়া খান ১৪ ডিভিশন সফরে এলে ওসমানী নিজের খরচে তদানীন্তন শাহবাগ হোটেলে (বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল হাসপাতাল) ইয়াহিয়া খানকে সংবর্ধনা দেন। ঢাকায় অবস্থানরত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব অফিসারকেও তিনি দাওয়াত দিয়েছিলেন। ওই সময় আমি সদ্য লেফটেন্যান্ট হিসেবে কমিশন পেয়েছি এবং তখন ঢাকায় ছিলাম। তিনি আমাকেও দাওয়াত দিয়েছিলেন। ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আবদুর রউফ (পরে ব্রিগেডিয়ার), মাসহুরুল হক (পরে ব্রিগেডিয়ার) এবং ফিরোজ সালাউদ্দিন (পরে ব্রিগেডিয়ার। মাটন সালাউদ্দিন নামে পরিচিত ছিলেন) একসময় ওসমানীর অধীনে কর্মরত ছিলেন। ওই সংবর্ধনায় তাঁরা তাঁদের কমান্ডিং অফিসার ওসমানীর দাঁত খিঁচিয়ে সাহেবি ইংরেজি বলা, তাঁর হাঁটাচলা, তাঁর অযৌক্তিক শাস্তিদানের পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে কৌতুক করেছিলেন। তাঁদের কৌতুক শুনে ইয়াহিয়া খানসহ উপস্থিত সবাই হাসতে হাসতে প্রায় ফ্লোরে পড়ে যাচ্ছিলেন।

আমার মনে হলো, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন, সে ব্যাপারে কর্নেল ওসমানীর মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকিস্তানিরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, এটা তাঁর মনে হচ্ছে না। তাই আমি আবারও বললাম, শুভপুর সেতু উড়িয়ে দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সব ব্যাটালিয়ন নিয়ে ফেনী নদী বরাবর শক্ত ডিফেন্স নেওয়া সম্ভব। ইপিআরের সাপোর্টে পার্বত্য চট্টগ্রামে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলা সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দর অকেজো করে সমগ্র অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব। আরও বললাম, চট্টগ্রামের বাঙালি সেনারা মানসিকভাবে প্রস্তুত। সুবেদার জালালের অধীনে রয়েছে আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশন। ক্যাপ্টেন আজিজ 'সোয়াত' জাহাজকে বন্দরে কড়া পাহারায় রেখেছে। যেকোনো সময়ে সোয়াত উড়িয়ে দেওয়ার ক্যাপাসিটি তাঁর রয়েছে।

অষ্টম বেঙ্গল ও ইবিআরসির রিক্রুট মিলে বালুচদের যে সেনাসংখ্যা, তাদের ডিসআর্ম করা যাবে। অষ্টম বেঙ্গলের অফিসার ও সেনারা সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে মানসিকভাবে প্রস্তুত। ইপিআরের ক্যাপ্টেন রফিক একপায়ে দাঁড়িয়ে আছেন বারুদে আগুন লাগানোর জন্য। ইপিআরের সদস্য ও ইবিআরসি দুই কোম্পানি নেভিকে ডিসআর্ম করতে পারা। কমোডর মমতাজের বাড়ির সামনে ইবিআরসির দুই এমজি স্টেডিয়ামের গ্যালারির ওপর বালুর বস্তা দিয়ে ট্রেঞ্চ বানিয়ে সারা রাত পজিশন নিয়ে থাকে। কিন্তু কালক্ষেপণ করলে বা সময় দিলে পাকিস্তানিরা রি-ইনফোর্স এনে তাদের দুর্বল অবস্থান সবল করে ফেলবে।

কর্নেল ওসমানী আমার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। শেষে বললেন, চলমান আলোচনা বৈঠকে আওয়ামী লীগ হাইকমান্ডের খোলা মনে অংশগ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। মেজরিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি সদ্যপ্রাপ্ত সাংবিধানিক ক্ষমতাবলে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অবশ্যই আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করতে পারবেন। তাই এই মুহূর্তে বাঙালি সেনাদের অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো কার্যক্রমে জড়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তবে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। কিন্তু চাকরিরত অফিসার বা সেনাদের এই মুহূর্তে কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত মুভমেন্ট করা ঠিক হবে না। সময়মতো সংকেতের ওপর কাজ করতে হবে। শৃঙ্খলার প্রতি বিশেষ নজর রাখতে হবে। ব্যক্তিগত কোনো অ্যাডভেঞ্চারিজমের ফলে সমস্ত সাংবিধানিক সাফল্য ও আলোচনা বৈঠক যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। শেষে আবার বললেন, তবে মানসিকভাবে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি বললাম, ব্রিগেডিয়ার মজুমদার মনে করেন, অনারারি ক্যাপ্টেন গোলাম মওলা বা আরও যাঁরা সিনিয়র প্রাক্তন সেনা আছেন, তাঁদের বিভিন্ন পল্টনে মেহমান হিসেবে পাঠিয়ে সর্বস্তরের সেনাদের মানসিক প্রস্তুতির কাজটি সম্পন্ন করা দরকার। ওসমানী আমাকে বললেন, বিষয়টি নিয়ে তিনি ভাববেন।

অথচ পরবর্তীকালে দেখি, আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড সিনিয়র প্রাক্তন সেনাদের বিভিন্ন পল্টনে না পাঠিয়ে ২২ বা ২৩ মার্চ ঢাকায় তাদের নিয়ে একটি সমাবেশ ও প্যারেড করে। প্যারেডে নেতৃত্ব দেন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল আশফাকুল মজিদ। ১৯২৪ সালে তিনি যখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে (স্যান্ডহার্স্ট মিলিটারি একাডেমি থেকে) কমিশন পান, তখন টিক্কা খান নয় বছরের বালক, ইয়াহিয়ার বয়স সাত বছর, গুল হাসান তিন

বছরের শিশু ও মিঠার বয়স এক বছর। ৭২ বছরের বৃদ্ধ মেজর জেনারেল মজিদ কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। অথচ ক্র্যাক ডাউনের পর তাঁকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হয়। কী ধরনের অপেশাজীবী সেনাবাহিনী হলে এমন নীতিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব?

অন্যদিকে ঢাকায় প্রাক্তন সেনাদের সমাবেশ হওয়ায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের ওপর শ্যেনদৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করে। তারা ধারণা করে, প্রাক্তন সেনাদের সমবেত করার পেছনে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের হাত আছে। প্রাক্তন সেনাদের একটি তালিকা রেকর্ড অফিস থেকে তিনি নিয়েছেন। আর ফেরত দেননি। এটা বোধ হয় পাকিস্তানিরা জেনে ফেলে। ফলে তাঁর ওপর পাকিস্তানিদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হতে থাকে।

যাহোক, আমি সেদিনই চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হই। গভীর রাতে চট্টগ্রামে পৌঁছে সরাসরি কর্নেল এম আর চৌধুরীর বাসায় যাই। সেদিন তিনি একা বাসায় ছিলেন। ওই দিনই তিনি তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের সিলেটে গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কর্নেল এম আর চৌধুরী আলাদাভাবে আমার কাছ থেকে কিছু না শুনে তখনই আমাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসায় যান। আমরা যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার মজুমদার রেডিও চালু করে ভলিউম বাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিনি এবং কর্নেল এম আর চৌধুরী আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে উদ্দেশ করে বললাম, 'স্যার, আমরা হয়তো খামাখা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলার জন্য এ ধরনের পাগলামি করে বেড়াচ্ছি। বরং সুবেদার জালালের অধীনে আগ্রাবাদ রেডিও স্টেশন এখনো আমাদের কর্তৃত্বাধীন আছে, আপনি সেখান থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দেন, পরে যা হবার হবে।' কর্নেল এম আর চৌধুরী মাথা নেড়ে সায় দিলেন। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার রাগতস্বরে সিলেটি ভাষায় বললেন, 'তোমার রক্ত গরম, কাঁচা মাথায় সব গোবর।' তারপর শুদ্ধ ভাষায় বললেন, 'শেখ মুজিব ছাড়া এ দেশের স্বাধীনতার ঘোষণা অন্য কেউ দিলে পৃথিবী তা গ্রহণ করবে না। কারণ, শেখ মুজিব একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ৭৫ মিলিয়ন মানুষের ভোট পেয়েছেন। আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি নিজে নিজে স্বাধীনতার ঘোষণা করে আর ইয়াহিয়ার মাথায় যদি সামান্য বুদ্ধি থাকে, তাহলে সে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে আমাদের সবাইকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ছাড়বে। বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিসব্যান্ড করে দেবে। তখন শেখ

মুজিবের কিছুই করার থাকবে না। এমনকি বাঙালিরা পর্যন্ত ভাববে যে উচ্চাভিলাষী বাঙালি মিলিটারিরা এক ইয়াহিয়াকে তাড়িয়ে আরেক ইয়াহিয়া হতে চেয়েছিল। সবাই সেটা বিশ্বাসও করবে। তবে হ্যাঁ, হারামজাদারা (পাকিস্তানি) যদি সত্যি সত্যি নিরীহ বাঙালি জনগোষ্ঠীকে আক্রমণ করে, তাহলে যে কেউ এই কাজটি করতে পারবে।' তারপর ইংরেজিতে বললেন, 'উই হ্যাভ টু ওয়েট টিল উই গেট অ্যাট দ্য নেক', অর্থাৎ 'যতক্ষণ পর্যন্ত গর্দানের ওপর ঘা না পড়ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' এ কথা বলার পর বললেন, 'যাও, আরাম করে ঘুমাও। কারোর সঙ্গে এসব বিষয়ে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা একেবারেই করবে না। মাথা গরম একেবারেই করা যাবে না।' এরপর এম আর চৌধুরী ও আমি ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কর্নেল এম আর চৌধুরী আমাকে মেসে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসায় চলে গেলেন।

১৫ মার্চ বিকেল তিনটায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। এ খবর আমরা আগে থেকেই জানতাম। রাতে আমরা জানতে পারলাম, সন্ধ্যায় ঢাকায় অবস্থানরত সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইয়াহিয়া সভা করেছেন।

এই সভায় পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আলোচনা হয়। পরে জানা যায়, ওই সভায় মিলিটারি অ্যাকশন নিয়ে কথা হয়। উপস্থিত জেনারেল মিঠার ভাষ্য অনুযায়ী পীরজাদা, বাবর ও আকবর মিলিটারি অ্যাকশন সফল হবে বলে অভিমত দেয়। এয়ার কমোডর এ মাসুদ (পূর্ব পাকিস্তানের এয়ার ফোর্স-প্রধান) বলেন, এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা এবং রাজনৈতিকভাবেই এর সমাধান হওয়া উচিত। এরপর ইয়াহিয়া তাঁকে প্রায় জোর করে বসিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে তাঁকে কমান্ড থেকে সরিয়ে দিয়ে চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয়। এর আগে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাও মিলিটারি অ্যাকশনের সফলতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এমনকি টিক্কা খানও পরিস্থিতি যে অত্যন্ত নাজুক এবং তার সঠিক মূল্যায়ন এখনো করা হয়নি বলে অভিমত দেন। মিঠা দুই কূল রক্ষা করে বলেন, পরিস্থিতি খুবই নাজুক, তবু সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালালে সামরিক বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবে। ইয়াহিয়াকে খুশি করার জন্যই কায়দা করে মিঠা তাঁর এই অভিমত ব্যক্ত করেন। ইয়াহিয়া টিক্কার বক্তব্যে বিরক্ত হন।[১৮]

---

১৮. সূত্র : *Unlikely Beginning A Soldier's Life*, Major General A O Mitha, Oxford University Press, Karachi, Pakistan 2003.

ইতিমধ্যে ইস্টার্ন কমান্ডের সিওএস ব্রিগেডিয়ার আল ইদ্রুস মিলিটারি অ্যাকশনের অসাড়তা সম্বন্ধে প্রকাশ্যে তাঁর অভিমত পেশ করেন। তাঁকেও পরবর্তী সময়ে সরিয়ে দিয়ে অকালে অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৫ মার্চের ওই সভা তাৎক্ষণিকভাবে আয়োজন করা হয়েছিল। সভার জন্য আগে থেকে কোনো ধরনের পেপার তৈরি করা হয়নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে বা কোনো ধরনের অপারেশন প্ল্যান প্রজেকশনের ভিত্তিতে কিংবা কোনো ধরনের কি-নোট পেপারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়নি। ভাসা ভাসা জ্ঞান থেকে, ক্ষেত্রবিশেষে মনগড়া বক্তব্যের ভিত্তিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষে ইয়াহিয়া বলেন, তিনি জানেন, মুজিবকে কীভাবে মানাতে হবে এবং না মানলে কীভাবে মানাতে হবে, তা-ও তাঁর জানা আছে। ইয়াহিয়া ঢাকায় আসার আগে করাচিতে ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করেন। এর আগে ভুট্টো দুই প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুজিবকে উদ্দেশ করে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, 'ইধার হাম, উধার তুম', অর্থাৎ এখানে আমি, ওখানে তুমি। যা শেষ পর্যন্ত সত্যে পরিণত হয়। এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমার ধারণা, ভুট্টো স্বজ্ঞানে ইচ্ছাকৃতভাবে এই উক্তি করেছিলেন। তাঁর এই উক্তিই বলে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে সব সময় কারা দেশটির অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ ছিল। বিস্ফোরণমূলক পরিস্থিতির মধ্যে প্রচণ্ড চাপের মুখে দাঁড়িয়েও শেখ মুজিব রাষ্ট্রনায়কোচিত আচরণ করে সমগ্র পাকিস্তানের মঙ্গলের কথা বলেছিলেন। সশস্ত্র বাহিনীকে ভাই হিসেবে সম্বোধন করে তাদের শুভকামনা জানিয়েছিলেন, যাতে সবার মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হয়। সেখানে ভুট্টো ভাঙনের কথা বলে বেড়াচ্ছিলেন আর অপরিণামদর্শী সামরিক জান্তা তাঁকে বাহবা দিচ্ছিলেন।

পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার এ আর সিদ্দিকী তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন, ২২ ফেব্রুয়ারির সভার পর জাতীয় পরিষদের প্রস্তাবিত অধিবেশন বন্ধ করার লগ্নে ১ মার্চ সকালে অফিসে এসেই তিনি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার (৩ মার্চ) পর প্রেসিডেন্টের ভাষণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথ অনুষ্ঠান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনির্দিষ্টকালের তা জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হোক, যাতে দুই বড় দল সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে। অধিবেশন বসা ও পরদিন বন্ধ ঘোষণা ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত ধারা প্রযোজ্য হবে না, অর্থাৎ বন্ধ ঘোষণার দিন থেকে তা গণনার মধ্যে পড়বে না। গণনা শুরু হবে দুই কমিটির চূড়ান্ত

প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরিষদ যখন সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য পরিপূর্ণভাবে বসবে, তখন থেকে। তার আগে নয়। জেনারেল পীরজাদা ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদে একবার বসতে পারলে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার আগে সংসদ ত্যাগ করবেন না। তখন সিদ্দিকী বলেছিলেন, শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য যদি তা-ই হয়ে থাকে, তাহলে এখনই তিনি তা করছেন না কেন? এখনই স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার মতো ক্ষমতা শেখ মুজিব রাখেন। অথচ তিনি কী করতে পারেন, এ ধরনের বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে পরিষদের অধিবেশন বন্ধ করার ঘোষণা দিয়ে আত্মঘাতী কার্যক্রম গ্রহণ করা ঠিক হবে না। বস্তুত ১ মার্চ সকালেই অস্থির সিদ্দিকীকে জেনারেল গুল হাসান জেনারেল হামিদের কাছে নিয়ে যান। হামিদ তাঁকে পীরজাদার কাছে পাঠান। পীরজাদা তখন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকীর তৎপরতায় মনে করেছিলেন, একটা ক্যু আসন্ন। এই ভয়ে তিনি কিছুটা ভীত ছিলেন। গুল হাসান তাঁকে এই ধারণা দেন। শেষে সিদ্দিকীর প্রস্তাব শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। অবশ্য সিদ্দিকীর প্রস্তাব কিংবা জি ডাবলু চৌধুরীর খসড়া ঘোষণাপত্র—কোনোটাই পাকিস্তানি জান্তা গ্রহণ করেনি। ফলে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে শেখ মুজিবের অনুকূলে চলে আসে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনসহ সবকিছুই শেখ মুজিবের কথামতো চলতে শুরু করে। সে ক্ষেত্রে দেরিতে হলেও ইয়াহিয়ার আগমন কিছুটা আশার সঞ্চার করে।

ইয়াহিয়া ঢাকায় আসার পর চট্টগ্রামে আমরা যাঁরা সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলাম, তাঁদের সবার দৃষ্টি ঢাকার দিকে নিবদ্ধ ছিল। আমরা সব ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে থাকি। ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া একান্তে শেখ মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। তারপর উপদেষ্টাসহ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে বলা হয়, অগ্রগতি হচ্ছে। ১৭ মার্চ আবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠক ফলপ্রসূ হয়েছে বলে ফলাও করে প্রচার করা হলো। এতে দেশবাসীর ভরসা বেড়ে গেল। তবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনা আসা অব্যাহত থাকে। ১৮ মার্চ বৈঠকের আলোচনায় অগ্রগতি হলো অনেকটা।

পরে খাদিম হোসেন রাজা ও পাকিস্তানি অন্য সেনা কর্মকর্তাদের লেখা থেকে জানা যায়, বৈঠক চলাকালেই টিক্কা খান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে সম্মতিসূচক উত্তর পাওয়ার পর খাদিম হোসেন রাজাকে অপারেশনাল প্ল্যান তৈরি করতে বলেন। খাদিম হোসেন রাজা ও রাও ফরমান আলী একত্রে বসে সেই প্ল্যান তৈরি করেন। রাও ফরমান আলী জেনারেল ইয়াকুবের প্রদত্ত অপারেশন অর্ডার 'ব্লিজৎ'-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন।

অপারেশনাল অর্ডারটি ১৬ অনুচ্ছেদের (প্যারা) ছিল। ২০ মার্চ সেটি জেনারেল হামিদকে পড়ে শোনানো হয়। অর্ডারের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। হামিদ অপারেশন শুরু করার আগে বাঙালি সেনাদের ডিসআর্ম করার প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তবে পিলখানায় প্যারামিলিটারি (ইপিআর) ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনের পুলিশদের ডিসআর্ম করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। 'অপারেশন সার্চলাইটে' ২৫ মার্চ সন্ধ্যার পর মুজিবকে বৈঠকের নামে ডেকে এনে গ্রেপ্তার করার প্রস্তাব ছিল। ইয়াহিয়া শেষ মুহূর্তে এই প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

ইয়াহিয়া-মুজিবের বৈঠকে দেশের মানুষ উৎসাহিত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের তৎপরতায় আমাদের মনে সন্দেহ বাড়তেই থাকে। ক্যাপ্টেন রফিক ১৭ মার্চ সন্ধ্যার পর এক গোপন সভা ডাকেন। এতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের চৌধুরী খালেকুজ্জামান, অলি আহমদ, লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী এবং কাপ্তাই থেকে ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী যোগ দেন। ক্যাপ্টেন রফিক ওই সভায় আমাকেও যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। আমি যাইনি বলে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন রফিক প্রথমে তাঁর বাসায় কিছুক্ষণ বৈঠক করেন। পরে তাঁরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ান আলমের বাসায় বৈঠক করেন। সেখানে আওয়ামী লীগের আতাউর রহমান খান কায়সার, ডা. জাফরসহ আরও কয়েকজন যোগ দেন। তাঁরা সমগ্র পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ক্যাপ্টেন রফিক ১৮ মার্চ মেজর জিয়া ও কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন এবং পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। এটা অবশ্য আমি তখন জানতাম না। পরে জানতে পারি। অন্যদিকে জিয়া এক লেখায় উল্লেখ করেন, তিনি ও কর্নেল চৌধুরী রফিকের সঙ্গে ১৭ মার্চ মিলিত হয়েছিলেন।

১৮ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রাম সাব জোনাল মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে আমাকে কোম্পানিসহ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ফিরে যেতে বলা হয়। পরদিন ১৯ মার্চ আমি ৫২টি ট্রাক ডিরিকুইজিশন করে কোম্পানিসহ চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ফিরে যাই। ট্রাকগুলো ডিরিকুইজিশন করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য কর্নেল শিগ্রি বারবার তাগাদাও দিচ্ছিলেন। সাব জোনাল মার্শাল ল হেডকোয়ার্টার থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই কোম্পানিকে স্টেডিয়াম থেকে সেনানিবাসে ফিরিয়ে নেওয়া একটা মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। আমি ভেবেছিলাম, সামরিক জান্তার সঙ্গে আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ইবিআরসির পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলার

কর্মকাণ্ড ঝিমিয়ে পড়ে।

২০ মার্চ ইবিআরসিতে পিটি-প্যারেড চলাকালে খবর ছড়িয়ে পড়ল, জয়দেবপুরে ফায়ারিং হয়েছে। কিছু নিরীহ লোক হতাহত হয়েছে। এ খবরে সঙ্গে সঙ্গে গোটা সেনানিবাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লেও তা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়।

পরে জানা যায়, ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার পাকিস্তানি ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব ইউনিট ভিজিটে (দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল) জয়দেবপুর গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন র‍্যাংকের অফিসারসহ ৭০ জনের মতো সৈনিক ছিল। স্থানীয় জনগণ ভেবেছিল, তিনি দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ডিসআর্ম করার জন্য এসেছেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং ব্যারিকেড সৃষ্টি করে তাঁদের ঢাকা অভিমুখী যাত্রাকে প্রায় রুদ্ধ করে দেয়। এ সময় টাঙ্গাইল থেকে আসা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের কিছু সৈনিক জনগণের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনগণের প্রতিরোধকে সশস্ত্র রূপ দেয়। অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে শ্রমিকেরা অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে হাজির হয়। ওই দিন বাজারের দিন ছিল। হাজার হাজার মানুষ বাজারে সমবেত হয়েছিল। বাজার করতে আসা মানুষও এতে শামিল হয়। ব্রিগেড কমান্ডার জাহানজেব জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক কর্নেল মাসুদুল হাসান খানকে বারবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানির অধিনায়ক মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (বীর বিক্রম। পরে মেজর জেনারেল, রাষ্ট্রদূত এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা। ওই ঘটনার মাস কয়েক আগে তিনি জিওসি খাদিম হোসেন রাজার এডিসি ছিলেন) ফাঁকা গুলি করে সময় নিতে চাইছিলেন। তখন ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব তাঁর সঙ্গে আসা সেনাদের ফায়ার করার নির্দেশ দেবেন বলে হুমকি দেন। এ অবস্থায় মেজর মইনুলের অধীন সেনারা তাঁর নির্দেশে জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি করলে হুরমত, মনু খলিফা ও নিয়ামত নামে তিনজন নিহত এবং বহু লোক হতাহত হয়। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কয়েকজন সেনার কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে উত্তেজিত জনতাও পাল্টা গুলি করে। মেজর মইনুল শেষ পর্যন্ত বহু কষ্টে জনতাকে বুঝিয়ে ব্যারিকেড উঠিয়ে ব্রিগেড কমান্ডার জাহানজেবকে ঢাকা ফেরত পাঠাতে সমর্থ হন। পরে কর্নেল মাসুদুল হাসানকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অকথ্য নির্যাতন করা হয়।

২১ মার্চ ছিল রোববার। সকালে হঠাৎ খবর এল, সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান ইবিআরসি ভিজিটে আসছেন। আরও জানানো হয়, তিনি

দুপুরে লাঞ্চ করবেন। তাঁর সঙ্গে ১৪-১৫ জন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা থাকবেন। সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদের আসার খবর পেয়ে আমরা বেশ হকচকিত হই। আমাদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয় কেন তিনি আসছেন। ছুটির দিন সত্ত্বেও তাড়াহুড়ো করে লাঞ্চের বন্দোবস্ত করা হয়। জেনারেল হামিদ, জিওসি খাদিম হোসেন রাজা, এজি খোদাদাদসহ ১৪-১৫ জন সিনিয়র অফিসার আসেন। প্রথমে তাঁরা ২০ বালুচের হেডকোয়ার্টারে যান। পরে আমরা জানতে পারি, সেখানে তাঁরা ২০ বালুচের অধিনায়ক কর্নেল ফাতেমির সঙ্গে একান্তে বৈঠক করেন। তারপর তাঁরা ইবিআরসিতে আসেন এবং ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন।

লাঞ্চে অন্যান্য ইউনিটের মেজর ও তদূর্ধ্ব র‍্যাংকের সেনা কর্মকর্তাদের দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। লাঞ্চ চলাকালে মেস ওয়েটার জেনারেল হামিদকে তাঁর প্রিয় পানীয় ব্ল্যাক ডগ পরিবেশন করে। মেস সেক্রেটারি হিসেবে আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। জেনারেল হামিদ গ্লাসে কয়েক চুমুক দেওয়ার পর আমি তাঁর কাছে গিয়ে বিনীতভাবে বললাম, 'স্যার, জনপ্রতিনিধিদের কাছে যেন অনতিবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।' এ কথায় তিনি কয়েক সেকেন্ড বাঁকা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। জেনারেল হামিদের চোখ ছিল ছোট। তাঁর মা ছিলেন বার্মিজ। কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর তিনি আমাকে বললেন, 'হোয়াই ইউ আর সো এক্সাইটেড?' অর্থাৎ 'তুমি এতটা উত্তেজিত কেন?' আমি তাঁকে বললাম, 'স্যার, যদি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে, তাহলে তো আমাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবেরা সেনাবাহিনীর গুলিতে পাখির মতো মারা যাবে। আমার মতো অন্য যারা কর্মরত থাকবে, তারা কি তখন নীরবে দাঁড়িয়ে এই মৃত্যুযন্ত্রণা দেখতে থাকবে?' আমি তাঁর মুখের ওপর বলেছিলাম, 'ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট উই উইল রিমেইন অন লুকারস?' আমি এ জন্যই বলেছিলাম, যাতে তাঁরা এ মেসেজটা গ্রহণ করেন যে এটা আনচ্যালেঞ্জড অবস্থায় যাবে না।

আমার এ কথায় জেনারেল হামিদ বোধ হয় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'ডোন্ট ওরি, শেখ মুজিব ইজ বিকামিং প্রাইম মিনিস্টার অব পাকিস্তান', অর্থাৎ ভেবো না, শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন।'

এসবই ছিল পাকিস্তানিদের অতি চালাকি কথাবার্তা এবং ভেতরে ছিল সব ফাঁকা। তলে তলে তারা মিলিটারি অ্যাকশনের প্রস্তুতি নিয়েছে, কিন্তু সমস্যার ডাইমেনশন ও গভীরতা কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পারেনি। ক্যালকুলেশন

করে দেখলে দেখা যাবে, পূর্ব পাকিস্তানে তাদের মোট সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২ হাজার। এর মধ্যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টসহ বাঙালি সেনাসংখ্যা ছিল প্রায় ছয় হাজার। আর ইপিআরকে যদি ধরা হয়, তবে ইপিআরে ছিল ১৪ হাজার সেনা। এর মধ্যে হাজার দুয়েক অবাঙালি বাদ দিলে ১১ থেকে ১২ হাজার ইপিআর ছিল আমাদের সঙ্গে। পূর্ব পাকিস্তানে ২০ হাজার বাঙালি ট্রুপস ছিল পুলিশ বাদেই। আমরা যদি ভালোভাবে প্ল্যান করে তাদের আগেই আঘাত করতাম, তাহলে কিন্তু তারা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে যেত। আমরা সেই জায়গায় যাইনি বলেই কিন্তু আমাদের বড় মূল্য দিতে হলো এবং এটা দেওয়া ছাড়া কোনো উপায়ও ছিল না। কর্নেল ওসমানী আমাকে প্রথম দিনই বলেছিলেন যে বিশ্ব জনমতকে আমাদের দিকে আনতে হলে আমাদের আলোচনায় বসতে হবে। আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র নেই। ফলে আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং মানুষ যা চায়, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেটা আমরা পাকিস্তানিদের কাছে ডিমান্ড করছিলাম। এই জিনিসটাকে বড় করে দেখার জন্য আমরাও শেষ পর্যন্ত মনে করলাম, কোনো মুভমেন্ট আমরা করব না। ফলে পাকিস্তানি সেনারা সুযোগ পেয়ে জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি আগেই আঁচ করতে পারতাম যে ২৫ তারিখেই তারা আমাদের ওপর আক্রমণ করবে, তাহলে কিন্তু মানসিকভাবে এবং ফিজিক্যালি আমরা বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাইরে নিয়ে যেতাম। আমাদের পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতাম। আমরা বাঙালি সেনাসদস্যরা একা থাকলে যুদ্ধপ্রস্তুতি নেওয়া আরও সহজ হতো। চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে। সুতরাং এখন সবাই নানান ধরনের কথা বলতে পারে। কিন্তু তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীতে কর্মরত আমাদের কারও সঙ্গে দেখা করেননি বা নিজে সামরিক বাহিনীর লোকদের সরাসরি তেমনভাবে উৎসাহিত করেননি। তার প্রধান কারণই ছিল যাতে কেউ বলতে না পারে তিনি বিচ্ছিন্নতাবাদী। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, ওই সময় এডওয়ার্ড কেনেডি থেকে শুরু করে যতজনই এসেছেন পাকিস্তানে, সবাইকে পাকিস্তানিরা বলেছে, শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনকে উৎসাহিত করে পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার মতলব আঁটছিলেন। পাকিস্তানিরা এটা বলেছে বটে, প্রমাণ করতে পারেনি। বিদেশিরা বুঝতে পেরেছে, শেখ মুজিব পরিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের চেষ্টা করেছিলেন। প্রকারান্তরে বলা যায়, একমাত্র শেখ মুজিবই পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য নানান

ধরনের গঠনমূলক প্রস্তাব তাদের কাছে দিয়েছিলেন। বাঙালিদের অধিকার সংরক্ষিত করেই তিনি এই প্রস্তাবগুলো দিয়েছিলেন। তাদের স্বার্থও রক্ষা করেছিলেন। পাকিস্তানের সংহতিকে কোনো-না-কোনোভাবে রাখতে চেয়েছিলেন বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। তিনি সেটা খুব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে এবং নিজের ও বাঙালিদেরও অবস্থানকে ঠিক রেখে এবং স্বাধীনতা ঘোষণার সুযোগ রেখে তিনি পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই সব ধরনের প্রস্তাব দিয়েছেন। পাকিস্তানিরা সে সুযোগটা গ্রহণ করেনি, এটাই দুর্ভাগ্য।

এটা তারা পরেও করতে পারত। ৩ ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ৬ তারিখ থেকে কিন্তু পাকিস্তান বুঝতে পেরেছ যে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই। ৬ তারিখে তারা বঙ্গবন্ধুকে ঢাকায় এনে তাঁর কাছে যদি তারা সারেন্ডার করত, তাহলে কিন্তু সমস্যাগুলোর সুন্দর সমাধান হয়ে যেত। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রয়োজন হতো না। এর আগেই একটা ফয়সালা করে তারা সসম্মানে তাদের দেশে ফিরে যেতে পারত। সেটাও তাদের মাথায় আসেনি।

যাহোক, চট্টগ্রাম সিএমএইচের অধিনায়ক কর্নেল বি এ চৌধুরী এক কোনায় দাঁড়িয়ে জেনারেল হামিদের সঙ্গে আমার কথোপকথন শুনছিলেন। তিনি আমাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'এই হারামজাদাদের সঙ্গে কিসের অনুনয়-বিনয়। আরে মিয়া, দুই-চারটাকে ফেলে দাও। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে যাব, পাকিস্তানও বেঁচে যাবে।'

২৫ মার্চের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী বি এ চৌধুরীকে তাঁর কলেজগামী মেয়েসহ বন্দী করে। ডাক্তার মেজর সাঈদা করীমের হস্তক্ষেপে তাঁর মেয়ে নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়। ১৮ এপ্রিল পাকিস্তানি সেনারা বেয়নেট চার্জ করে বি এ চৌধুরীকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে (লেফটেন্যান্ট আকন্দ [জাহাঙ্গীর], মেজর [ডাক্তার] রহমান ও ক্যাপ্টেন বাশারসহ অন্যদের) হত্যা করে।

২২ মার্চ কুমিল্লা থেকে বালুচ রেজিমেন্টের জন্য কিছু অস্ত্র আনা হয়। সেনানিবাসের প্রবেশপথে ইবিআরসির গার্ড বাধা দেয়। পরে ২০ বালুচের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দিতে অনুমতি দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে ফিরে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার আমাকে বলেছিলেন, ওই অস্ত্র থেকে কিছু রাইফেল, এলএমজি ও অন্য অস্ত্রশস্ত্রসহ গোলাবারুদ তিনি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের জন্য পাঠান।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে ইবিআরসিতে বড়াখানা প্রীতিভোজে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার তাঁর বড় ছেলেকে নিয়ে ইউনিট লাইনে আসেন। তিনি সেনাদের

উৎসাহিত করেন। সেনারা তখন সব সময় নিজের কাছে অস্ত্র রাখত। এটা জেনে তিনি উৎসাহ বোধ করেন। বললেন, আত্মসম্মান নিয়ে ডিউটি করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই অস্ত্র জমা করা যাবে না। অস্ত্র হাতে নিয়ে ডিউটি করা সেনাদের অধিকার। এই অধিকার যে-ই খর্ব করতে আসবে, তাকে বাধা দিতে হবে। পরদিন ছিল ২৪ মার্চ। সেদিন এবং পরবর্তী কয়েক দিনের ঘটনা আগেই লিখেছি।

আগরতলা থেকে দিল্লি

সীমান্ত অতিক্রম করার পর আমি প্রথমে যাই সীমান্তের বিএসএফ ক্যাম্পে। ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশন অফিসের প্রথম সেক্রেটারির দেওয়া স্লিপ দেখানোর পর তারা আমাকে একটা ঘরে নিয়ে রাখে। দুদিন পর তারা আমাকে আগরতলার বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। ৯১ বিএসএফ হেডকোয়ার্টারের অধিনায়ককে আমাকে দেওয়া ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের প্রথম সচিবের চিরকুটটা দেখাই। তিনি আমাকে আগরতলায় থাকতে বললেন। তাদের তত্ত্বাবধানে একটি বাড়িতে থাকি। আগরতলায় গিয়ে জানতে পারি কে কোথায় আছেন। ৩১ মার্চ সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম আর সিদ্দিকীর সঙ্গে আমার দেখা হয়। এম আর সিদ্দিকী তাঁর মার্সিডিজ গাড়ি নিয়েই আগরতলায় এসেছিলেন। তখন একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিলেন। রেহমান সোবহান আমাকে বললেন, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ গো টু দ্য ফ্রন্ট, হোয়াট ইউ আর ডুয়িং হিয়ার?' অর্থাৎ 'তুমি রণাঙ্গনে যাচ্ছ না কেন, এখানে তুমি কী করছ?' তাঁর এই প্রশ্নে আমি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই। আমতা আমতা করে বললাম, দুই-চার দিনের মধ্যেই আমি ফ্রন্টে যাব।

আমি আগরতলায় থাকাবস্থায় একদিন ক্যাপ্টেন রফিক সেখানে আসেন। টেলিফোন করে ৯১ বিএসএফের কাছ থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্র চান। বিএসএফ অধিনায়ক আমাকে এ কথা জানান। তিনি আমাকে আরও বললেন, ক্যাপ্টেন রফিক উদ্বিগ্ন অবস্থায় টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন, তাঁর অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রয়োজন। এর মধ্যে বিএসএফের মাধ্যমে মেজর খালেদ মোশাররফ জানতে পারেন, আমি আগরতলায় আছি। তিনি আমাকে চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দেওয়ার জন্য বার্তা পাঠান। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। কিন্তু তার আগেই বিএসএফ অধিনায়ক জানালেন, আমাকে

দিল্লি যেতে হবে। তারপর ৩ এপ্রিল আমাকে বিমানে করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েক দিন ধরে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

প্রথম দিন গোয়েন্দা সংস্থার সরদারজি নামের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। সরদারজির প্রশ্ন শুনে মনে হলো, পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর ধারণা খুবই সীমিত। তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বলতে শুধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব ও মওলানা ভাসানীর নাম জানেন। তাজউদ্দীন আহমদসহ অন্য উল্লেখযোগ্য কারোর নাম মনে হয় তিনি জানতেন না। আরও মনে হলো, ছয় দফা এবং এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কেও তাঁর ধারণা সীমিত। আমি যখন বললাম, মওলানা ভাসানী একজন খাঁটি মুসলমান, তবে তিনি পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক এবং শোষিত মানুষের পক্ষে বলিষ্ঠ এক কণ্ঠস্বর। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা লালন করেন। তখন সরদারজি বললেন, ভাসানী চীনপন্থী কমিউনিস্ট। তিনি এই মুহূর্তে পিকিংয়ে (বর্তমানে বেইজিং) বসে পাকিস্তান মিলিটারি অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাঁর কথা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। হেসে বললাম, মওলানা ভাসানী সুযোগ পেলে পানি পড়াও বিক্রি করতে পারেন। সেই অর্থে তিনি কস্মিনকালেও কমিউনিস্ট নন।

তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মানবদরদি ও জননন্দিত জননেতা হিসেবে তাঁর পক্ষে মানুষের বিরুদ্ধে তথা মানবতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। তিনি মানুষের চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারেন যে মানুষ কী চায়। একজন প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ হিসেবে মানুষ যা চায়, তিনি তার পক্ষেই থাকবেন। আমি বললাম, পাকিস্তান সেনাবাহিনী শেখ মুজিবকে হয়তো হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে ভাসানীকে পেলেই হত্যা করবে। বাংলাদেশের নদীনালা ও রাস্তাঘাট তাঁর নখদর্পণে। যেকোনো মুহূর্তে তিনি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে আসবেন।

দুদিন পর ৬ এপ্রিল হন্তদন্ত অবস্থায় সরদারজি এসে আমাকে বললেন, 'আমীন, ইউ আর সো রাইট, মওলানা ভাসানী ইজ ইন ইন্ডিয়া।' (অর্থাৎ তোমার অনুমান একেবারে সঠিক, মওলানা ভাসানী ভারতে এসে গেছেন)। আমি সরদারজিকে বললাম, রাজনৈতিক ও যুবনেতাদের মধ্যে যদি বিভক্তি দেখা দেয়, তাহলে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের মধ্যেও বিভক্তি সৃষ্টি হবে। তবে আমার মনে হয়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব একত্র হয়ে কাজ করবেন। রাজনৈতিক অল্প কিছু মানুষ ছাড়া প্রায় সবাই শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জারি রেখে এক অভূতপূর্ব জাতীয় ঐক্য স্থাপন করেছে।

এই ঐক্যকে ধরে রেখে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত এবং লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। ভারতকে প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সাপোর্ট দিতে হবে। যুদ্ধ তিন বছরই হোক আর পাঁচ বছরই হোক, বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত। কারণ, এই যুদ্ধ কোনো দলভিত্তিক কিংবা রাজনৈতিক দর্শনভিত্তিক নয়।

সরদারজি আমার কথায় বেশ আগ্রহ বোধ করলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'হোয়াই বাংলাদেশ', অর্থাৎ 'কেন বাংলাদেশ?' উত্তরে তাঁকে বললাম, আমি এই প্রশ্নের উত্তর লিখিতভাবে দেব। তিনি আমাকে সুযোগ দিলেন। আমি প্রায় ৫৪ পৃষ্ঠার একটি ইংরেজি প্রতিবেদন লিখলাম। কোথায় কীভাবে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে মাঠ-ময়দানসহ বিশ্বদরবারে সাহায্য করতে পারে, তার একটি প্রতিচ্ছবি আমার সীমিত জ্ঞান দিয়ে প্রজেক্ট প্রোফাইলের মতো করে লিখলাম। সরদারজি বেশ আগ্রহের সঙ্গে আমার লিখিত প্রজেক্ট প্রোফাইল নিয়ে গেলেন। পরে জানালেন, আমাকে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু হঠাৎ ৭ এপ্রিল আমাকে বিমানে করে আগরতলায় পাঠানো হলো। সেখানে বিএসএফ ও নিরাপত্তা সংস্থার তত্ত্বাবধানে একটি বাড়িতে রেখে দিল।

আগরতলা জেলে কিছুদিন

১৩ এপ্রিল বিএসএফের মজুমদার (ইউনিফর্ম পরে না থাকায় তাঁর পুরো নাম জানতে পারিনি। তিনি নিজেকে পরিচয় দেন মজুমদার বলে।) নামের একজন কর্মকর্তা আমাকে জিপে করে আগরতলা থেকে সাব্রুম নিয়ে যান। ফেনী নদীর তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটি নগর পঞ্চায়েত (সিটি কাউন্সিল) হচ্ছে সাব্রুম। আগরতলা থেকে সাব্রুমের দূরত্ব প্রায় ১৩০ কিলোমিটার। পথিমধ্যে মজুমদার বললেন, তাঁদের পৈতৃক বাড়ি বাংলাদেশেই ছিল। ছোটবেলার স্মৃতি এবং ভারতের নকশাল আন্দোলন নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললেন। সাব্রুমের নদীর কাছে পৌঁছে দেখতে পেলাম, বাংলাদেশ থেকে আসা অনেক শরণার্থী। তারা ভারতে প্রবেশ করছে। লোকমুখে জানা গেল, ১১ এপ্রিল কালুরঘাটে যুদ্ধ হয়েছে। সেই যুদ্ধে ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। সম্ভবত মারা গেছেন। তাঁর সঙ্গী লেফটেন্যান্ট শমসের মবিন চৌধুরী আহত অবস্থায় পাকিস্তানিদের কাছে ধরা পড়েছেন। মনটা আমার বিষণ্ন হয়ে গেল। মনে পড়ল, ১৭ মার্চ হারুনের সঙ্গে ইবিআরসির মেসে কত গল্পগুজব করেছিলাম। শমসের মবিনের সঙ্গে ২৩ মার্চ শেষ দেখা হয়েছিল। হারুন ও শমসের মবিন চৌধুরী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার। হারুন আহমেদ চৌধুরী আমার চেয়ে সিনিয়র হলেও আমি ও ক্যাপ্টেন হারুন একাডেমিতে একই সময় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর সাব্রুম বিওপিতে গ্লাভস ও গলফ ক্যাপ পরিহিত মেজর জিয়া এলেন। তাঁর সঙ্গে ক্যাপ্টেন অলি আহমদ।

জিয়া আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কীভাবে ঢাকা থেকে পাকিস্তানিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এখানে এলে?

উত্তরে আমি ২৪ থেকে ২৯ মার্চ পর্যন্ত ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিলাম। ২৭ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার মতিঝিলের আমিন কোর্টে আমাকে ড্রপ করে

গেন্ডারিয়ায় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে চলে যান। ২৯ মার্চ আমি যখন ঢাকা থেকে বের হয়ে আসছিলাম, তখন তাঁকে (ব্রিগেডিয়ার মজুমদার) সঙ্গে নিয়ে ভারতে যাওয়ার জন্য গেন্ডারিয়াতে গেলাম। সেখানে গিয়ে জানতে পারি, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে। আমার বর্ণনার মাঝখানে মেজর জিয়া হঠাৎ বলে উঠলেন, 'You are telling bloody lies.' (তুমি মিথ্যা কথা বলছ)। জিয়ার এই কথায় আমি কিছুটা হতভম্ব হলাম এবং প্রচণ্ডভাবে রাগান্বিত হলাম। পাশে ক্যাপ্টেন অলি বসে ছিলেন। তিনি কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন।

মেজর জিয়া আমাকে বর্ণনা অব্যাহত রাখতে বললেন। আমি বললাম, 'আই রিফিউজ টু টক উইথ ইউ', অর্থাৎ 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে নারাজ।' এরপর আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি। আমি জিয়ার সামনে থেকে দূরে সরে গেলাম। বিএসএফের মজুমদার ক্যাপ্টেন অলির কাছে গিয়ে আমার ব্যাপারে অনুরোধ করলেন, যাতে জিয়া আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা বা সে ধরনের কোনো উদ্যোগ না নেন। অলি উত্তরে তাঁকে আশ্বাস দিলেন, আমার কিছু হবে না। মেজর জিয়া কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন অলিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। মজুমদার আমাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলায় ফেরত এসে আগরতলা থানায় আমাকে সোপর্দ করলেন। থানা কর্তৃপক্ষ আমার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচয়পত্র, মানিব্যাগ (এর ভেতরে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও লাহোর জিমখানা ক্লাবের কার্ড ও ১৪ মার্চের লিভ সেকশনের দেওয়া চিঠিটা ছিল) এবং হাতের কেমি ঘড়ি জমা রাখল। ১০ বছর আগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো ফল করায় ছোট ফুফু আমাকে ঘড়িটা উপহার দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বহু চেষ্টা করেও ওই জিনিসগুলো আমি আর ফেরত পাইনি।

থানা কর্তৃপক্ষ আমাকে হাজতে রাখল। হাজতখানার দুর্গন্ধই সবচেয়ে বাজে অভিজ্ঞতা। একটু পর দুজন বাঙালি সেনাকে হাজতখানায় এনে রাখা হলো। একজনের নাম রবিউল, অপরজনের নাম মনে নেই। তারা ছুটিতে বাড়িতে ছিল। স্থানীয় লোকজন তাদের পাকিস্তানের চর হিসেবে আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। তাদের মারধরও করা হয়েছে। সম্ভবত গ্রামের প্রভাবশালী কারও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকেই তাদের এ দুর্গতি। সারা রাত থানার হাজতখানার শিক ধরে কোনোমতে কাটালাম। ভোরে কয়েকজন বিএসএফ সদস্য ও থানার পুলিশ আমাকে আগরতলা জেলে নিয়ে গেল। জেল কর্তৃপক্ষ আমাকে তাদের হেফাজতে নেওয়ার আগে আমি বিএসএফের তত্ত্বাবধানে থাকলাম। এ সময় তাদের কথাবার্তা শুনে যতটুকু অনুমান করতে

পারলাম, মেজর জিয়া বিএসএফ ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তাসহ অন্যদের বলেছেন, আমি নাকি পাকিস্তানের চর। সেই হিসেবে শনাক্ত করে তিনি ফায়ারিং স্কোয়াডে আমাকে শাস্তি দেওয়ার কথাও নাকি বলেছেন।

বিএসএফ ও গোয়েন্দা সংস্থা তাঁর কথায় বিভ্রান্ত হয়ে আমাকে আগরতলা জেলে নিয়ে এসেছে। জেল কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ সেলে আমাকে রাখল। ওই সেলের অধিকাংশ ছিলেন নকশালের সদস্য। পরে তাঁদের প্রায় সবার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বর্ণাঢ্য চরিত্রের অধিকারী—উমাশঙ্কর মজুমদার। তাঁর বাবা চিকিৎসক ছিলেন। চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লায় ডাক্তারি করতেন। তিনি ১৯৬৬ সালে ফজলুল কাদের চৌধুরীর রোষানলে পড়েন। তখন উমার বাবা তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে উমা ভারতবাসী। কিন্তু বাবা-মা ছিলেন বাংলাদেশে। উমাকে জেল সুপারসহ সবাই যথেষ্ট সমীহ করত। দুই-তিন দিন পর শ্রীমঙ্গলের ফিনলে চা-বাগানের ম্যানেজার পরিবারসহ আমার সঙ্গে যোগ দিল। কয়েক দিন পর খবর পেলাম, আমার পাশের সেলে পাকিস্তানি কর্নেল খিজির হায়াত খান, মেজর সাদেক নেওয়াজসহ বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাকে রাখা হয়েছে। খিজির হায়াত খান ও সাদেক নেওয়াজ চতুর্থ বেঙ্গলে কর্মরত ছিলেন। বিদ্রোহের পর মেজর খালেদ মোশাররফ তাঁদের হত্যা না করে ভারতে পাঠিয়ে দেন।

পরে জানতে পারলাম, ক্যাপ্টেন ইকরামুল মজিদ সায়গলও আগরতলা জেলে আছেন। সায়গলের ঘটনা আরও বেশি চমকপ্রদ। তাঁর বাবা মেজর আবদুল মজিদ সায়গল দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৫৬-৫৮ সালে তিনি রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাটালিয়ন কমান্ড করেন। তখন তাঁর অধীনে জিয়াউর রহমান, সফিউল্লাহ (কে এম সফিউল্লাহ বীর উত্তম, পরে মেজর জেনারেল, সেনাবাহিনীর প্রধান, রাষ্ট্রদূত ও সাংসদ) কর্মরত ছিলেন। ইকরামুল মজিদ সায়গল জন্মের পর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের স্নেহে বড় হন। তাঁর মা ছিলেন বাঙালি। বগুড়ার নবাব পরিবারের মেয়ে। সায়গল পরে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি থেকে কমিশন পেয়ে (৩৪ পিএমএ) ১৯৬৫ সালে বাবার প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দেন। নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর আক্রমণে সায়গল দারুণভাবে মর্মাহত হন। তখন তিনি ঢাকা সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন হিসেবে কর্মরত। সেখান থেকে পালিয়ে নরসিংদীতে গিয়ে দ্বিতীয় ইস্ট

বেঙ্গলের সঙ্গে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য। কয়েকটি অপারেশনে তিনি সফলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সায়গলের। দুর্ভাগ্য দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের। অবস্থার প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাঁর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, সায়গলের মুখের আদল ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর মতো। বাঙালি সিএসপি আজিম উদ্দিনের সঙ্গে সায়গলের বোনের বিয়ে হয়। সায়গল ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারত। তবে সহজেই বোঝা যেত সে বাঙালি নয়। তাই দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল সায়গলকে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। কর্নেল ওসমানীসহ অনেকে তাঁকে চিনত। ওসমানী তাঁকে ছেলের মতো দেখতেন। সায়গল বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। তার পরও যুদ্ধের ময়দানে কেউ তাঁকে সাহায্য করতে পারেনি। এটা নিয়ে তাঁর আক্ষেপ ছিল।

এপ্রিল মাসের ২১ বা ২২ তারিখে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন সদস্য জেলখানায় আসেন। তাঁর সঙ্গে আমি দিল্লি গিয়েছিলাম। তিনি এসে জেলে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। একটু পর আমাকে সঙ্গে নিয়ে আগরতলা শহর ঘুরলেন। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'কমিউনিকেশন গ্যাপের দরুন এ ঘটনা ঘটেছে। তুমি কি জিয়ার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলে?' বললাম, আমার জন্য ভালো হতো চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের অধীনে যুদ্ধ করলে। এতে আমি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম। কিন্তু চট্টগ্রামে একসঙ্গে প্রতিরোধযুদ্ধ করার জন্য মার্চ মাসের শুরুতেই জিয়ার সঙ্গে শপথবদ্ধ হয়েছিলাম। তাই তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। দুপুরে তিনি আমাকে আগরতলার একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন। তারপর আবার জেলে নিয়ে গেলেন। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। পুনরায় জেলে নেওয়ার পর বুঝলাম, মুক্তি পাইনি। বিকেলের দিকে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে আবার আমাকে আশ্বস্ত করলেন, তিনি যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এক সপ্তাহ পর ৩০ এপ্রিল একটি মিলিটারি এয়ারক্রাফটে করে আমাকে পানাগড়ে মিলিটারি ক্যাম্পে (Concentration Camp) নিয়ে যাওয়া হলো। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার একটি উপশহর পানাগড়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর ঘাঁটি রয়েছে সেখানে। আমার সঙ্গে কর্নেল খিজির হায়াত খান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল আজিজ শেখ, মেজর ইকবাল, মেজর সাদেক নেওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল ও ক্যাপ্টেন আয়াজকেও

একই বিমানে পানাগড় মিলিটারি ক্যাম্পে নেওয়া হয়। দুই-তিন দিন পর ২৭ ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আতাউল্লাহ্ শাহকে সেখানে আনা হলো। ক্যাম্পে আমাকে পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আলাদা করে পৃথক একটি কক্ষে রাখা হয়। বাকিদের বড় একটি শেডের ভেতর রাখা হয়।

দিনের বেলা সীমিত পরিসরে আমাদের হাঁটাহাঁটি করার অনুমতি ছিল। পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাদের যে শেডে রাখা হয়েছিল, তার চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। একদিন আমি কাঁটাতারের একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কর্নেল খিজির হায়াত খান আমাকে দেখতে পেয়ে ভারতীয় সেনাদের সামনেই ডাকলেন। কাঁটাতারের কাছে যাওয়ার পর বললেন, 'লিটল চৌধুরী, কাম হিয়ার', অর্থাৎ 'ছোট চৌধুরী, এদিকে এসো।'

কর্নেল খিজির চতুর্থ বেঙ্গলের সেকেন্ড ইন কমান্ড থাকাকালে আমি সেখানে কমিশন পাই। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন এবং 'লিটল চৌধুরী' বলে ডাকতেন।

তিনি বললেন, 'ক্যান ইউ অ্যারেস্ট মি?' অর্থাৎ 'তুমি কি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারো?'

আমি উত্তরে বললাম, 'স্যার, দেয়ার ইজ আ ওয়ার গোয়িং অন', অর্থাৎ 'স্যার, যুদ্ধ চলছে।'

তিনি বললেন, 'কিসের যুদ্ধ? ২১ বছর আমি বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করছি, আর এই হলো আমার পুরস্কার।' একটু থেমে আবার বললেন, 'শাফায়াত, হু ইজ আ সান টু মি, কামিং অ্যান্ড টেলিং মি স্যার ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট', অর্থাৎ 'শাফায়াত, যে কিনা আমার কাছে ছেলের মতো, সে এসে বলল, স্যার, আপনাকে গ্রেপ্তার করা হলো।'

আমি বললাম, 'মেজর শাফায়াত হ্যাজ ডান বেস্ট পসিবল থিং ফর অল অব ইউ। প্রোভাইডিং অল টাইপস অব প্রোটেকশন অ্যান্ড অনার। অ্যান্ড অনারেবলি হ্যান্ডেড ওভার টু ইন্ডিয়ান অথরিটি।' অর্থাৎ 'শাফায়াত আপনাদের জীবন বাঁচিয়ে সম্মানের সঙ্গে ভারতীয়দের হাতে তুলে দিয়েছে।' একটু থেমে আবার বললাম, 'সুবেদার মেজর ইদ্রিস ওয়াজ উইথ ইউ অল অ্যালং।' অর্থাৎ 'সুবেদার মেজর ইদ্রিস [বাঙালি] সব সময় আপনার সঙ্গে ছিল।'

আমার কথা শুনে খিজির হায়াত মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় যখন ভারতীয়দের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করা হচ্ছিল, তখনো চতুর্থ বেঙ্গলের সেনা ও অফিসাররা তাঁর পাশে ছিলেন, সেটা তিনি অনুভব

করেছিলেন। চোখ বাঁধা অবস্থায় মেজর সাদেক নেওয়াজকে ডা. ক্যাপ্টেন আক্তার সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে ধূমপান করতে সাহায্য পর্যন্ত করেছিলেন।

পানাগড় ক্যাম্পে থাকাকালে সায়গলের সঙ্গেও আমার কয়েকবার দেখা ও কথা হয়েছে। সুযোগ পেলে কাঁটাতারের ওপার থেকে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। জুলাই মাসে তিনি পানাগড় ক্যাম্প থেকে পালিয়ে কলকাতায় গিয়ে আমেরিকান কনস্যুলেটে আশ্রয় নেন। পরে সেখান থেকে দিল্লি, কাঠমান্ডু ও ব্যাংকক হয়ে ঢাকায় পৌঁছান। ঢাকায় কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হলেও পরে ছাড়া পান।

আমার পারিবারিক বৃত্তান্ত ও শিক্ষাজীবন

আমার জন্ম বর্তমান ফেনী জেলার বর্তমান আনন্দপুর ইউনিয়নের আনন্দপুর গ্রামের হাসানপুর চৌধুরীর বাড়িতে। ফেনী-বিলোনিয়া লাইনের প্রথম স্টেশনে আমাদের বাড়ি। জায়গাটা ফেনী শহর থেকে চার মাইল দূরে। ফেনী এয়ারপোর্টের (বর্তমানে অব্যবহৃত) কাছাকাছি। ভারত বিভক্তির আগে আমার দাদাদের বাড়ি ছিল পাশের গ্রামে। আমার দাদার বাবা, অর্থাৎ প্রপিতামহ আশরাফ আলী চৌধুরী ১৮৪০ সালের দিকে সেখান থেকে উঠে এসে এখানে বাড়ি করেন। আমার প্রপিতামহের পাঁচ ছেলে।

আমার দাদার নাম হোসেন উদ্দীন চৌধুরী। তিনি আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের (বর্তমানে পরিষদ) কয়েক মেয়াদে প্রেসিডেন্ট (বর্তমানে চেয়ারম্যান) ছিলেন ১৯২১ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত। আমার দাদা ১৯৭১ সালেও বেঁচে ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে হত্যা করে।

ফেনীতে, বিশেষত তাঁর নিজ এলাকায় আমার দাদা রীতিমতো কিংবদন্তির মতো ব্যক্তিত্ব। তিনি অবশ্য বেশি লেখাপড়া করেননি। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন। কিন্তু নোয়াখালীর জুরিবোর্ডেরও মেম্বার ছিলেন। তখনকার দিনে, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন জায়গায় যত বিচার ও রায় হতো, ইউনিয়ন পর্যায় থেকে ডিস্ট্রিক্ট পর্যায় পর্যন্ত, তিনি একজন প্রতিনিধি হিসেবে থাকতেন। তখন উকিলরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জুরিবোর্ডের মেম্বার হতেন। আমার দাদার শিক্ষা কম থাকা সত্ত্বেও তিনি মেম্বার ছিলেন এবং ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল।

১৯৭১ সালের ১৬ জুন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার খোঁজে আমাদের গ্রামের বাড়ি রেইড করে, সেদিন আমাদের বাড়ির বেশির ভাগ লোক পালিয়ে যায়। কিন্তু তিনি বাড়ি থেকে কোথাও যাননি। সেনারা এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনার নাতি, মানে ক্যাপ্টেন আমীন কোথায়?' তিনি উত্তর দেন,

'আমার নাতি তোমাদের সঙ্গে চাকরি করে। তোমরা জানো না, আমি জানব কী করে?' তিনি তাদের সঙ্গে তর্ক করেন এবং বলেন, 'আমার নাতির খবর যদি তোমরা না রাখতে পারো, তাহলে আমি আমার নাতিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি কেন?' তারপর রাগান্বিত স্বরে বলেছেন, 'নিজেদের মানুষেরই হিসাব রাখতে পারো না, তোমরা দেশ শাসন করবে কী করে?' সেখানে আমার ছোট দাদাও ছিলেন। তখন তাঁরও বয়স প্রায় ৮৫ বছর। আর আমার আপন দাদার বয়স ছিল ৮৭। ছোট দাদার নাম ছিল বদিউজ্জামান চৌধুরী। আমার এক মামা ও জেঠাও ছিলেন কাছাকাছি বয়সের। তাঁদের প্রায় ৮২ বছর বয়স ছিল। পাকিস্তানিরা তাঁদের চারজনসহ মোট নয়জনকে একসঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। বাকিরা দৌড়ে এসেছিল আমার দাদাকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য। অন্যদের নাম সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (৮৬), মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী (৭৬), মকবুল আহমেদ (৩৮), আবদুল মতিন এবং বাড়ির কর্মচারী বাদশাহ মিঞা (পালকিবাহক), সুজা মিঞা, আবদুস সাত্তার, শেরু মিঞা ও প্রতিবন্ধী হেরাজ (বিকলাঙ্গ)। পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের সবাইকে আমার বড় দাদার বাড়ির আঙিনায় ১৯২৩ সালে নির্মিত দালানের (বর্তমানে দালানটি নেই) পেছনের পুকুরপাড়ে বাবলাগাছের নিচে নিয়ে যায়। দাদা সবাইকে দরুদ শরিফ ও সুরা ইয়াসিন পড়তে বললেন। সবাই জোরে জোরে সুরা ইয়াসিন পড়তে শুরু করেন। এই সময় বর্বর পাকিস্তানি সেনারা ব্রাশফায়ার করে। গুলির আঘাতে সবাই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আবদুল মতিন আর শেরু মিঞার কানে গুলি লাগে। তারা মরার ভান করে মাটিতে পড়ে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত অলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। শেরু মিঞার ছেলে আড়াল থেকে হত্যাযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছিল। গুলি লাগার পরও কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন মকবুল আহমেদ। গুলিতে দাদার মাথার খুলির একাংশ উড়ে গিয়েছিল।

দাদাকে অনেকে সরে যেতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আমার দালান, বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় যাব? আমি আমার দালানের ভেতরে থাকব। আমি অন্যের বাড়িতে থাকতে পারব না।' আরও বলেছিলেন, 'আমি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় এই অঞ্চলে পুরোধা ছিলাম। আমার অর্ধেক সম্পত্তি ভারতে চলে গেছে। তার পরও আমি পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে কাজ করেছি। মিলিটারি আমাকে কেন মারবে, আমি তো কোনো অন্যায় করিনি।'

দাদার প্রতিবাদ করার একটা অভ্যাস ছিল। তিনি সব সময় বলতেন, 'মানুষকে অত্যাচার করতে হবে কেন? আমি অনেকবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলাম। অন্যায় কিছু করিনি। তারা সবাই আমাকে ভোট দিয়েছে।'

আমার জন্য তিনি তর্ক করেছিলেন। তখন আমি ভারতে। মুক্তিযুদ্ধ করছি। আমাকে না পেয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাঁকে এবং অন্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে। এটা আমার জীবনে এবং আমার পরিবারের জন্য শোকাবহ এক ঘটনা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের কবর পর্যন্ত দিতে দেয়নি। যাওয়ার আগে গ্রামবাসীকে তারা বলে যায়, লাশ যারা দাফন করবে, তাদেরও হত্যা করা হবে। এই হুমকির কারণে তাদের মরদেহ দাফন করতে কেউ সাহস পায়নি। কয়েক দিন পর আমার মেজো মামা টুক্কু চৌধুরী ভারতের একিনপুর উদ্বাস্তু ক্যাম্প থেকে গোপনে এসে গলিত লাশগুলো পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করেন।

আমার পৈতৃক বাড়ি ফেনী জেলায় হলেও আমরা সব ভাইবোন মানুষ হয়েছি ময়মনসিংহ শহরে। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে সেখানে আমাদের বসবাস। আমার বাবা সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। ১৯৩৪ সালে সাব-ইন্সপেক্টর হিসেবে তিনি চাকরিতে যোগ দেন। পরে ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। চাকরিজীবনের শেষ দিকে ময়মনসিংহে ভারপ্রাপ্ত এসপি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বেশির ভাগ সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় তাঁর পোস্টিং ছিল। বাবা সর্বভারতীয় ঘোড়দৌড়ে পুলিশ একাডেমিতে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে দুর্গাপুরের (বর্তমানে নেত্রকোনা জেলার অন্তর্গত) ওসি থাকাকালে তেভাগা-টঙ্ক আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড মণি সিংহকে (ত্যাগী কমিউনিস্ট নেতা, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি) পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এ জন্য তিনি কায়েদে আজম পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর ছিল বর্ণাঢ্য জীবন। আমি আমার বাবার কাছ থেকে খুব অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিল তাঁর। তবে তিনি অত্যন্ত রাগী ছিলেন। তাই আমরা, ভাইবোনেরা তাঁর আশপাশে বেশি ঘোরাফেরা করার সাহস করতাম না। আমি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ক্যাপ্টেন হওয়ার পরও বাবার সঙ্গে বসে খাবার খাইনি।

তবে একটা মজার ব্যাপার হলো, লেখাপড়া করার বিষয় নিয়ে বাবা কখনো আমাদের সঙ্গে রাগারাগি করেননি। সময়মতো স্কুলে যেতে হতো, সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই বাসায় ফিরে আসতে হতো। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে আমাদের একজন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর কাছে ঠিক সন্ধ্যার পর পড়তে বসতে হতো। তাঁর সঙ্গে ঘুমাতামও আমরা। তখনকার দিনে আমাদের বাসায় একটা রেডিও ছিল। ফিলিপস। অনেক বড়। সেই রেডিওতে খবর শোনার জন্য আমরা পৌনে আটটায় ১৫ মিনিট ব্রেক পেতাম। তা না হলে সাড়ে

সাতটা-আটটার মধ্যে একসঙ্গে ভাত খেতে বসতে হতো। যাঁরা আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন বা দেখাশোনা করতেন, তাঁরা ছিলেন আমার বাবারই সহকর্মী। খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন পুলিশ কনস্টেবল আবদুল হাকিম জোয়ার্দার। তাঁর বাড়ি ছিল বরিশাল জেলায়। তিনি বস্তুত আমাদের বাড়ির সবচেয়ে বড় ছেলের মতোই ছিলেন। কোথাও সামান্যতম বিলম্ব হলেই তিনি সাইকেল নিয়ে আমাদের কানে ধরে বাসায় নিয়ে আসতেন। তিনিই আমাদের শাসন করতেন। স্কুলে গিয়ে দেখে আসতেন আমরা স্কুলে গিয়েছি কি না।

আমার মায়ের নাম আজিজুন নেসা চৌধুরানী। আমার নানা আলী আজম চৌধুরী সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ ছিলেন। সারদা পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির প্রথম ব্যাচে ছিলেন তিনি। ১৯১২ সালে সারদা পুলিশ একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। আমার নানা ১৯২৯ সালে মারা যান। আমার মা তাঁর ছেলেমেয়েদের বেশি পড়াতে চেয়েছেন। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও আম্মা বেশিদূর পড়তে পারেননি। বাড়ির সামনে যে স্কুলটা ছিল, সেখানে ক্লাস সেভেনের পর মেয়েদের আর পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, সেটা মূলত ছিল ছেলেদের স্কুল। তাই সেভেনের পর তাঁকে আর পড়তে দেওয়া হয়নি। বেশি পড়াশোনা করতে হলে তাঁকে ফেনী গিয়ে পড়তে হতো। এরপর আমার বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। আমার মা সব সময় বলতেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের এমএ পাস করাবেন। মেয়েকে তো অবশ্যই। আমার ছোট বোনটাকে তিনি এমএ পাস করার আগ পর্যন্ত বিয়ে দিতে রাজি হননি।

আমার বাবা মারা যান ২ নভেম্বর ১৯৮৬ সালে আর মা ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫ সালে। আমার বাবার জন্ম ১৯১১ সালে। মায়ের জন্ম ১৯২১ সালে। তাঁরা দুজনই খুব চমৎকার লাইফ লিড করেছেন। কোনো চাহিদা ছিল না আমার মায়ের। তাঁকে কোনো অলংকার পরতে দেখিনি আমি। বিয়েবাড়িতেও তিনি অলংকার পরে যেতেন না।

মায়ের প্রতি যে কর্তব্য, এটা খুব জরুরি এ জন্য যে মা অনেক সময় মুখ ফুটে কখনো কিছু বলেন না। অন্তত আমার মা তো কখনোই কিছু বলেন নাই যে আমার এইটা লাগবে বা ওইটা লাগবে। কিন্তু আমার মা চকলেট খুব পছন্দ করতেন। বুড়ো বয়সে আমার মা যখন আমার ছোট বোনের বাসায় থাকতেন, চকলেট নিয়ে এলে আমার ছোট বোনের ছেলেমেয়েরা আগেই খেয়ে ফেলত। তাই মাঝে মাঝে বলতেন একটু বেশি করে নিয়ে আসতে।

মায়ের চাহনির দিকে তাকিয়েই বোঝা উচিত যে মা কী চান। এটা অনেক সময় পরিবারের লোকজন বুঝতে পারে না। সেটা আমার কাছে মনে হয়

কিছুটা আত্মিক যোগাযোগের অভাব থাকে। তাই যত ব্যস্ততাই থাকুক, ছেলে হোক বা ছেলের বউ হোক এই দিকটা খুব দরদের সঙ্গে নজর দেওয়া উচিত। যেটা অনেক পরিবারের বেলায় আমাদের নিজেদের পরিবারের বেলাও এটার অভাব আছে। তাতে করে অনেক ক্ষেত্রেই পারিবারিক বিশৃঙ্খলতা এই আত্মিক যোগাযোগের অভাবেই হয়ে থাকে।

ছোটবেলায় আমাদের সব আবদার ছিল মায়ের কাছে। আমার মনে আছে, ১৯৫৪ সালে দিলীপ কুমারের *আন* সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছিল ময়মনসিংহে। রঙিন। প্রথম রঙিন সিনেমা ভারতবর্ষে। এর আগে আমরা বাংলা ছবি *পাশের বাড়ি* দেখেছিলাম। খুব হাসির ছবি। একটা গানও ছিল ছবিতে। আমাদের পাশের বাড়িতে একজন দারোগা থাকতেন। তাঁকে আমরা কাকা ডাকতাম। তাঁর ছোট ভাই ও মেজো ভাই *পাশের বাড়ির* সেই গানটা খুব সুন্দর করে গাইতেন। আমরা প্রায়ই তাঁদের পাশে বসে গানটা শুনতাম। গানটার কলি ছিল, 'এক যে ছিল গাঁয়ের বধূ'। গানটি ছিল সুনীল সেনের গাওয়া। এই গানটি নিয়ে বেশ মজা হতো। কারণ, আমার আম্মা রীতিমতো তাঁদের ভাবি। আম্মাকে তাঁরাও নিজের ভাবি হিসেবে দেখতেন। আমরা তাঁদের কাকা ডাকতাম।

যাহোক, আম্মা বললেন, *আন* হিন্দি সিনেমা। হিন্দি সিনেমা দেখা যাবে না। আমার মায়ের কথা, হিন্দি ছবির নায়িকাদের ওড়না পরা থাকে না। এ জন্য ছেলেদের দেখা নিষেধ। এখনকার ছবি দেখলে তিনি নিশ্চয় হার্টফেল করতেন। আমরা বাংলা ছবি কোনোমতে দেখতে পারতাম। পুলিশের ছেলে বলে সিনেমা হলের মালিকেরা আমাদের কাছ থেকে পয়সা নিতেন না। যদিও বাবার নির্দেশ ছিল, আমার অনুমতি ছাড়া ছেলেরা সিনেমা হলে যাবে না। এ অবস্থায় 'অলকা' সিনেমা হলে সেই *আন* সিনেমা দেখার জন্য আমাদের গৃহশিক্ষক হাকিম ভাইকে অনেক জোরাজুরি করলাম। অনেক কসরত করে দিলীপ কুমারের *আন* সিনেমা দেখি আমরা চার ভাই মিলে। হাকিম ভাই আম্মাকে বললেন, এই সিনেমাটা মোটামুটি ভালো। দেখলে কোনো অসুবিধা নেই। তারপর বাবাকে না বলে আমরা *আন* সিনেমা দেখতে যাই। এটা একটা মজার কাহিনি এবং সে সিনেমা দেখে এসে আমরা ওই প্রেমনাথের মতো করে অভিনয় করে বেড়াতাম। একজন দিলীপ কুমার সাজতাম আর ঘোড়ায় চড়ে প্রেমনাথের আসার অভিনয় করতাম। নাদিরা ছিল তার বোন, যার সঙ্গে দিলীপ কুমারের প্রেম। সেই সব কাহিনি পাড়াজুড়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হতো। আমরা যে *আন* দেখেছি, সে জন্য রীতিমতো গর্ব

অনুভব করতাম।

আমি আমার সঠিক জন্মতারিখ জানি না। আম্মা আমাকে বলেছেন, মঙ্গলবার রাত ১০টায় আমার জন্ম। বাবা বলেছিলেন, আমার জন্মবছরে জাপানিরা ফেনীতে বোমা ফেলে। পোশাকি হলেও আমার জানামতে, আমার জন্ম ১৯৪৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি।

আমরা চার ভাই ও দুই বোন। আমি তৃতীয়। আমার সবচেয়ে বড় ভাই আজিজ আহম্মেদ চৌধুরী। তিনি ১৯৬৩ সালে বিএ পাস করে চলে যান ফেনীতে। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি আওয়ামী লীগ করেন। বর্তমানে তিনি ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনিও ৩৬ বছর আমাদের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন। তখন ইউনিয়ন অনেক বড় ছিল। এখন তিন-চার ভাগ হয়ে গেছে।

আমার মেজো ভাই আমীর আহম্মেদ চৌধুরী (রতন)। তিনি বৃহত্তর ময়মনসিংহের গৌরীপুর কলেজের অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা স্কুল করেন ১৯৬৯ সালে। সেই স্কুলের নাম 'মুকুল নিকেতন'। তার আগে তিনি 'মুকুল ফৌজ' নামে একটি সংগঠন করেন। আমরাও মুকুল ফৌজের সদস্য ছিলাম। মোদাব্বের ভাই, কামরুল হাসান মুকুল ফৌজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মোদাব্বের ভাইয়ের দুই ছেলে মুকুল ফৌজের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এটা ১৯৫৭-৫৮ সালের কথা। মুকুল ফৌজ পরিচালনা করতেন আমার ভাই আমীর আহম্মেদ চৌধুরী। এরপর তিনি ১৯৬৯ সালে প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। সেটার নাম দেন 'মুকুল নিকেতন'। বর্তমানে এই স্কুলে প্রায় ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী। বিভিন্ন জেলা থেকে এই স্কুলে শিক্ষার্থীরা পড়তে আসে। উন্নত মানের সুন্দর একটা স্কুল। আমার এই ভাই এখনো বেঁচে আছেন।

আমি তৃতীয়। চতুর্থ ভাই আনিস আহম্মেদ চৌধুরী। আমার এই ভাই এমএ পাস করে আমেরিকায় চলে যায়। বর্তমানে সেখানে বসবাস করছে। দুই বোন আমার ছোট। বড় চাঁদ সুলতানা। সে এমএ পাস করে স্কুলে শিক্ষকতা করত। সহকারী প্রধান শিক্ষক হয়ে অবসর নিয়েছে। তার স্বামী সোনালী ব্যাংকে চাকরি করত। প্রিন্সিপাল অফিসার হয়ে অবসর নিয়েছে। ছোট বোনের নাম কোহিনূর। আইএ পাস করার পর তার বিয়ে হয়ে যায়। তার স্বামী একটি বেসরকারি ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে অবসর নিয়েছে। বর্তমানে তার স্বামী *ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস* পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। আমার দুই ছেলে।

আমি ১৯৫৪ সালে সিটি কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস ফোরে ভর্তি হই। এর আগ

পর্যন্ত আমি গৃহশিক্ষকের অধীনে এবং বাড়ির কাছে স্কুলে পড়াশোনা করি। ১৯৬১ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করি। ১৯৬১ সাল থেকে পড়াশোনা করি ঢাকা কলেজে। আবার ১৯৬৩ সালে আনন্দ মোহন কলেজে ভর্তি হই। শিক্ষাজীবনে আমাদের সময় যাঁরা শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত গুণী শিক্ষক ছিলেন। আনন্দ মোহন কলেজের শিক্ষকেরা সবাই স্বদেশি আন্দোলন বা ওই ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁরা ত্যাগী এবং মেধাবী ছিলেন। অনীল চক্রবর্তীসহ অনেকেই কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁরা সর্বভারতীয় আইসিএস বা অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারি চাকরি পান। কিন্তু অনেকেই স্বদেশি আন্দোলন বা 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে জড়িত থাকায় এসব সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্কুল-কলেজে চাকরি করেন। সেই সময় শিক্ষকদের বেতন ১২৫ টাকার মতো ছিল। কেউ কেউ স্কুল-কলেজে চাকরি না পেলেও এক দিনের জন্য সময় নষ্ট করেননি। তাঁরা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভালো ছাত্রদের পড়াতেন। আমি এই ধরনের একটি পরিমণ্ডলে বড় ও শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে ধন্য মনে করি। যার ফলে আমরা মফস্বল স্কুলে লেখাপড়া করলেও পরবর্তী সময়ে সেনাবাহিনীতে যখন যাই, তখন ইংরেজিতে কথোপকথনে এবং লেখালেখি করতে আমাদের তেমন কোনো কষ্ট হয়নি। অন্যান্য জায়গা থেকে, বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে যারা গিয়েছে, ইংরেজি লিখতে গিয়ে অনেক ভুল হয়েছিল অনেকের, এমনকি পেশোয়ার থেকে যারা কোয়ালিফাইড হয়ে এসেছিল আমাদের ব্যাচে। আমার অনেক কোর্সমেট পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছিল। মিলিটারি একাডেমিতে গিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, আমার শিক্ষাটা, অর্থাৎ প্রাইমারি থেকে আরম্ভ করে হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন পর্যন্ত ভিতটা অত্যন্ত শক্ত ছিল।

ঢাকা কলেজে শওকত ওসমান, কবীর চৌধুরী, এম আই চৌধুরী, শামসুল আলম—এ ধরনের প্রখ্যাত শিক্ষকেরা আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। তারপর এম ইউ আহমেদ ছিলেন। শওকত ওসমান পাঠ্যক্রমকে অনুসরণ করে কখনো পড়াতেন না। তিনি এসে নিজের মনের মতো যেটাই ভালো মনে করতেন, তার ওপর বক্তব্য রাখতেন। তিনি আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের *কমলাকান্তের দফতর* পড়াতেন। অথচ আমরা সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম। সেটা শোনার জন্য বাইরে থেকেও লোক এসে ক্লাসে বসে থাকত। শওকত ওসমান এত সুন্দরভাবে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে অন্য বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সম্পর্কে বলতেন যে সবাই তাঁর বক্তব্য মন দিয়ে শুনত। শিক্ষকেরা আদর্শবান ছিলেন।

যেমন—খেলার মাঠে আমাদের সুকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন অসাধারণ একজন শিক্ষক। তিনি পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। সেখানে বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। খেলাধুলার জন্য তিনি জানপ্রাণ ঢেলে দিতেন। চরিত্র গঠনে তাঁর একটা বিরাট প্রভাব ছিল আমাদের ওপর। এ ছাড়া ছোটবেলায় যে *বাল্যশিক্ষা* থেকে আমাদের পাঠ দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিটি শব্দই ছিল সুন্দর। যেমন গুরুজনকে সম্মান করবে, সদা সত্য কথা বলবে। ছোট ছোট কথা। কিন্তু প্রতিটি কথাই মূল্যবোধ-সম্পর্কিত।

১৯৬১ সালে আমরা রবীন্দ্রজন্মশততমবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি। তখন রবীন্দ্রজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন তো দূরের কথা, রবীন্দ্রসংগীতও নিষিদ্ধ ছিল। মার্শাল ল চলাবস্থায় এটাকে ডিফাই করে *শ্যামা* গীতিনাট্য পরিবেশিত হয়। এটা নিয়ে ময়মনসিংহে অনেক হইচই হয়েছে। এনএসআই থেকে আরম্ভ করে অনেকেই বাধা দেয়। কিন্তু সেটা আমরা খুব ভালোভাবে উপেক্ষা করি। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আমরা অনেকগুলো নাটক করেছি। ছাত্রজীবনেও আমাদের বাসায় আমরা নিজেরা ডি এল রায়ের অনেকগুলো নাটক—*সাজাহান*, *চন্দ্রগুপ্ত*, *শিবাজী*—এ ধরনের অনেক নাটক বছরে একবার হলেও মঞ্চস্থ করেছি। আমাদের পাড়ার মায়েরা ছিল দর্শক। আমরা সব সময় একটা-না-একটা নাটক করতাম। সেই নাটকগুলোতে প্রাণবন্ত অভিনয়ের জন্য অনেকেই তখন বেশ বিখ্যাত হয়েছিল। আমার মনে আছে, আনোয়ার হোসেন, তিনি পরে নবাব *সিরাজউদ্দৌলা* সিনেমায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর বাড়িও ছিল ময়মনসিংহের তৎকালীন জামালপুরে (বর্তমানে জেলা)। আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। ১৯৫১-৫২ সালে আমাদের স্কুলের মাঠে তিনি *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকে অভিনয় করেছিলেন। আর একটা মাঠে তিনি *টিপু সুলতান* ও *মঁসিয়ে লালি* নাটকে অভিনয় করেছিলেন। আশিস কুমার লোহও আমাদের পাড়ায় থাকতেন। তিনিও নানা ধরনের নাটক করে বেড়াতেন। লেখাতেও তাঁর খুব ভালো হাত ছিল।

১৯৬১ সালে আমরা যখন রবীন্দ্রজন্মশততমবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি, তখন মিতালী মুখার্জি সাত-আট বছরের মেয়ে। সে প্রথমবারের মতো স্টেজে নজরুলের 'শুকনো পাতার নূপুর' গানটা গেয়ে নেচেছিল। পরবর্তী সময়ে সে ঢাকাতে এক প্রতিযোগিতায় সাবিনা ইয়াসমিনের সঙ্গে দ্বিতীয় হয়েছিল। বিপুল ভট্টাচার্য মুকুল নিকেতনের সংগীতশিক্ষক ছিলেন। একজন ওস্তাদের অধীনে নজরুলসংগীত ও নাচ শেখানো হতো। বিপুল ভট্টাচার্য নজরুলসংগীত ভালো গাইতেন। ছাত্রজীবনে মুকুল ফৌজ করাটাও আমাদের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য

ঘটনা। আমরা একবার 'সুন্দরম সপ্তর্ষীমণ্ডল' নামে একটা চমৎকার সাহিত্য উৎসব করেছিলাম। যতীন সরকার, আজিজ স্যার, রাহাত খান, সৈয়দ আবদুস সাত্তার, সৈয়দ নজরুল—এঁরা সবাই আমাদের সঙ্গে ছিলেন। আমরা প্রতিবছর একটা করে কালচারাল উইক পালন করতাম। ১৯৫৪ সালে ইন্টার স্কুল প্রতিযোগিতায় আমি হজরত (সা.)-এর ওপর রচনা লিখে প্রথম হয়েছিলাম। পুরস্কার হিসেবে *মরুভাস্কর* গ্রন্থটি উপহার পেয়েছিলাম। ৫৭-৫৮ সালে আমরা ইংলিশ ডিবেট করতাম। পাড়ার দেয়ালপত্রিকায় গল্প-প্রবন্ধ লিখেছি। ১৯৬৪-৬৫ সালে আমি প্রথমবারের মতো *সংবাদ* পত্রিকায় নজরুলের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখি। ক্রিকেট খেলায় একবার হ্যাট্রিক করেছিলাম।

ময়মনসিংহ শহরে কখনো দাঙ্গা হয়নি। তবে ১৯৬৪ সালে দাঙ্গা হওয়ার একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই সময় আমরা সারা রাত শহর পাহারা দিয়েছি। আমাদের পাড়ায় বসবাসকারী হিন্দু পরিবারের অনেককেই আমাদের বাসায় থাকতে দিয়েছিলাম। অজিত কুমার নিয়োগী নামে এক হিন্দু জমিদার পরিবারের সন্তানকেও এই দাঙ্গার সময় আমার আম্মা আমাদের বাসায় থাকতে দিয়েছিলেন। তিনি জাতে ব্রাহ্মণ ও অঙ্কে খুব ভালো ছিলেন। আমরা তাঁকে নিয়োগী কাকা ডাকতাম। তিনি মানুষের হাত ও চেহারা দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারতেন। ওই সময় একদিন সকালবেলা উনি আমাকে দেখে বললেন, 'তোর লেখাপড়া আর নেই।' এ কথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। আমার বাবা বললেন, 'কী বলেন?' নিয়োগী কাকা বললেন, আমার মনটা খারাপ তাই বলতে পারছি না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে তার পড়ালেখা আর নেই। সে হঠাৎ করে এমন একটা স্রোতের দিকে টার্ন করবে যেটা সে আগে কখনো চিন্তা করেনি।

আনন্দ মোহনে বিএসসি পড়া অবস্থায় ১৯৬৫ সালে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসার্স কোর্সে যোগ দেওয়ার জন্য পরীক্ষা দিই। নির্বাচিত হওয়ার পর ২৭ নভেম্বর প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কাকুল একাডেমিতে যাই। প্রশিক্ষণ শেষে ১৯৬৬ সালের ৫ জুন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পদাতিক ডিভিশনের একটি ব্যাটালিয়ন চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশনপ্রাপ্ত হই।

সেনাবাহিনীতে চাকরি করার সুবাদে আমি কয়েক বছর পাকিস্তানে থেকেছি। তখন দেখেছি, পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানকে কালা পানির দেশ বলে মনে করত। ১৯৬৫ সালে কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় আমার পাঞ্জাবি বন্ধু (ছাত্রজীবনের পত্রবন্ধু) খালিদ লতিফ সাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তার বাড়ি ছিল লাহোরের মুলতান রোডে।

তখন তার বাবা-মাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়। তারা অবশ্য আমার প্রতি উষ্ণ মনোভাব দেখায়। বাঙালিদের ব্যাপারেও তাদের একই মনোভাব পোষণ করতে দেখি। লাহোরের অদূরে গায়িকা নুরজাহানের জন্মস্থান কছুরবাসী ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনাদের আপ্যায়ন করে কৃতার্থ হতো। কারণ, ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করে কছুর রক্ষা করেছিল। অথচ ১৯৬৯ সালে লাহোরে থাকাকালে পাকিস্তানিদের মনমানসিকতার বেশ পরিবর্তন লক্ষ করি। আগরতলা মামলা বা উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান কিংবা পূর্ব পাকিস্তানে গণমানুষ নিজেদের অধিকারের ব্যাপারে যখন ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছিল, তখন দেখেছি, একটা অবিশ্বাস বেশ ভালোভাবে দানা বাঁধছে।

আমার পত্রবন্ধু খালিদ লতিফ সাদ পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে প্রশিক্ষণের (পিএসপি) জন্য খালিদ সারদা পুলিশ একাডেমিতে আসে। ওই সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানে ছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। খালিদ লতিফ কথাচ্ছলে আমাকে বলেছিল, 'লুক, আই স্টুড টুয়েলভড ইয়েট আই বিকেম পিএসপি, হয়্যার অ্যাজ ইয়োর বেঙ্গলি হু স্টুড বিওন্ড সেভেন্টিনথ বিকেম সিএসপি ইট ইজ নট ফেয়ার।' অর্থাৎ (দেখো মেধাতালিকায় আমি ১২তম। তবু আমি পিএসপি আর তোমার বাঙালি ৭০তম স্থান পেয়েও কোটার বদৌলতে সিএসপি—এটা ঠিক নয়।' যাহোক, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ফলে, তার বাবা-মা ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনে কোনো-না-কোনো সময় সেনাবাহিনী কঠোর সামরিক অভিযান শুরু করবে। এই সময় যদি তাদের সন্তান পূর্ব পাকিস্তানে আটকা পড়ে যায়, তাহলে কী হবে, এই চিন্তায় খালিদের মা-বাবা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। খালিদের বাবা-মা আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। তার পরও তাঁদের একটা অবিশ্বাস ছিল যে কালা পানির লোকেরা পাঞ্জাবিকে একেবারে সহ্য করতে পারে না। সুযোগ পেলেই মেরে ফেলতে পারে। তাঁদের এই মনোভাব দেখে আমি হতবাক ও মর্মাহত হয়েছি। পরবর্তী সময়ে বাস্তবতার নিরিখে উপলব্ধি করেছি, পূর্ব পাকিস্তানিদের ব্যাপারে তাঁদের সম্যক জ্ঞান ছিল না। এ ছাড়া রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব, সর্বোপরি বদ্ধমূল ধারণার বশবর্তী হয়ে সামরিক জান্তার মতো পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ শিক্ষিত ও রাজনৈতিকভাবে সচেতন শহুরে জনগোষ্ঠীও তখন পূর্ব পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে কঠোর সামরিক অভিযান শুরু করার বদলে বিকল্প কোনো পন্থার কথা চিন্তা করতে পারেনি।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান

দীর্ঘ দুই মাসের অধিক সময় পানাগড় ক্যাম্পে বন্দিজীবন কাটাতে কাটাতে আমার মন বিষণ্ন হয়ে পড়ে। জুন মাসের শেষে একদিন ক্যাম্প কমান্ডার এসে বললেন, 'তোমাকে কয়েক দিনের মধ্যে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে পাঠানো হবে।' এদিকে জুন মাসে আমার মেজো ভাই আমীর আহম্মেদ চৌধুরী (রতন) মামাতো ভাই লিডুকে সঙ্গে নিয়ে আমার খোঁজে আগরতলায় যায়। সেখানে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করে রতন। খালেদ মোশাররফ তাদের আশ্বস্ত করেন, তিনি আমার খোঁজ নেবেন। বলা যায়, চতুর্থ বেঙ্গলের অফিসার ও অন্যরা আমাকে খুঁজে বের করে জিয়ার প্রদেয় ধূম্রজাল ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার বেড়াজাল থেকে উদ্ধার করেন।

৭ জুলাই আমাকে পানাগড় থেকে ফোর্ট উইলিয়ামে এনে বাংলাদেশ ফোর্সেস হেডকোয়ার্টারে হস্তান্তর করা হয়। কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে সেক্টর হেডকোয়ার্টারের রেস্ট-হাউসে থাকতে বলেন। সেখানে তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরীর (বীর বিক্রম। পরে বাংলাদেশ সরকারের সচিব এবং ২০০৮-১৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা) সঙ্গে তিন দিন থাকার পর আমি আবার মুজিবনগরে যাই কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেখানেই রাতে থাকলাম।

ওসমানীর সঙ্গে কথা বলার সময় লক্ষ করলাম, ১৪ মার্চ তাঁর সঙ্গে আমার যে কথোপকথন হয়েছিল, তিনি সেটা মনে করতে পারছেন না। ২৫ মার্চ সকালেও যে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, এ কথাও তিনি মনে করতে পারলেন না। আমি মর্মাহত হলেও আশ্চর্য হইনি। দুঃখজনক হলেও তখন একটা বিষয় লক্ষ করলাম, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম প্রহর থেকে যাঁরা সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, তাঁদের বেশির ভাগের মনোভাব—পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা অনেক আগে থেকেই কাজ করছেন। এই ধারণা প্রমাণ

করার জন্য দিবানিশি তাঁদের কসরতের অন্ত নেই। পাকিস্তানিদের সঙ্গে তাঁরা কোনো ধরনের সমঝোতা করেননি, এ কথা তাঁরা বলতে গিয়ে রীতিমতো মরিয়া। অথচ এটা অদ্ভুত একধরনের হীনম্মন্যতা! কী জানি, ভারতীয়রা যদি মনে করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও আসলে এরা প্রোপাকিস্তানি। এ ভয়েই সবাই অস্থির।

যাহোক, পরদিন খেতে হবে। কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই। কর্নেল ওসমানীর স্টাফ অফিসার ছিলেন সিলেটের মেজর এ আর চৌধুরী। আমি ও আরও তিনজন বাঙালি সেনা কর্মকর্তা নাশতা খাওয়ার জন্য তাঁর কাছে টাকা চাইলাম। তিনি পকেট হাতিয়ে দুই টাকা দিয়ে বললেন, 'ইন্দিরা গান্ধী অনেক কষ্ট করে আমাদের এই পঙ্গপালকে খাইয়ে-পরিয়ে, অস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁর কষ্ট বাড়িয়ে লাভ নেই। দুই টাকা দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও।' বললাম, দুই টাকা দিয়ে চারজন কী করে খাবার খাব? ওই সময় দোতলায় উঠছিলেন নোয়াখালীর আওয়ামী লীগের নেতা আবদুল মালেক উকিলসহ কয়েকজন এমএনএ। তিনি ইশারায় তাঁদের দেখিয়ে দিলেন। আমি মালেক উকিলকে চিনতাম। তাঁর কাছে খাওয়ার জন্য টাকা চাইলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ১০০ টাকা বের করে দিলেন।

টাকা নিয়ে আমরা একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে গেলাম। ওয়েটার হেসে বলল, 'আপনারা জয় বাংলার লোক?' আমরা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম। অন্যান্য খাবারের টাকা নিলেও তারা আমাদের কাছ থেকে স্যুপের টাকা নেয়নি। পরে পরিচয় হয় যশোরের এমপি রওশন আলীর সঙ্গে। তিনি আমাকে কলকাতা নিউ মার্কেটে নিয়ে গিয়ে হাফপ্যান্ট, ফুলপ্যান্ট, জুতা, গেঞ্জিসহ আরও কিছু পোশাক কিনে দেন। স্বাধীনতার পর তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনোই দেখা হয়নি।

মুক্তি পাওয়ার পর আমি মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলাম খালেদ মোশাররফের অধীনে যুদ্ধ করার। গত কয়েক মাসের নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এ সময় আবার দেখা হলো জিয়ার সঙ্গে। তিনি তখন কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য কলকাতায় অবস্থান করছিলেন। একেই বলে বোধ হয় নিয়তি! ১৩ এপ্রিল সাব্রুম বিওপিতে তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ দেখা হয়েছিল এবং তাঁর সন্দেহের জন্যই আমাকে জেলে থাকতে হয়েছে। মাঝখানে কেটে গেছে দুঃখ, বেদনা, কষ্ট আর বঞ্চনার আড়াই মাস। জিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমীন, মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে, আই অ্যাম ভেরি সরি। এখন কোন ব্যাটালিয়নে যেতে চাচ্ছ?'

আমি বললাম, ফোর ইস্ট বেঙ্গলে। তিনি বললেন, 'বেটার ইউ ক্যান গো উইথ মি।' বললাম, আমার কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি যেহেতু আমার সম্পর্কে খুব বেশি সন্দেহ প্রকাশ করছিলেন, সে জন্য আমি আপনার সঙ্গে না যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলাম। জিয়া মুচকি হাসি দিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করে বললেন, 'চলো যাই, একসঙ্গে যুদ্ধ করব।' তারপর একই বিমানে করে জিয়ার সঙ্গে তুরাতে আসি এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দিই। তখন অষ্টম বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন মেজর আমিনুল হক (বীর উত্তম। পরবর্তী সময়ে ব্রিগেডিয়ার)।

আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি, জিয়া কেমন করে এমন একটি উদ্ভট সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে আমি পাকিস্তানিদের চর হয়ে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে তাঁদের হাতে তুলে দিয়ে আরও বড় ধরনের স্যাবোটাজ করার জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিচ্ছি। আমার ধারণা, এর প্রধান কারণ, আমি ঢাকা থেকে ২৪ মার্চ টেলিফোনে তাঁকে এবং কর্নেল এম আর চৌধুরীকে জানিয়েছিলাম, আমাদের (ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ও আমি) এখনো গ্রেপ্তার করা হয়নি। ক্যাপ্টেন রফিক যেন এখনই কোনো ধরনের অ্যাকশনে না যান। ২৫ মার্চ আমি আবার ফোন করেছিলাম। তখন কর্নেল এম আর চৌধুরীর সঙ্গে আমার কথা হয়। ওনাকে বলেছিলাম, 'লাল ফিতা উড়িয়ে দিন।' সে কথা আগের অধ্যায়ে লিখেছি। এ কথোপকথন সম্বন্ধে জিয়া ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে আমি পাকিস্তানিদের হাতে তুলে দিয়েছি এবং কৌশলে তাঁদের সবাইকে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে আগাম কোনো ব্যবস্থা নেওয়া থেকে বিরত রেখেছি। পরে নিজে আবার ভারতে গিয়েছি মুক্তিযুদ্ধে বড় ধরনের স্যাবোটাজ করার জন্য।

জিয়ার এই মনোভাব আমার বুঝতে কষ্ট হয়নি যে গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করা লোকের পক্ষে এই ধরনের সরলীকরণ করাই স্বাভাবিক। তিনি একসময় পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করতেন। সেনা চাকরির সূত্রে আমার মনে হয়েছে, পাকিস্তানে ব্রিটিশ ও আমেরিকা কর্তৃক প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা মনে মনে একটা ছবি আঁকতে ভালোবাসে। গোয়েবলসের মতো তারা তাদের রিপোর্টে তথ্যমূলক সংবাদ পরিবেশন না করে সংবাদের জন্ম দিতে ভালোবাসে এবং তাদের সাজানো নাটকের দৃশ্যাবলি মঞ্চস্থ করতে তারা বদ্ধপরিকর থাকে। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এখনো এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যারা গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করেছে, তাদের মনমানসিকতা স্টেরিওটাইপ হয়ে গেছে। অর্থাৎ কেউ যদি ভাসানীর সঙ্গে দুবার দেখা করে আবার তৃতীয়বার যায়, তাহলে পাকিস্তানের গোয়েন্দারা ধরেই নিত, সে ভাসানীর সার্কেলের লোক। ভাসানীর সঙ্গে কী কথা হলো বা কোন বিষয়ে কথা হলো, তা তলিয়ে না দেখে মনে করে সে কমিউনিস্ট। জিয়া আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলেন। এটা আমার জন্য মারাত্মক হতে পারত। যদি আমি ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের মাধ্যমে ভারতে না যেতাম এবং কনস্যুলারের চিরকুট না নিতাম, তাহলে আমাকে হয়তো ফায়ারিং স্কোয়াডেই যেতে হতো। ভারতের বিএসএফ কর্মকর্তা মজুমদার আমাকে আকার-ইঙ্গিতে এ কথাই বলেছিলেন।

জিয়াউর রহমান একজন অদম্য সাহসী বীরযোদ্ধা, সন্দেহ নেই। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে খেমকারান শহর দখলে তাঁর কোম্পানি বড় ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু আমার ধারণা, ২৬ মার্চের পর প্রতিকূল পরিবেশের ভয়াবহতা আন্দাজ করে তিনি কিছুটা হলেও ভড়কে গিয়েছিলেন। সব সময় তিনি পাকিস্তানি চরের উপস্থিতি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। কক্সবাজারের তখনকার মুনসেফ (পরে বিচারপতি) নাঈমুদ্দিন আহমেদ আমাকে বলেছিলেন, জিয়া মেজর শওকতের (মীর শওকত আলী বীর উত্তম। পরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল, রাষ্ট্রদূত ও মন্ত্রী) মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি তাঁকে বার্মা (মিয়ানমার) সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন, যাতে বার্মা সরকার শরণার্থীদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলে এবং মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। জিয়ার অনুরোধে তিনি বার্মা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু বার্মা সরকার অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে কোনো সাহায্য করতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়।

স্ত্রী ও সন্তানদের ফেলে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন জিয়া। তাদের নিয়ে তিনি শঙ্কায় এবং চিন্তিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই তাঁর মন সুস্থির ছিল না। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে তিনি অদম্য সাহসের সঙ্গে প্রবল প্রতিকূল অবস্থা মোকাবিলা করতে কখনোই পিছপা হননি। নির্দ্বিধায় শক্ত শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে মোটেও বিচলিত এবং প্রয়োজনে নির্মমতার আশ্রয় নিতেও পিছপা হতেন না।

যাহোক, জিয়ার সঙ্গে তুরায় যাওয়ার কয়েক দিনের মধ্যে নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর (বাংলাদেশ ফোর্স) তিনটি ব্যাটালিয়নের সমন্বয়ে একটি ব্রিগেড গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। ৭ জুলাই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেয়। এর নামকরণ করা হয় 'জেড ফোর্স'। ব্রিগেডে অন্তর্ভুক্ত হয়

প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট। জিয়াউর রহমানকে এর নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এই বাহিনীর ওপর প্রথমে দায়িত্ব পড়ে বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইলে অপারেশন চালানোর।

জেড ফোর্সের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :

ব্রিগেড অধিনায়ক : মেজর জিয়াউর রহমান। ব্রিগেড মেজর : ক্যাপ্টেন অলি আহমদ। ডি কিউ : ক্যাপ্টেন সাদেক। মেডিকেল অফিসার : ওয়াহেদ (ছাত্র, চতুর্থ বর্ষ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ)।

প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট : ব্যাটালিয়ন কমান্ডিং অধিনায়ক : মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। আগস্ট মাস থেকে মেজর মো. জিয়াউদ্দিন আহমেদ (বীর উত্তম। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। অ্যাডজুট্যান্ট কাম কোয়ার্টার মাস্টার : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান (বীর উত্তম। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর সদস্য। পরে স্কোয়াড্রন লিডার)। সেকেন্ড ইন কমান্ড (আগস্ট থেকে) : ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী (বীর প্রতীক। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। আলফা (এ) কোম্পানির অধিনায়ক : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট লিয়াকত আলী খান। ব্রাভো (বি) কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ (বীর বিক্রম। পরে মেজর। বর্তমানে রাজনীতিক)। চার্লি (সি) কোম্পানির অধিনায়ক : লেফটেন্যান্ট আবদুল মান্নান (বীর বিক্রম। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। ক্যাপ্টেন আবদুল কাইউম চৌধুরী (পরে মেজর) অধিনায়ক। ডেলটা (ডি) কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ (বীর উত্তম। কামালপুর যুদ্ধে শহীদ, ৩১ জুলাই ১৯৭১)। পরে অধিনায়ক নিযুক্ত হন ক্যাপ্টেন বজলুল গনি পাটোয়ারী। পরে এই ব্যাটালিয়নে যোগ দেন লেফটেন্যান্ট আনিসুর রহমান ও লেফটেন্যান্ট ওয়াকার হাসান (বীর প্রতীক। পরে মেজর)।

তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট : ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক : মেজর শাফায়াত জামিল। সেকেন্ড ইন কমান্ড : ক্যাপ্টেন মহসিন উদ্দিন আহমেদ (বীর বিক্রম। পরে ব্রিগেডিয়ার)। এ কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন (বীর প্রতীক। পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত)। বি কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন (বীর প্রতীক। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মন্ত্রী)। সি কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন মহসিন উদ্দিন আহমেদ। ডি কোম্পানির অধিনায়ক : লেফটেন্যান্ট নুরুন্নবী খান (এস আই এম নুরুন্নবী খান বীর বিক্রম। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধ গবেষক। মুক্তিযুদ্ধ-বিষয়ক অনেক গ্রন্থের প্রণেতা)।

এ ছাড়া লেফটেন্যান্ট মঞ্জুর আহমদ (বীর প্রতীক। পরে মেজর), লেফটেন্যান্ট ফজলে হোসেন (জিয়া হত্যা ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত), ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আশরাফুল আলম ও মাকসুদ হোসেন চৌধুরী এই ব্যাটালিয়নের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। সুবেদার আজিজের নেতৃত্বে একটি সাপোর্ট প্লাটুনও ছিল এই ব্যাটালিয়নে।

অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট : ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক : মেজর এ জে এম আমিনুল হক (বীর উত্তম)। সেকেন্ড ইন কমান্ড : ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামান। এ কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন আমীন আহম্মেদ চৌধুরী (বীর বিক্রম। পরে মেজর জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত)। বি কোম্পানির অধিনায়ক : ক্যাপ্টেন সাদেক হোসেন (পরে ব্রিগেডিয়ার)। সি কোম্পানির অধিনায়ক : লেফটেন্যান্ট মোদাসসের হোসেন (বীর প্রতীক। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল)। ডি কোম্পানির অধিনায়ক : লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর রহমান। এ ছাড়া লেফটেন্যান্ট এমদাদুল হক (শহীদ এমদাদুল হক বীর উত্তম। বৃহত্তর সিলেটের ধামাই চা-বাগানে শহীদ হন), লেফটেন্যান্ট মনিবুর রহমান (পরে মেজর), লেফটেন্যান্ট ওয়ালিউল ইসলাম (বীর প্রতীক। পরে মেজর), লেফটেন্যান্ট বাকের (কে এম আবু বাকের বীর প্রতীক। পরে ব্রিগেডিয়ার) প্রমুখ তরুণ সেনা কর্মকর্তা এই ব্যাটালিয়নে যুদ্ধ করেছেন।

জুলাই ও আগস্ট মাসে জেড ফোর্স তিনটি বড় ধরনের অপারেশনে অংশ নেয়। পরিকল্পনা করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) কামালপুর, বাহাদুরাবাদ ঘাট এবং শেরপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) নকশী বিওপির ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ধানুয়া-কামালপুর বিওপিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যন্ত শক্ত ঘাঁটি ছিল। শেলপ্রুফ বাংকারের চারদিক কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে মাইন বসিয়ে আধুনিক মারণাস্ত্রসহ পাকিস্তানিরা সদা সতর্ক থাকত। ৩১ জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দীন মমতাজ ও ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে কামালপুর বিওপিতে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধে সার্বিক নেতৃত্ব দেন মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী। প্রায় একই সময় তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সীমান্ত থেকে অনেক দূরে বাহাদুরাবাদ ঘাট ও দেওয়ানগঞ্জে সফল আক্রমণ চালায়। এ যুদ্ধে সার্বিক নেতৃত্ব দেন মেজর শাফায়াত জামিল। দুই দিন পর ৩ আগস্ট আমার নেতৃত্বে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একাংশ নকশী বিওপি আক্রমণ করে। যুদ্ধের সার্বিক নেতৃত্বে ছিলেন মেজর এ জে এম আমিনুল হক।

তখন ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দেখতে চাচ্ছিল, জেড ফোর্সের সেনা ও মুক্তিযোদ্ধারা কতটা দক্ষ সৈনিক হয়েছে? সত্যিকার অর্থে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো সক্ষমতা তারা অর্জন করেছে কি না? তাই সিদ্ধান্ত হয়, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তিনটা আক্রমণ পরিচালনা করবে। একটা চালাবে কামালপুর বিওপিতে, দ্বিতীয়টা বাহাদুরাবাদ ঘাটে, আর তৃতীয়টা চালাবে নকশী বিওপিতে।

লেখকের দাদা শহীদ হোসেন উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী

লেখকের বাবা সুলতান আহম্মেদ চৌধুরী ও মা আজিজুন নেসা চৌধুরানী। ১৯৫৩

চট্টগ্রামের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার (সানগ্লাস পরা) ও লেখক (কাপ হাতে ডানে)। ১৯৭০
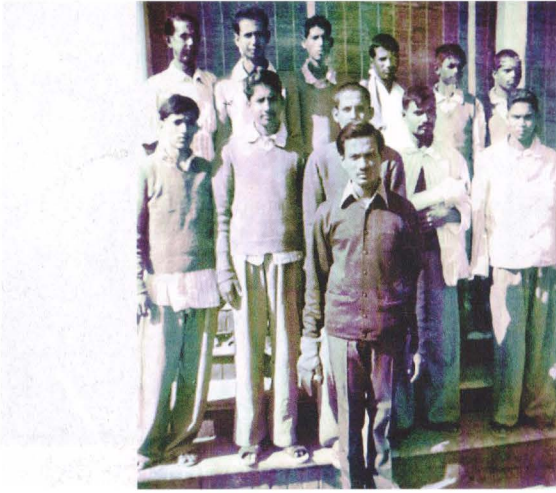
লক্ষ্ণৌ কমান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে লেখক। ১৯৭১

ব্রিগেডিয়ার মজুমদার

কর্নেল এম আর চৌধুরী

ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হক বীর উত্তম

আলাউদ্দিন হোসেন চৌধুরী

সুবেদার তাহের

পূর্ব জার্মানিতে। ১৯৭২

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে লেখক (ডান থেকে দ্বিতীয়), উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ও অন্যান্য। ১৯৭২

বিয়ের দিন জেনারেল এম এ জি ওসমানী ও বাবার সঙ্গে লেখক। ৯ মে ১৯৭৫

সিলেট সেনানিবাসে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে লেখক। মে ১৯৮০

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের বিপণন কর্মসূচির অনুষ্ঠানে লেখক। ১৯৮৭

কুয়েতে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে নিয়োজিত বাংলাদেশি সেনাদের সালাম গ্রহণ করছেন লেখক। ১৯৯৩

৬ষ্ঠ সাফ গেমসের ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন লেখক। ১৯৯৩

মেজর জেনারেল আবদুর রবের সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসে শিখা অনির্বাণে লেখক। ১৯৯৪

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ সেনাসদর দপ্তরের পক্ষ থেকে আধুনিক অর্থোপেডিক সার্জারির জনক ও নিটোর (এনআইটিওআর) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. আর জে গার্স্টকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করছেন লেখক। ১৯৯৪
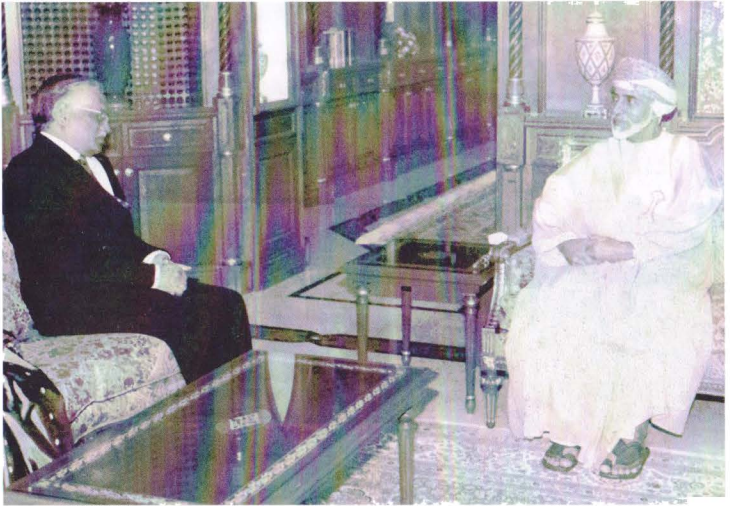
ওমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে সে দেশের শাসক সুলতান কাবুস বিন সাঈদ আল সাঈদের সঙ্গে লেখক। ডিসেম্বর ২০০২

ওমানের দিওয়ান অব রয়েল কোর্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সাঈদ আলী বিন হামুদ আল বুসাইদির কাছ থেকে আল নুমান খেতাব গ্রহণ করছেন লেখক। ডিসেম্বর ২০০২

স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে লেখক। বাঁ থেকে বড় ছেলে লুৎফুল আমীন জোনাক, লেখক, স্ত্রী সৈয়দা লতিফা আমীন ও ছোট ছেলে ইফতেখার আমীন পিনাক। ডিসেম্বর ২০০২

নকশী বিওপি আক্রমণ

আমি অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলাম ৯ জুলাই। যোগ দেওয়ার পর গোটা জুলাই মাস পূর্বপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাসহ স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। পাশাপাশি নকশী এলাকায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থানও পর্যালোচনা করা হয়। অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে নিয়মিত সেনা ছিল না বললেই চলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে এই বাহিনী পাকিস্তান যাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। কিছুসংখ্যক চলেও যায়। কিছু ছুটিতে ছিল। যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তখন এই বাহিনীর লোকবল ছিল অর্ধেকের কিছু বেশি। প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে বাহিনীর শক্তি আরও কমে যায়। পরে এই বাহিনীতে কিছুসংখ্যক ইপিআর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাকি সব ছিল স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। তারাই ছিল বেশি। যাদের আগে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ামাত্র তাদের রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নকশী বিওপি (Border Out Post) ছিল তৎকালীন জামালপুর মহকুমার (বর্তমানে জেলা) ঝিনাইগাতি থানার অন্তর্গত। জামালপুর মহকুমা সদর থেকে প্রায় ৩৫ মাইল উত্তরে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পাকিস্তান বাহিনীর ৩৬ অ্যাডহক ডিভিশনের ৯৩ পদাতিক ব্রিগেডের ওপর ন্যস্ত ছিল। মেজর জেনারেল জামশেদ খান ছিলেন ডিভিশনের জিওসি। আর ৯৩ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার কাদের খান নিয়াজি এবং সদরদপ্তর ছিল ময়মনসিংহে। নকশী বিওপি ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের অপারেশন এলাকাধীন ছিল। ৩১ বালুচের ব্যাটালিয়ন সদরদপ্তর ছিল জামালপুর সদরে। এর অধিনায়ক ছিল লে. কর্নেল সুলতান আহমেদ, সিতারা-এ-

জুররাত। নকশী বিওপিতে নিয়মিত বাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য এবং সহযোগী হিসেবে আরও প্রায় ২ প্লাটুন মিলিশিয়া ও রাজাকার ছিল। এই মিশ্র বাহিনীর অধিনায়ক ছিল মেজর রিয়াজ। ব্যাটালিয়ান ৩ ইঞ্চি মর্টারে সজ্জিত ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী নকশী বিওপিকে শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে গড়ে তোলে। বিওপির চারদিকে ছিল পুরু দেয়াল। দেয়ালের কাছাকাছি বাংকারগুলো মর্টার ও আরসিএলের গোলার আঘাত থেকে রক্ষা করার উপযোগী করে নির্মাণ করা হয়। বিওপির মাঝখানে ৩০X৩০ বর্গফুট আকৃতির বড় বাংকার নির্মাণ করা হয়। এটি ছিল কংক্রিটের তৈরি, যা আর্টিলারি কামান ও মর্টারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী। আর পরিখার মাধ্যমে বাইরের বাংকারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত ছিল। বিওপির চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে প্রতিবন্ধকতা জোরদার করা হয়েছিল। চারদিকে প্রায় ছয়শ গজ এলাকার গাছপালা কেটে ফিল্ড অব ফায়ার তৈরি করা হয়। এ ছাড়া কাঁটাতারের বেড়ার ভেতরে অ্যান্টি পার্সোনাল মাইন ও বুবিট্র্যাপস পুঁতে রাখা হয়। তারপর বিওপির মাটির দেয়াল পর্যন্ত মাটিতে প্রচুর বাঁশের কঞ্চি গেঁথে প্রতিবন্ধকতা আরও মজবুত করা হয়।

৩ আগস্ট ভোররাতে অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো ও ডেল্টা—এই দুই কোম্পানি মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে নকশী বিওপি আক্রমণের ব্যূহ রচনা করি। এর আগে তিন দিন পুরো বিওপি আমি নিজে প্যাট্রোলিংয়ের একটি দল নিয়ে পর্যবেক্ষণ বা রেকি করি। মুক্তিযুদ্ধের আগে নকশী বিওপিতে কর্মরত ছিলেন ইপিআরের সুবেদার হাকিম ও তাঁর কয়েকজন সাথি। তাঁরা আমাকে এ ব্যাপারে সক্রিয় সাহায্য করেন। এই বিওপির চারদিক তাঁদের নখদর্পণে ছিল। প্রথম দিন সুবেদার হাকিমকে নিয়ে নকশী বিওপির আশপাশ রেকি করি একটি উঁচু টিলা থেকে। বাইনোকুলারে হাকিম আমাকে বললেন, কোথায় শত্রুদের বাংকার, কাঁটাতারের বেড়া, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, নামাজের স্থান, প্রবেশপথ এবং কোথায় কত সেনা থাকতে পারে ইত্যাদি। পরে গারো পাহাড়ে গিয়ে চুপি চুপি শত্রুশিবিরে কর্মরত বাবুর্চির সঙ্গে দেখা করা হলো। বাবুর্চি বলল, কুক হাউসে ৪৫ জনের খাবার রান্না করা হয়। তারা রুটি খায়। আরও ২০ জনের মতো আধা সামরিক ও রাজাকার বাহিনীর লোক ডিউটি করার জন্য আসে। ২০ জন রাজাকার বিভিন্ন জায়গায়, যেমন হালুয়াঘাট, জামালপুর সড়ক এলাকায় ডিউটি করে।

দ্বিতীয় দিন আমাদের কয়েকজন প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আমি আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালাপথ রেকি করি। কোথায় কোন হাতিয়ার (অস্ত্র) পজিশনে থাকবে, কোথায় এফইউপি (ফর্মআপ প্লেস) হবে, তা তাদের দেখিয়ে দিই। ১ আগস্ট সব সেকশন কমান্ডারকে নিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গা আবার দেখিয়ে আনি। যাতে রাতের আঁধারে তাঁরা ভুল না করেন। এর মধ্যে চলতে থাকে অন্যান্য প্রস্তুতি। সাপোর্টিং অস্ত্র মেশিনগান, ১০৬ মিমি ও ৭৫ মিমি আরআরের (রিকোয়েললেস রাইফেল) জন্য বাংকার তৈরির উদ্দেশ্যে ২৫টি আড়াই মণি চটের বস্তা নিয়ে আসা হয়। এত প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। পাকিস্তানিরা অবশ্য উত্তর দিকে বিওপির চারদিকে প্রায় ৬০০ গজ এলাকার সমস্ত গাছপালা, জঙ্গল কেটে কিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে পরিষ্কার করে রেখেছিল।

তৃতীয় দিন আবার রেকি করি। এদিন হালছটি গ্রামের নালার পাশে একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ মনে করে আমরা থমকে দাঁড়াই। ভুল বুঝতে পেরে আমি একগাল হাসতে যাব এমন সময় ঝুপ করে একটি শব্দ হলো। মনে হলো, একটি লোক নালার ভেতর দিয়ে পালাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেকশন কমান্ডাররা জড়সড় হয়ে একে অপরের মুখোমুখি হয়ে পজিশনে গেল। সেটা দেখে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। আসলে তাদের আরও ছড়িয়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ করে (ডায়মন্ড ফরমেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেওয়া উচিত ছিল। বোঝা গেল, আরও অনেক প্রশিক্ষণের দরকার। ভাগ্যিস, এই ঝুপ আওয়াজ হয়েছিল নালাতে পাড় ভেঙে ধসে পড়া মাটি থেকে। তা না হলে গোল হয়ে থাকা মুক্তিবাহিনীর এই দলটিকে নিমেষের মধ্যে শেষ করে দেওয়া একজন শত্রুসেনার পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফিরে আসার সময় একটি গারো মেয়ে আমাদের দেখে নিমেষের মধ্যে পাহাড়ের গাছের সঙ্গে মিশে রইল। ধারণা করা মুশকিল ছিল, অমন ফাঁকা জায়গায় কোনো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। মেয়েটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সুবেদার হাকিম যখন ইশারায় দেখাল, তখন আমি হতভম্ব। তাকে দেখে মনে হলো, কেমন করে শত্রুর চোখ ফাঁকি দিয়ে গাছের আবডালে লুকিয়ে পজিশন নিতে হয়, তা ওই পাহাড়ি মেয়ের কাছ থেকে শেখার আছে।

২ আগস্ট বিকেলে জিয়াউর রহমান পরিকল্পনা মোতাবেক অস্ত্রের অবস্থানগুলো স্বচক্ষে দেখলেন। রাতে রাস্তা থেকে গাড়ি পড়ে যাওয়ায়

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল। তখন ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে প্রথম ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন মাহবুব (মাহবুবুর রহমান বীর উত্তম। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে বৃহত্তর সিলেটের কানাইঘাট রণাঙ্গনে শহীদ হন) আমাকে বললেন, 'স্যার, মনে কনফিউশন থাকলে অ্যাটাক করতে যাবেন না।' আমি হেসে বললাম, 'বেকুবের মতো মরতে আমি রাজি নই।' ২ আগস্ট রাত ১২টার দিকে অ্যাসেমব্লি এরিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় বাহাদুরাবাদঘাট যুদ্ধে বিজয়ী বীর মেজর শাফায়াত জামিল জিপ নিয়ে এলেন। বললেন, 'আমীন, রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইয়োরসেলফ। অল দ্য বেস্ট।' অর্থাৎ অসম্ভব কোনো টার্গেট জয় করতে যাবে না। বলা বাহুল্য, সেনাবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা তখন ইংরেজিতে কথোপকথনটা একটু বেশিই করতেন। যদিও মরার আগে প্রায় সবাই বরাবরই বাংলাতেই চিৎকার দিতেন।

অ্যাসেমব্লি এরিয়া থেকে অত্যন্ত সাবলীল গতিতে মুক্তিযোদ্ধারা এফইউপিতে পৌঁছায়। এমনকি মাঝপথে নালা অতিক্রম করার সময়ও তারা কোনো শব্দ করেনি। কারণ, আগের দুই রাত বিনা শব্দে পানির ওপর চলার প্র্যাকটিসও তারা করেছিল। একই সময় দুই প্লাটুন মুক্তিযোদ্ধা রাঙ্গাটিয়াতে যায় কাটঅফ পার্টি হিসেবে। যদিও ইপিআরের গার্ড ছিল; তবু মনে হলো, এফইউপি মার্কিং করতে গিয়ে যে সামান্য বিশৃঙ্খলাটুকু হয়েছিল, তা-ও হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা যখন এফইউপিতে যাচ্ছে, তখন আমি ৮-১০ জন স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাকে (এফএফ) নিয়ে মেশিনগান ও আরআরের অ্যামুনিশন বাংকারে পৌঁছে দিই। উদ্দেশ্য, তাদের মনে সাহস জোগানো। তারা সবাই ছাত্র ছিল এবং যুদ্ধের ফলাফল তাদের ওপরই অনেকটা নির্ভর করছিল। বাংকারের পেছনে অবস্থানরত সুবেদার হাকিম তখন রীতিমতো খেপে গেছেন। কারণ, তিনি নিজে তো খাবার পাননি এবং তাঁর অধীন মুক্তিযোদ্ধা, যারা সারা রাত ধরে ওই আড়াই মণি বস্তায় বালি ভরে বাংকার বানিয়েছে, তারাও পায়নি। তাঁর আচরণে আমি রেগে গেলেও নিজেকে সংযত রেখে বললাম, ভুলি নাই। আপনাদের রুটি পেছনে অ্যাসেমব্লি এরিয়াতে রয়ে গেছে। কাউকে পাঠিয়ে আনান।

এফইউপিতে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনুল হক আমাকে একাকী শত্রু-অভিমুখে ঠেলে না দিয়ে আমার সঙ্গে তিনি নিজেও যেতে চাইলেন। আমি সেই দুঃসাহসী বীরযোদ্ধাকে ইকোনমির কথাটা

বোঝালাম। নিছক ভাবালুতায় কাজ হবে না—একসঙ্গে দুজন অফিসার হারানো মুক্তিবাহিনীর জন্য তখন নিছক বোকামি। রাত তিনটা ৩৫ মিনিটে এফইউপিতে পজিশন নেওয়া হলো। আমার ডানে ১২ নম্বর প্লাটুন আর বাঁয়ে ৫ নম্বর। ১২ নম্বর প্লাটুনে আমার ভাগনে আইএ ক্লাসের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরফে সানু সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার পাশেই ছিল। আশ্চর্য, আজ আত্মীয়তার প্রশ্ন আবার বড় হয়ে দেখা দিলেও (যেহেতু স্বজনপ্রীতি আমাদের মজ্জাগত) সেদিন কিন্তু এ প্রশ্নটা তেমন করে দেখা দেয়নি। সেদিন রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঝংকৃত হয়েছিল, 'ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কান্ডারি বল মরিছে সন্তান মোর মার'। তাই বুঝি ঘুণাক্ষরেও যুদ্ধের ময়দানে ভাগনের উপস্থিতি একেবারেই টের পাইনি। স্বাধীনতার পর জার্মানি থেকে চিকিৎসা শেষে ফেরত আসার পর তার সঙ্গে দেখা হয় চৌমুহনী পোস্ট অফিসে। ওই পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ছিলেন ওর বাবা এ কে এম শফিকুর রহমান।

এফইউপিতে পজিশনে গিয়ে রাত তিনটা ৪৫ মিনিটে ওয়্যারলেসে বললাম, 'জোরে মারো।' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারি গর্জে উঠল। গোলার আওয়াজে এফইউপিতে আমাদের স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত হলো। ব্যাপারটা আরও প্রকট হয়, যখন আমাদেরই প্রিএইচ আওয়ার (আক্রমণের আগে) আর্টিলারি গোলার দুই-তিন রাউন্ড ভুলবশত এফইউপিতে এসে পড়ে। যদিও টার্গেট থেকে আমাদের এফইউপি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। এফইউপি, শত্রুশিবির ও আমাদের সাপোর্টিং আর্টিলারি পজিশন একই লাইনে থাকায় ভুলবশত আর্টিলারির গোলা এফইউপিতে এসে পড়ে। এটা পরে ধারণা করি। আর্টিলারির দক্ষতার ব্যাপারে সন্দিহান হলে ডানে হালছটি গ্রামের শালবনকে এফইউপি বানানো যেত। কিন্তু তখন সে সুযোগ ছিল না। হালছটি গ্রামের শালবন শত্রুশিবির থেকে মাত্র তিন শ গজ দূরে ছিল। এর আগে ওই শালবনকে এফইউপি বানিয়ে স্বল্প প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল নকশী বিওপির ওপর আক্রমণ করেছিল। তাই ওই শালবনকে আমি এফইউপি করিনি।

আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের শালবনকে এফইউপি বানিয়ে আর্টিলারির 'ফায়ার অন কল' রেখে আক্রমণ করা। তাতে রাতের আঁধারে শত্রুর অজান্তে আমাদের পক্ষে শত্রুশিবিরের তিন শ গজের মধ্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে। এরপর আরআর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে

আচম্বিতে ঘায়েল করে তাদের প্রতিরক্ষায় প্রবেশ করব। পাশাপাশি দরকারমতো আর্টিলারি সাপোর্ট ব্যবহার করব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্বপরিকল্পনা বদল করে প্রিএইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম।

এদিকে যুদ্ধের আগেই এফইউপিতে আমাদের আর্টিলারির দুই-তিন রাউন্ড গোলা এসে পড়ায় ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা গুরুতররূপে আহত হয়। ফলে পুরো প্লাটুন আহতদের শুশ্রূষার নামে এফইউপিতেই থেকে যায়। এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অন্যদিকে আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠার মিনিট খানেকের মধ্যেই পাকিস্তানি আর্টিলারিও গর্জে ওঠে। একই সময় দুই পক্ষে শুরু হয়ে যায় অবিরাম গুলি। এর মধ্যে কখনো মাটিতে শুয়ে পড়ে ক্রল করে, কখনো দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি, বিশেষ করে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর দুই কোম্পানির তিন শ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে মাত্র ১২ জন ছিল সামরিক বাহিনীর। ২০ জন ছিল ইপিআরের সেনা। কয়েকজন ছিল পুলিশের। বাকি সবাই তিন বা চার সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামবাংলার একান্ত সাধারণ ছেলেপেলে। এদের মধ্যে কিছু শহরের ছাত্র-যুবক ছিল।

প্রিএইচ আওয়ারে গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমার ডানে আমাদের মেশিনগান ও আরআর প্রচণ্ডভাবে গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে একদল মুক্তিযোদ্ধা (ইপিআর প্লাটুন) ভাঁওতা দেওয়ার জন্য আক্রমণ করে পাকিস্তানিদের ভ্যাবাচেকা খাইয়ে দেয়। এই কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে চলতে থাকে। ইপিআরের মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ চলাকালেই অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের দুই কোম্পানি চুপি চুপি এক্সটেন্ডেড লাইন (লম্বা রেখার মতো) ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগোতে থাকে। এ সময় সুবেদার জালাল যথেষ্ট দৌড়াদৌড়ি করে। এফইউপি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধা (ছাত্র) পাশ থেকে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠল, 'স্যার, বাঁ দিক থেকে গুলি আসছে যে!' ভাবখানা এই, গুলি তার পিছু ধাওয়া করছে। হাসি পেলেও চিৎকার করে বললাম, 'গুলি আসবে না তো বৃষ্টির ধারা আসবে?'

তারপর পাঁচ শ গজ আগে নালার কাছে পৌঁছে শুধু দুই ইঞ্চি মর্টার দলকে নালার পাড় আড়াল করে তিন শ গজ আগে পাকিস্তানি শিবিরের ওপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভালো হতো। কারণ, এই নির্দেশের সুযোগে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা

আড়াল নিয়ে নিল। তাতে কমান্ড ও কন্ট্রোল একেবারে শিথিল হয়ে পড়ল।

নায়েব সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে মুক্তিযোদ্ধাদের ৫ ও ৬ নম্বর প্লাটুন বিওপির গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার কথা ছিল। তারা নালার ভেতরে আড়ালে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করল (আমি যখন পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিই, তখন সেখানে এফইউপি ত্যাগ করার পর 'ফায়ার অ্যান্ড মুভ' পদ্ধতিতে আক্রমণ করা বিতর্কের বিষয় ছিল। প্রায়ই বলা হতো, এফইউপি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যাগেইন)। নালাতে মুক্তিযোদ্ধাদের এমন কাণ্ড দেখে শত্রুশিবিরের কাছে এসেও চিৎকার না করে পারলাম না। এমনকি কাউকে কাউকে লাথি পর্যন্ত মারতে হলো। তাতেও কাজ হলো না। শেষে উপায় না দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের কলার চেপে ধরে জোর করে আগে পাঠাতে শুরু করি। অবশ্য আমার বাঁয়ে হাবিলদার নাসির তাঁর সেকশন নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে যায়। আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সঙ্গে করে ডান বাংকারের দিকে এগোতে থাকি। হাবিলদার নাসির ও নায়েক সিরাজের অধীন মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত।

ইতিমধ্যে আমি অ্যাসল্ট লাইন ফর্ম তৈরি করে চার্জ বলে হুংকার দিয়ে উঠি। পরমুহূর্তে 'জয় বাংলা' ও 'ইয়া আলী' বলে মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমতো দৌড়াতে শুরু করে। তাদের উত্তেজনাকে বাড়ানোর জন্য নায়েব সুবেদার মুসলিম 'জয় বাংলা' ও 'নারায়ে তকবির' ধ্বনি করলে মুক্তিযোদ্ধারা ঘন ঘন 'জয় বাংলা' ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করে যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে সিগন্যালম্যান ওয়্যারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরে, যাতে আমি যুদ্ধের তখনকার অবস্থার কথা জেড কোয়ার্টারে জানাতে পারি। আমি সিগন্যালম্যানকে ধমক দিয়ে বলি, 'তুমি নিজেই যা পারো বলে পাঠাও।' আমার পিছু পিছু সে ওয়্যারলেসে জোশের সঙ্গে বলছিল, 'হয়ে গেছে, আর একটু বাকি..., বাংকারে বাংকারে যুদ্ধ হচ্ছে' ইত্যাদি।

ঠিক এই সময় আমাদের অবস্থানে পাকিস্তানি আর্টিলারির শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) ও মর্টার শেল এসে পড়তে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা মাটিতে ঢলে পড়ল। তাদের মধ্যে সম্ভবত হাবিলদার নাসিরও (নাসির উদ্দিন বীর উত্তম) ছিল। আমার ডান

পায়ে এসে শেলের টুকরা লাগল। এতে আক্রমণকারী কিছু মুক্তিযোদ্ধা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল এবং কিছু মুক্তিযোদ্ধা এর মধ্যেও এগিয়ে যেতে থাকল। অন্যদিকে আমিও আমার আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি না করে জোশের সঙ্গে এগিয়ে গেলাম আরও ৫০ গজ। সেখান থেকে পাকিস্তানিদের বাংকার মাত্র ৫০-৬০ গজ দূরে। সাহসের সঙ্গে সামনে এগিয়ে যাওয়া মুক্তিযোদ্ধারা তখন পলায়নরত পাকিস্তানিদের মারার জন্য তাড়া করতে শুরু করেছে। এটা করতে গিয়ে কেউ পাকিস্তানিদের মাইন বা মর্টার শেলে উড়ে গেল। কেউ বা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে গেল। এদের মধ্যে একজন ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্সের ছাত্র শামসুজ্জামান (এই যুদ্ধে শহীদ। স্বাধীনতার পর বীর উত্তম খেতাবে ভূষিত)। সে-ও ভূমি মাইন বা মর্টারের গোলার তোপের মুখে উড়ে গেল।

এদিকে পেছনে নালা থেকে মুক্তিযোদ্ধা যারা মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করছিল, তাদের ফায়ারে দুজন কম বয়সী মুক্তিযোদ্ধা আহত হয়। এ অবস্থায় তখন করার কিছুই নেই। এর আগে এফইউপি থেকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সময় নালাতে অবস্থানকালে এভাবে মাথা নিচু করে আন্দাজে গুলি করার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পেছনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

যুদ্ধক্ষেত্রে তখন ভয়াবহ এক অবস্থা। এসব দেখে বাকি ২০-২৫ জন মুক্তিযোদ্ধার মনোবল ভেঙে পড়তে পারে, তাই তাদের মন চাঙা রাখার জন্য আমি জোরে জোরে চিৎকার করে বললাম, 'বিওপি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে, আগে বাড়ো।' অবশ্য তখনো বিওপির মাটির দেয়াল আগের মতোই খাড়া ছিল। এমন সময় আমার বাঁ পায়ে বাঁশের কঞ্চি বেঁধে। আমি পড়ে যাই। পড়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আহত এক পাকিস্তানি সেনা সঙিন উঁচু করে আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসতে থাকে। কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সালাম (সে ছিল এক সুবেদার মেজরের ছেলে। অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ছিল। আমার অমতেই সে ওই যুদ্ধে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে) তাকে গুলি করে। গুলিতে ওই পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ফলে আমি বেঁচে যাই।

মাটিতে পড়ে গিয়ে আরও দুই পাকিস্তানি সেনাকে আমার দিকে অস্ত্র উঁচু করে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ধাবমান ওই শত্রুকে লক্ষ্য করে আমি নিজে গুলি করলাম। ডান দিকের এক বাংকারে ছিল কিছু পাকিস্তানি সেনা। তাদের লক্ষ্য করে গুলি করার জন্য অদূরে থাকা মুক্তিযোদ্ধা হানিফকে নির্দেশ দিলাম। সে ছিল অবাঙালি (বিহারি)। হানিফ তখন

ভীষণভাবে আমাকে অনুরোধ করে বলছে, 'স্যার, আপ পিছে চালা যাইয়ে, মাই কাভারিং দে রাঁহা হু।' অর্থাৎ আপনি পেছনে চলে যান, আমি কাভারিং ফায়ার দিচ্ছি। বলা বাহুল্য, হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিল সে। বেশ কয়েকটা অপারেশন করার পরও ভালো করে বাংলা বলতে না পারার কারণে সন্দেহভাজন হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাকে বন্দী করে। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর বন্দিশিবিরে তার দেখা পাই। তখন সে আমাকে ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলেছিল, 'স্যার, আমি বেইমান নই, আমি আমার বাঙালি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মান রক্ষা করব, একটা চান্স দিন, জান দিয়ে প্রমাণ করব যে আমি বেইমান নই।' আমি তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলাম, 'তোমাকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করছি। মুক্ত হওয়ার পর তুমি আমার পার্সোনাল গার্ড হবে, পারবে?' প্রত্যয়ভরা মুখে হানিফ বলেছিল, 'স্যার, আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না।'

সত্যিই হানিফ জীবিত থাকাকালে আমার গায়ে গুলি লাগেনি (অবশ্য শেলের টুকরা লেগেছিল)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেওয়ার আগেই একটা হিস শব্দ হলো। দেখলাম, হানিফ ঢলে পড়ছে। মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছিল। তার মাথায় স্টিল হেলমেট ছিল না। ঢলে পড়া হানিফের হ্যাভারস্যাকে ধাক্কা দিয়ে ডাক দিলাম, হানিফ, হানিফ। কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। আমার প্রাণটা কেঁদে উঠল। এই সময় আমার পাশের মাটি গুলিতে উড়ে গেল। বুঝতে পারলাম, শত্রুদের কেউ আমাকে দেখে ফেলেছে। সাইড রোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। ঠিক তখনই বাঁ দিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডান হাতের কনুইয়ে লাগল। ঝাঁ করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। আমার হাতের স্টেনগানটা ছিটকে পড়ল। বাঁ হাত দিয়ে তা কুড়িয়ে নিলাম। আমার ডান হাতের কবজিটা বেঁকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড ড্রেসিং বের করার চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আলটা উড়িয়ে দিল।

চিন্তা করলাম, শত্রুর ৫০ গজের ভেতরে আর থাকা সম্ভব নয়। চারদিকে শুধু মৃতদেহ। কিছুক্ষণ আগে আট-দশ জন মুক্তিযোদ্ধা শত্রুর বাংকারে ঢুকে পড়েছিল। তারা বেশির ভাগ পাকিস্তানিদের মর্টার-আর্টিলারি ফায়ারে ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের ল্যান্স নায়েক সুজা মিয়াও ছিল।

পাকিস্তানি শিবিরের ৫০ গজের ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড ড্রেসিং বের না করে আমি আবার সাইড রোল শুরু করলাম। উদ্দেশ্য, পেছনের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ স্থানে পশ্চাদপসরণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি, আমি ডানে না গিয়ে কোনাকুনি শত্রুশিবিরের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছি। উত্তেজনায় সেটা খেয়াল করিনি। মাথাটা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করলাম। তারপর একটু দম নিয়ে পেছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। শরীর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে আসছে। চিন্তা করলাম, পাকিস্তানিরা আমাকে দেখে ফেলার আগেই এবং শরীর গরম থাকতে থাকতেই শালবন এলাকায় পৌঁছাতে হবে। সেটার দূরত্বও কম নয়। প্রায় হাজার গজ। আমি শালবনের দিকে ক্রল করতে শুরু করলাম। এ সময় হঠাৎ ওখানে কোথা থেকে যেন দৌড়ে এল কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সালাম। পড়ে থাকা একটা এলএমজি নিয়ে সালাম 'জয় বাংলা' বলে হুংকার দিয়ে শত্রুবেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া পাকিস্তানি সেনারা তখন কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পেছনে একত্র হচ্ছিল। তারা ঘন ঘন 'নারায়ে তকবির, আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিচ্ছিল। ওদিকে সালাম 'ওরে, তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি তোদের ছেড়ে দেব?' বলতে বলতে পাগলের মতো শত্রুবেষ্টনীর ভেতর ঢুকে পড়ল। আমি খুব কষ্টে মৃদুস্বরে একবার ডাক দিলাম, 'সালাম, চলে এসো।' কিন্তু আমার ডাক তার কানে পৌঁছায়নি। কিছুক্ষণ আগেই সালাম আমার জীবন রক্ষা করেছিল। সেই সালাম আর ফিরে আসতে পারেনি।

পুরো যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান! মৃতদেহ ছাড়া আর কোনো জীবিত মানুষ নেই। বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হচ্ছে দুদিক থেকেই। শালবনে থাকা আমাদের মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠছে। সম্ভবত তারা আমাদের পশ্চাদপসরণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের কাভারিং ফায়ার দিচ্ছিল। নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডানে অপেক্ষাকৃত নিচু ধানখেতের ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করলাম। এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল। 'এরে, আঁই বাঁচতে চাই, তোরা কেউ কি আঁর কথা শুনতাছ না, এরে আঁরে লই যা।' শুনে আমার প্রাণটা কেঁদে উঠল। কিন্তু আমি নিজেই আহত। বাঁচার চেষ্টা করছি। তাই আমারও করার কিছুই ছিল না। আমি তাকে উদ্দেশ করে বললাম, 'বেটা, চিৎকার করিস না।' এমন সময় একটি মর্টারের শেল এসে কাছাকাছি পড়ল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিও শুরু হলো। গুলিতে

পাশের মাটি উড়ে গেল। আমি মাথাটা নিচু করে কিছুক্ষণ মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলাম। এরপর বাঁ হাতের ওপর ভর দিয়ে নিজের আহত শরীরটাকে তাড়াতাড়ি আমি নালার দিকে নিয়ে গেলাম। যাওয়ার সময় আর কারও ডাক শুনতে পেলাম না। নালার কাছে পৌঁছে সব শক্তি প্রয়োগ করে খুব কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর টলতে টলতে কেমন করে যেন নালাটা পার হয়ে গেলাম। ওপারে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। শোয়া অবস্থায় স্বস্তি বোধ করলাম এই ভেবে যে অন্তত শত্রুর স্মল আর্ম ফায়ার থেকে বাঁচার মতো নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে গেছি।

শরীরটা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে আসছিল। সমস্ত জোর দিয়ে আবার দাঁড়িয়ে দৌড় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কয়েক কদম যাওয়ামাত্র একঝাঁক গুলি পায়ের কাছের মাটি উড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে মাটির ওপর শুয়ে পড়লাম। গুলি আর আসছে না দেখে একটু স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু সেটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য। মিনিট পার হওয়ার আগেই টের পেলাম, ১০-১২ জন শত্রুসেনা (পাকিস্তানি ও বাঙালি সহযোগী) এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পেছনে নালার ওপর আহত এক মুক্তিযোদ্ধাকে পেয়ে একগাল হাসি হেসে পাকিস্তানিরা গুলি করল। এরপর কিছুক্ষণ সাড়াশব্দ নেই। তারপর হঠাৎ শত্রুর দলের থেকে একজন বাংলায় বলে উঠল, 'মকবুল, এদিকে আয়, পাওয়া গেছে।'

চিন্তা করলাম, কর্দমাক্ত মাটির ওপর দিয়ে আমি আমার শরীরটাকে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে এসেছি। আসার সময় শরীর থেকে রক্তও ঝরেছে। আমার আসার পথ আমারই শরীরের ছোপ ছোপ রক্তে রঞ্জিত। আবার দ্রুত ক্রলিং শুরু করলাম। শুরু হলো শত্রুর সঙ্গে লুকোচুরি। ধানখেতের আড়াল দিয়ে প্রায় ৩০০ গজ যাওয়ার পর খোলা ময়দানে গিয়ে পড়লাম। কাদাপানির মধ্য দিয়ে আসায় ভীষণ শীত করছিল। যেখানে পৌঁছালাম, সেখানে কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। আমাদের যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ডভাবে ফায়ার করছিল, সেটাও চুপ হয়ে গেছে। এফইউপির তত্ত্বাবধানে যারা ছিল, তারাও সম্ভবত চলে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম, আটটা ১০ মিনিট। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। এর মধ্যে মনে পড়েনি কোনো প্রিয়জনের কথা, চেনা মুখ বা কোনো চিঠির অংশবিশেষের কথাও। গুঞ্জরিত হয়নি কোনো মিহি সুরের ঝংকার বা একপলক মিষ্টি হাসির মধুর ঝলক। শুধু মনে হচ্ছিল, একজন মুক্তিযোদ্ধা যদি একটা কাভারিং ফায়ার দেয়, তাহলে আমি রক্ষা পাই।

কারণ, ৫০-৬০ গজ দূরে তখনো শত্রুরা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই যেন তলিয়ে যাচ্ছি। শেষবারের মতো তাই টেনেহিঁচড়ে নিজের ক্ষত-বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারি শেলে সৃষ্ট একটি মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। বাঁ হাতে ধীরে ধীরে কর্দমাক্ত কালো মাটি গলা পর্যন্ত লেপে দিলাম, যাতে শত্রু আমার উপস্থিতি টের না পায়। তারপর স্টিল হেলমেট মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের।

শোয়ার পর চোখটা আপনা থেকেই বুজে আসছিল। এ সময় হঠাৎই চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের মুখের ছবি। ভাবলাম, যুদ্ধে যোগ দেওয়ার আগে মাকে দেখে আসা অবশ্যই উচিত ছিল। মা-বাবা, ভাইবোন কে কোথায়, কিছুই জানি না। তাঁরাও জানলেন না, আমি কেমন করে মরতে যাচ্ছি। চোখের সামনে ভেসে উঠল ছোট দুই বোন সুলতানা ও কোহিনূরের মুখের ছবি। আবারও চমকে উঠলাম। ভাবনা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে জোর করে চোখ খুলে চাইলাম। স্টেনগানটা বাঁ হাতে ধরা। চিন্তা করলাম, বন্দী হব না কোনোক্রমেই। বরং মেরে মরব। এ কথা ভেবেছি বটে, কিন্তু মনেপ্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারিনি। কেন জানি মনে হচ্ছিল, নিশ্চয়ই বেঁচে যাব।

আশ্চর্য, এত বিহ্বলতার মধ্যেও একটা কথা বারবার মনে পড়ছিল—আহা, কেউ যদি আমার হারিয়ে যাওয়া ডায়েরিটা পেত! কিংবা এখানে-ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো। ঠিক এমন সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনুল হকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল শালবন থেকে, 'আমীন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করো।' আহত হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো সক্রিয় কারও সাহায্য। আমি তখন নিহত বা নিখোঁজ—এই সংবাদ পেয়ে মেজর (তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিনুল হক কমান্ডো (অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের মূল সৈনিক) প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। এটা আমি পরে জানতে পারি। আমিনুল হক কমান্ডোসহ খুঁজতে খুঁজতে আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে আসেন। একপর্যায়ে আমাকে দেখতে পান। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে আমি মাথা উঁচু করে তাঁদের দেখতে পেলাম। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে শক্তি পেলাম না। আমিনুল হকের পাশে দণ্ডায়মান এক মুক্তিযোদ্ধা আমার কাছে ক্রল করে আসতে ইতস্তত করছিল। দেখে তিনি নিজেই খালি হাতে আমার দিকে ক্রল করতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার তাহের

(পরে সুবেদার মেজর) তাঁর পিছু নিল। আমিনুল হক কাছে এসে আমার স্টেনগানটি আমার ক্ষতাক্ত পায়ের সঙ্গে বাঁধলেন। স্ট্রেচারের মতো বানিয়ে একটু আলগা করে ওপরের দিকে তুলে ধরে তিনি ও তাহের পর্যায়ক্রমে খুব যত্নসহকারে আস্তে আস্তে আমার পা ধরে টানতে থাকেন।

ব্যথায় কুঁকড়ে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। বেঁচে যাওয়ার আনন্দে ব্যথা কিছুটা ভুলেও গেছি। দূরে শালবন থেকে লেফটেন্যান্ট মোদাসসের চিৎকার করে আমিনুল হককে উদ্দেশ করে বলল, 'তাড়াতাড়ি করেন, স্যার।' কমান্ডো দলের দুজন সদস্য অস্ত্রসহ গাছে উঠে শত্রু পর্যবেক্ষণ করছে। তারা জানাল, শত্রুরা আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে। একজন আহত মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। একপর্যায়ে গাছে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা বলল, 'আপনাদের ধরে ফেলল যে, স্যার!' আমিনুল হক তাদের বললেন, 'বেটা, ফায়ার কর।' আমাদের ওপর দিয়ে গুলি করতে হবে। তাই তারা ইতস্তত করছিল। আমিনুল হক নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র (এলএমজি ও মেশিনগান) একযোগে গর্জে উঠল। ছয়-সাতজন পাকিস্তানি সেনা ও তাদের সহযোগী তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পাকিস্তানিদের সহযোগী মকবুল আর তার সঙ্গীকে কমান্ডো মুক্তিযোদ্ধারা হাতেনাতে ধরে ফেলে। দুজন পাকিস্তানি সেনা পালিয়ে যায়।

এ সময়ই শুরু হলো শত্রুর আর্টিলারির ফায়ার। সেগুলো এসে পড়তে লাগল আশপাশে। আর্টিলারি ফায়ারের মধ্যেও আমিনুল হক আমাকে কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পরিশ্রান্ত ছিলেন। আমাকে নিয়ে নালায় পড়ে গেলেন। 'স্যার, প্লিজ, আপনি চলে যান, তাহের আমায় নিয়ে যাবে' বলে আমি উঠে তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম। তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে দৌড় দিল। পেছনে তখন ধানখেতের কর্দমাক্ত প্রান্তরে চিরনিদ্রায় শায়িত অনেক মুক্তিযোদ্ধা। প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে তাহের আমাকে কাঁধে নিয়ে দৌড়াচ্ছে, আমাকে যত শিগগির সম্ভব মেডিকেল এইড সেন্টারে নেওয়ার জন্য। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তাহের। যেতে যেতে বলেছিল, 'স্যার, চিন্তা করবেন না, মরলে দুইজন একসঙ্গেই মরব।' এর পর তাহেরের কাঁধেই আপনা-আপনি চোখ বুজে এল।

নকশীর যুদ্ধে আমি শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেও বহু মুক্তিযোদ্ধাকেই সেদিন বাংলা মায়ের মুক্তির জন্য চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে যাঁরা শহীদ বা নিখোঁজ হয়েছিলেন তাঁরা হলেন: ১. নাসির উদ্দিন (বীর

উত্তম। হাবিলদার, আর্টিলারি), ২. আবুল কালাম (ল্যান্স নায়েক), ৩. মো. ইউসুফ মিয়া (ল্যান্স নায়েক), ৪. মোহাম্মদ আলী, ৫. সিরাজুল হক, ৬. হুমায়ুন কবীর, ৭. মো. সুজা মিয়া, ৮. শামসুজ্জামান (বীর উত্তম), ৯. আবদুস সাত্তার, ১০. ফয়েজ আহমদ, ১১. কিশোর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম ও ১২. উর্দুভাষী অবাঙালি মো. হানিফ। আহত হয় ৩৫ জন।

গৌহাটি হয়ে লক্ষ্নৌ হাসপাতাল

মেডিকেল সেন্টারে কিছুক্ষণ পরই আবার আমার জ্ঞান ফিরে আসে। চোখ খুলে ঝাপসাভাবে দেখলাম, কেউ আমার হাত-পা মালিশ, কেউ ক্ষতস্থানগুলোতে ড্রেসিং করছে। কিছুক্ষণ পর আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পরে জানতে পারি, সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় তুরা হাসপাতালে। কিন্তু সেখানেও আমার অবস্থার তেমন কোনো উন্নতি না হওয়ায় হেলিকপ্টারে করে আমাকে গৌহাটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই হেলিকপ্টারে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা মেজর জেনারেল গুরবক্স সিং গিলও ছিলেন। দুই দিন পর পরিপূর্ণভাবে হুঁশ ফিরে আসে আমার। তাকিয়ে দেখি, হাত-পা সবই ব্যান্ডেজ করা। ডান পা ওপরের দিকে টাঙিয়ে রাখা। হাত দুটো দুদিকে ছড়িয়ে রাখা।

গৌহাটি হাসপাতালে আমার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মেজর (ডাক্তার) অশোক। পুরোপুরি জ্ঞান ফেরার পর তিনি আমার কাছে এলেন। আমি প্রথমেই তাঁকে বললাম, 'আমাকে জিজ্ঞেস না করে বেহুঁশ অবস্থায় আমার হাত বা পা কাটবেন না। তাহলে আমি ক্রিকেট খেলতে পারব না।' ময়মনসিংহে স্কুল ও কলেজজীবনে আমি ক্রিকেট-পাগল ছিলাম। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর যখনই সুযোগ পেতাম, ক্রিকেট খেলতাম। তখন মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও ক্রিকেটকে ভুলতে পারিনি। একটু হেসে ডাক্তার বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখব। তবে তোমার পায়ে একটু ইনফেকশন হয়েছে। হাতে কোনো ইনফেকশন হয়নি। কিন্তু হাতের নার্ভ ছিঁড়ে গেছে। তাই তোমার হাতটা এখন অকেজো হয়ে আছে। চিন্তা কোরো না, আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে।'

অপারেশন ও নিবিড় চিকিৎসায় কিছুদিন পর আমার অবস্থার উন্নতি হয়। প্রথম দিকে হাত সম্পূর্ণ অবশ ছিল। পা নাড়তে পারতাম না। হাঁটার মতো অবস্থা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাকে লক্ষ্নৌতে পাঠানো হয়। আমাকে

নিয়ে যাওয়া হয় ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায়। আমার সঙ্গে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেডিকেল কোরের একজন হাবিলদার ও একজন সেপাই। দীর্ঘ এই ভ্রমণে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি। সারা দিন কিছু খাইনি। সন্ধ্যার পর সেপাই বলল, 'স্যার, হাম কুচমে পেয়া কেয়া বাত? হাম কো ভাস খান্না নেহি গা, এইয়া পয়সা নেহি গা?' তাঁর কথায় আমি কিছুটা লজ্জা পাই। তবু মাথা নাড়িয়ে বলি, খাইনি, কারণ, আমার কাছে টাকাপয়সা নেই। তখন হাবিলদার বলল, 'স্যার, হামভি ফৌজি হ্যায়, কেয়া বাত কাররে,' আপনি বলতে কেন লজ্জা পাচ্ছিলেন? এই বলে সে নিজের খাবার নিয়ে এসে আমাকে খাওয়াল এবং নিজেও খেল। একটা স্টেশনে ট্রেন থামার পর চা-সমুচা কিনে এনে আমাকে ভালোভাবে আপ্যায়ন করাল।

লক্ষ্ণৌতে এসে হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকি। তখন একটা সমস্যায় পড়লাম। আমার কাছে তখন পরার জন্য হাসপাতালের ড্রেস ছাড়া আর কোনো কাপড়চোপড় ছিল না। শুধু লুঙ্গি, গেঞ্জি ও একটা শার্ট ছিল। টাকাপয়সাও ছিল না। আহত হওয়ার পর এক বস্ত্রেই আমাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। জেড ফোর্সও পাঠায়নি। তারা তখন বিভিন্ন রণাঙ্গনে ব্যস্ত। তারা আমার খোঁজখবর নিতে পারেনি। পরিবারের সদস্যরাও আমার খবর জানত না। আমিও জানতাম না তারা কে কোথায়! ফলে কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরও পরার কাপড় না থাকায় আমি হাসপাতালে সারাক্ষণ নিজ রুমেই থাকতাম। বাইরে, এমনকি ডাইনিংরুমেও যেতাম না। পরে বাংলাদেশি ডাক্তার মুবিনের মাধ্যমে লন্ডনে অবস্থানরত আমার আত্মীয় ফটিক ভাইয়ের কাছে একটা চিঠি লিখি কাপড়চোপড় ও টাকা পাঠানোর জন্য।

এই সময় একদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওয়াগাত হাসপাতাল ভিজিটে আসেন। তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। ভিক্টোরিয়া ক্রস মেডেল পেয়েছিলেন। জেনারেল ওয়াগাত আমার কক্ষেও আসেন। তিনি আমার কক্ষে আসার আগে আমি তাড়াতাড়ি বিছানার চাদরে শরীরটা ঢেকে ফেলি। বিছানায় শুয়েই তাঁকে সালাম জানাই। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন। জিজ্ঞেস করেন, আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি কি না। শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পর আমাকে প্রশ্ন করেন, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে কমিশন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার কি না। আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন, আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কোথায় চাকরি করেছি। কোথায় আমার পোস্টিং ছিল ইত্যাদি। আমি কোথায় কোথায় চাকরি করেছি তা তাঁকে জানাই।

জেনারেল ওয়াগাত চলে যাওয়ার একটু পর তাঁর এডিসি আমার কাছে আবার আসেন। এসে বললেন, আপনার কি পরার মতো কাপড়চোপড় নেই? ডাক্তার জানিয়েছেন, আপনি ডাইনিংরুমেও খেতে যান না, রুমেই খাবার খান। আমি তাঁকে বললাম, 'আমার ব্যাটালিয়ন তো জানে না আমি কোথায় আছি। আমার কাছে কোনো টাকাপয়সা নেই। তাই আমি জামাকাপড় কিনতে পারিনি।' এরপর এডিসি আমার মাপজোক নিয়ে দুটি প্যান্ট, আন্ডারওয়্যার ও শার্ট, একটা কমান্ডো জ্যাকেট, টুথব্রাশ, শেভিং ক্রিম, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি কিনে এনে আমাকে দিলেন। ওগুলো পরেই আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি এবং সেগুলো পরেই ১৯৭২ সালে বার্লিনে যাই।

অক্টোবরের ২২ তারিখে কসবা রণাঙ্গনে আহত হবার পর মেজর (তখন লেফটেন্যান্ট কর্নেল) খালেদ মোশাররফকে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁকে অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থায় আনা হয়। তাঁর মাথায় আর্টিলারি শেলের টুকরা লেগেছিল। মাথার খুলি উড়ে গিয়েছিল। তিনি কোমায় ছিলেন। তাঁকে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে রাখা হয়। খালেদ মোশাররফকে আনার পর জানতে পারলাম, চিকিৎসকেরা তাঁর অপারেশনের ব্যাপারে মিটিংয়ে বসেছেন। সেখানে দুজন সার্জন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল, একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং বিখ্যাত সার্জন ক্যাপ্টেন মাদানসহ আরও কয়েকজন ডাক্তার উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত আছেন ডাক্তার মুবিন ছাড়াও দুজন বাঙালি ডাক্তার—কর্নেল গাঙ্গুলি ও ব্রিগেডিয়ার বোস। তাঁরা ভয় পাচ্ছেন, খালেদ মোশাররফ হয়তো অপারেশন থিয়েটারেই মারা যাবেন। সে আশঙ্কা ৯০ ভাগ। তাই কোনো ডাক্তার এই অপারেশন করার জন্য সাহস পাচ্ছেন না। কারণ, তখন পাকিস্তান রেডিও থেকে একটি অপপ্রচার চালানো হচ্ছিল যে ভারতীয়রা ইস্ট বেঙ্গলের সিনিয়র অফিসারদের মেরে ফেলছে বা মেরে ফেলার জন্য নানা ধরনের বাহানা খুঁজে তাঁদের পঙ্গু করে ফেলছে।

কর্নেল গাঙ্গুলি এবং ব্রিগেডিয়ার বোস এসে আমাকে এই কথা বললেন। তাঁরা আমাকে আরও বললেন, 'তুমি মিটিংয়ের ভেতরে ঢুকে যাও এবং চাপ প্রয়োগ করো যে খালেদ মোশাররফের অপারেশন যেন এক্ষুনিই করা হয়। কারণ, তাঁর মাথায় এখনো শেলের ছোট টুকরা রয়ে গেছে। দ্রুত অপারেশন না করালে যেকোনো সময় ইনফেকশন হতে পারে।' এদিকে সিলেটিরাও টিকিট পাঠিয়েছে তাঁকে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করার জন্য। তাই ভারতীয়রা মনে করছে, তাঁকে লন্ডন পাঠিয়ে দেওয়াই অধিকতর শ্রেয়। কিন্তু

তাতে অনেক ক্ষতি হতে পারে। গাঙ্গুলি ও বোসের অনুরোধে আমি ডাক্তারদের মিটিংরুমে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি কিছু বলার আগেই ক্যাপ্টেন মাদান হাত তুলে বললেন, 'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমি খালেদ মোশাররফের অপারেশনটা করতে রাজি আছি।' তখন সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। সবাই বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি চেষ্টা করো। তুমি ইয়াং মানুষ। আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তুমি অপারেশনটা করো।'

অপারেশনের আগে নেক্সট অব কিন-এর একটা ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাল, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে কেউ অথবা রোগীর পরিবারের কোনো সদস্য এই ক্লিয়ারেন্সে যেন স্বাক্ষর করেন। তখন বাংলাদেশ সরকার বা পরিবারের পক্ষে কেউ সেখানে ছিলেন না। জানতে পারলাম, মুক্তিবাহিনী বা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, মিসেস খালেদ মোশাররফ (সালমা খালেদ) যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কখন এসে পৌঁছাবেন, সেটা কেউ জানেন না (তিনি অবশ্য অপারেশন চলাকালে হাসপাতালে পৌঁছান)। এদিকে খালেদ মোশাররফের অপারেশনটা জরুরি ভিত্তিতে করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় তাঁদের অনুরোধে আমি বাঁ হাতে (তখনো আমার ডান হাত অকেজো ছিল) Next of kin (নিকটতম আত্মীয়) ক্লিয়ারেন্সে স্বাক্ষর করি। অপারেশন থিয়েটারে নেওয়ার সময় কর্নেল গাঙ্গুলি খালেদ মোশাররফকে বললেন, 'ট্রাই টু ফরগেট দ্য পেইন।' উত্তরে খালেদ মোশাররফ বললেন, 'ডক্টর, ইউ আর আসকিং প্রেগন্যান্ট ডটার টু ফরগেট হার লেবার পেইন।' অর্থাৎ ডাক্তার, আপনি অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে তার প্রসববেদনার কথা ভুলে যেতে বলেছেন। ডাক্তার বললেন, যে ব্যক্তি অস্ত্রোপচারের পূর্বমুহূর্তে এরকম জোকস করতে পারে, সে নিশ্চিন্তে সুস্থ হয়ে ফিরে আসবে এবং তা-ই হলো।

টানা আট ঘণ্টা অপারেশনের পর সাড়ে চারটা-পাঁচটার দিকে তাঁকে অপারেশন থিয়েটার থেকে বের করা হয়। এরপর টানা তিন দিন চারজন নার্স ২৪ ঘণ্টা তাঁর পরিচর্যায় নিয়োজিত ছিলেন। এই নার্সরা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। তাঁদের মধ্যে রানী নামের একজন ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল দক্ষিণ ভারতে। তিনি আমাকেও অপারেশনের পর কয়েক দিন পরিচর্যা করেছিলেন। ২০০৭ সালে ১৬ ডিসেম্বর উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমি কলকাতায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। প্রথমে আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। রানী এসে আমাকে বলেন, '১৯৭১ সালে লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে আমি নার্স হিসেবে কর্মরত

ছিলাম।' তারপর বললেন, 'আমরা খালেদ মোশাররফকে নিয়ে খুব চিন্তিত ছিলাম। ডাক্তাররা অনেক কষ্ট করে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। তোমরা কী করে তাকে মেরে ফেললে!'

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে মেজর তাহেরকেও (আবু তাহের বীর উত্তম। পরে কর্নেল। ১৯৭৫ সালের ক্যু-পাল্টা ক্যুর পর সিপাহি বিদ্রোহের ঘটনায় ১৯৭৬ সালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) লক্ষ্ণৌ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আনা হয়। কামালপুর বিওপির যুদ্ধে তাঁর বাঁ পায়ে শেলের বড় স্প্লিন্টারের আঘাত লাগে। হাঁটুর ওপর থেকে তাঁর পা কেটে ফেলা হয়। পরে আর্টিফিশিয়াল পা বানানোর জন্য তাঁকে পুনাতে পাঠানো হয়। জানতে পারলাম, তাহেরের পায়ে শেল লাগার পর পায়ের রগের সঙ্গে তাঁর কমান্ডো বুটটা ঝুলে ছিল। ওই বুটটা তিনি তাঁর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। বুটটা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। একদিন খালেদ মোশাররফ এবং আমাকে তিনি সেই বুটটা দেখিয়ে বলেছিলেন, তাঁর পা'টা স্ম্যাশ হয়ে গেলেও বুটটা তাঁকে ছাড়েনি। এরপর তিনি একদৃষ্টিতে বুটটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েও ছিলেন। বলা যেতে পারে, এই পা হারানোর ফলেই মনমানসিকতার দিক থেকে তিনি একটু খেপাটে প্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকান রেঞ্জার্সের এলিট ফোর্সের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়া তিনি একজন বড় সাহসী যোদ্ধা। প্যারাজাম্প ও অন্যান্য নানা তৎপরতার ভেতর দিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর একটা পা নেই এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ক্যাপ্টেন নাসিমকেও (এ এস এম নাসিম বীর বিক্রম। পরে সেনাপ্রধান ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল। ১৯৯৬ সালে সেনাপ্রধান থাকাকালে কথিত সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনায় চাকরিচ্যুত) আহত অবস্থায় লক্ষ্ণৌতে আনা হয়। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। এতে তার হাঁটু ভেঙে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর তাঁর ওই পা কিছুটা শর্ট হয়ে যায়। পরে তাঁকে কিছুটা খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, বিশেষত খালেদ মোশাররফকে দেখার জন্য কর্নেল ওসমানী, জিয়াউর রহমান, সরকারি কর্মকর্তা নুরুল কাদের খান, সেনা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম শিশু (পরে মেজর জেনারেল) লক্ষ্ণৌতে এসেছিলেন। ডা. জাফরুল্লাহও এসেছিলেন। জিয়াউর রহমান তাঁর গলফ ক্যাপটি খালেদ মোশাররফকে উপহার দিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর খালেদ মোশাররফ সেই গলফ ক্যাপ নিয়মিত পরতেন। সেনাসদরে সিজিএস থাকাকালেও তাঁকে আমি ওই ক্যাপ পরতে দেখেছি। ক্যাপটি তাঁর মাথার টাক ঢেকে রাখত। জিয়া

ঘুরেফিরে সবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে এক দিন কাটিয়েছিলেন। আবার খালেদ মোশাররফ তাহেরের কাছে নিয়মিত যেতেন। মুক্তিযুদ্ধকালে এবং স্বাধীনতার পর কয়েক মাস জিয়া, খালেদ মোশাররফ, তাহেরসহ অন্য প্রায় সবার মধ্যে যে ধরনের হৃদ্যতা, আন্তরিকতা, ঐকান্তিকতা ছিল, ১৯৭২ সালের পর তা হঠাৎ করেই মিলিয়ে যায়।

লক্ষ্ণৌতে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে রোজার ঈদ চলে এল। তখন হাসপাতালে প্রায় ৯৭ জন মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসাধীন। বাঙালিরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করল, তারা শহরের জামে মসজিদে ঈদের জামাতে নামাজ পড়তে আগ্রহী। এ প্রস্তাবে প্রথমে তাঁরা কিছুটা ইতস্তত করলেন। লক্ষ্ণৌ ছিল মুসলমান-অধ্যুষিত শহর। এখানে পাকিস্তান আন্দোলন প্রচণ্ডভাবে হয়েছিল। বাংলাদেশের ব্যাপারে লক্ষ্ণৌর মুসলমানদের মনোভাব ছিল মিশ্র। তাই কর্তৃপক্ষ বাঙালিদের শহরে নিয়ে যেতে চাননি। শেষ পর্যন্ত আর্ম গার্ড দিয়ে তাঁরা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের লক্ষ্ণৌ শহরে ঈদের জামাতে অংশগ্রহণের জন্য জামে মসজিদে নিয়ে যান। অবশ্য স্থানীয়দের সঙ্গে মিশতে আমাদের বারণ করা হয়।

ঈদ উপলক্ষে লক্ষ্ণৌ রেডিও স্টেশন থেকেও লোক এসেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য। জামালপুরের একজন অল্পবয়স্ক (১৫-১৬ বয়স হবে) সাধারণ মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমাকে দোভাষী হিসেবে কাজ করতে হয়েছিল। ওই মুক্তিযোদ্ধাকে বলা হলো, 'তুমি তোমার যুদ্ধের কাহিনি বর্ণনা করো।' সে বলছিল, '...হালার পাঞ্জাবি যে একদিকে লুকায়া ছিল তা তো দেখি নাই। এক পাঞ্জাবিকে বাঁশঝাড়ের বাম দিকে দেখতে পাইয়া আমি তাড়াতাড়ি আমার বন্দুকটা নিয়া আগাইয়া যাইতাছিলাম। এর ভিতর হালার আরেক পাঞ্জাবি অন্য এক বাঁশঝাড়ের কোনা থাইকা আমারে গুলি করে। গুলি পিঠে লাগে, আমি ঠাস কইরা পইড়া যাই।' এই কাহিনি বর্ণনার সময় সে যখন হালার পাঞ্জাবি বলছিল, তখন রেডিওর প্রশ্নকর্তা আমাকে বলছিলেন, 'স্যার, ইসকো জারা গালি না দেনে কো বোলো, ইয়ে গালি দে রাহা হ্যায়।'

আমি বললাম, সে পাঞ্জাবি বলতে পাকিস্তানিদের বোঝাচ্ছে। রেডিওর লোক বলল, 'হামভি পাঞ্জাবি হ্যায়, ইয়ে ইসতারা গালি মাত দো।' কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, ওই মুক্তিযোদ্ধা পাঞ্জাবিকে গালি না দিয়ে কাহিনি বলতে পারছিল না। ওই মুক্তিযোদ্ধা অসাধারণ সাহসের সঙ্গে শত্রু চিহ্নিত করার পর জীবনের পরোয়া না করে বেপরোয়াভাবে পাকিস্তানিকে নিধন করার জন্য

এগিয়ে গিয়েছিল। তখন তাঁর মাথায় গুলি লেগেছিল। এই ধরনের বীরদের অসাধারণ অসংখ্য কাহিনি রয়েছে।

সাধারণ মানুষের মুখে কোনো ভাষা ছিল না। তাদের চোখে ছিল আগুন। তারা তাদের শত্রু চিহ্নিত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। কিন্তু এদের কারও কাহিনি আমরা লিপিবদ্ধ করতে পারিনি তেমনভাবে। কারণটা হচ্ছে, যাঁরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই গ্রামের মানুষ এবং নিরক্ষর। তাঁদের পক্ষে নিজেদের যুদ্ধের কাহিনি সুন্দর করে বর্ণনা করা সম্ভব হয়নি। আর সেটাকে রংচং মাখিয়ে যাঁরা বর্ণনা করেছেন, তাঁরা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে দেখেছেন। লক্ষ্ণৌতে ৯৬ জনের ওপর ছিল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা সবাই আমার কাছে তাঁদের যুদ্ধের বর্ণনা করেছিলেন বিভিন্ন সময়ে। আমার ইচ্ছে থাকার পরও কাহিনিগুলো লিপিবদ্ধ করতে পারিনি। তখন আমার ডান হাতটা অকেজো ছিল। শক্ত হয়ে থাকত। তাই লিখতে পারতাম না। তবু যেগুলো লিপিবদ্ধ করার মতো ছিল, সেগুলো লিপিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে আমার আফসোস হয়।

লক্ষ্ণৌতে আমরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা যাঁরা ছিলাম, তাঁদের সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। বিনোদনের জন্য আমাদের বিভিন্ন ছবি দেখানো হতো। আমার মনে পড়ে, দিলীপ কুমার ও শর্মিলা ঠাকুরের একটা ছবি দেখিয়েছিল তারা। বইও পড়তে দিত। দুটি বই আমাকে তারা দিয়েছিল। তার মধ্যে একটা বই ছিল ভুট্টোর।

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমরা খবর পেলাম মুক্তিযুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে। যেকোনো সময় দেশ স্বাধীন হবে। ১৬ ডিসেম্বর দুপুরে জানতে পারলাম, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বিকেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করবে। বিকেলে যখন বাংলাদেশের জনগণ স্বজন ও ভিটেমাটি হারানোর বেদনা ভুলে আনন্দে উদ্বেলিত, তখন লক্ষ্ণৌর হাসপাতালে বসে আমরা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা রেডিওর মাধ্যমে বিজয়োল্লাসের প্রতিধ্বনি শুনছিলাম। স্বাধীন মাতৃভূমিতে অনুপস্থিত থেকেও বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর আনন্দের বন্যা বয়ে যায় আমাদের সবার মধ্যে। হাসপাতালে কর্মরত সবাই আমাদের এই আনন্দ-উৎসবে অংশীদার হন। পরে আনন্দঘন ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হাসপাতালে কর্মরত সবাই মিলে একটা কবিতা রচনা করে সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করে আমাদের উপহার দেন।

এদিকে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন আমি দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল

হয়ে উঠি। ১৬ ডিসেম্বরেই আমি ডাক্তারকে বলি, নয় মাস ধরে বাড়ির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। কাউকে চিঠিপত্র লিখতেও পারিনি। আমি যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশে যেতে চাই। একদিকে বিজয়ের আনন্দ, অন্যদিকে স্বজনের দেখা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার এত বেশি ছিল যে আমি বারবার চিকিৎসকদের অনুরোধ করছিলাম। তাঁরা বললেন, 'তোমাকে প্রতিদিন থেরাপি দিতে এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ করতে হয়। এই মুহূর্তে চলে গেলে তোমার ক্ষতি হতে পারে।' আমি বললাম, 'যদি ক্ষতি হয় তাতে তোমাদের কোনো দোষ দেব না। কিন্তু আমি এই মুহূর্তে যেতে চাই।' আমার উপর্যুপরি অনুরোধে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়পত্র দেয়। ১৭ ডিসেম্বর আমি লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতায় এসে মুক্তিবাহিনীর প্রধান কর্নেল ওসমানীর সঙ্গে দেখা করি। আমাকে দ্রুত ঢাকায় পাঠানোর জন্য তাঁর কাছে সবিনয়ে অনুরোধ করি। ওসমানী আমাকে জানালেন, তিনি ঢাকায় যাওয়ার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন

১৮ ডিসেম্বর জেনারেল ওসমানী একটি হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় আসেন। আমাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন। ওই হেলিকপ্টারে মণি সিংহ ও বঙ্গবন্ধুর ছেলে শেখ কামাল। শেখ কামাল ওসমানীর এডিসি ছিল। আমরা তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করি। ওসমানী সদলবলে চলে গেলেন।

আমি বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম, কোথায় যাব। কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করে নানা অধ্যাপক নুরুল করিম সাহেবের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার সময় দেখলাম, শহরটা খাঁ খাঁ করছে। নানার বাড়িতে যাওয়ার পর সবাই আমাকে দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। বাবা-মা, ভাইবোন কে কোন অবস্থায় আছে, কিছুই জানি না। তাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি এই নয় মাসে। মায়ের কথা মনে পড়ছিল বারবার। পরদিন একটা গাড়ি সংগ্রহ করে ময়মনসিংহ রওনা হলাম। যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, সড়কের বেশির ভাগ সেতু-কালভার্ট ধসে পড়া। নৌকা দিয়ে তৈরি ফেরিতে নদী পার হলাম। ময়মনসিংহ পৌঁছাতে সাত-আট ঘণ্টা লেগে গেল। বেলা গড়িয়ে পড়ন্ত বেলায় যখন বাড়িতে পৌঁছালাম, আনন্দ আর খুশিতে বাড়ির সবাই আত্মহারা। বুকে জড়িয়ে ধরে মা কাঁদতে শুরু করে দিলেন। বোনেরাও কাঁদছে। এ কান্না দুঃখের কান্না নয়, আনন্দে আত্মহারা হয়ে খুশির কান্না।

ভারতে থাকার সময়ই শুনেছিলাম, ১৬ ডিসেম্বরের আগেই ময়মনসিংহ শত্রুমুক্ত হয়েছে। আমি বেঁচে আছি না মারা গেছি, মা-বাবা, ভাইবোনেরা কেউ তা জানত না। তবে সবার একটা ক্ষীণ আশা ছিল, আমি হয়তো বেঁচে আছি। ময়মনসিংহ মুক্ত হওয়ার পর মা মনে করেছেন, এই বুঝি ছেলে ঘরে ফিরবে। মা নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থাকতেন রাস্তার দিকে। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়েই মুক্তিযোদ্ধারা সার্কিট হাউসে যাওয়া-আসা করত।

একদিন মুক্তিবাহিনীর ক্যাপ্টেন আজিজ (পরে কর্নেল। ১৯৮৬ সালে রাজশাহীতে কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যান) আমাদের বাড়িতে যান। তাঁর সঙ্গে বাবা-মায়ের পরিচয় ছিল। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে তিনি ঢাকায় ছিলেন। ঢাকা থেকে আহত অবস্থায় ময়মনসিংহে যান। তখন আমাদের বাসায় কয়েক দিন ছিলেন। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। ময়মনসিংহ মুক্ত হওয়ার পর তিনি আমাদের বাড়িতে যান। মাকে বলেন, আমি জীবিত আছি। যুদ্ধে মারাত্মক আহত হয়ে ভারতের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। তাঁর কথা মা প্রথমে বিশ্বাস করেননি। ভেবেছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছে। তখন আজিজ মায়ের হাত ছুঁয়ে বলেছিলেন, 'আপনার ছেলে সত্যিই বেঁচে আছে।'

ময়মনসিংহ থেকে ফিরে এসে আমি বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে যাই। এখন যেটা মেট্রোপলিটন পুলিশ হেডকোয়ার্টার, সেখানে ছিল বাংলাদেশ বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী সেনানিবাসের ভেতরে অবস্থান করছিল। কিছুদিন পর ভারতীয়রা মূল সেনাসদর আমাদের কাছে হস্তান্তর করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২৩ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। ৪৬ ব্রিগেড যেটা ছিল, সেখানে নেভাল হেডকোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। সাময়িকভাবে। এভাবেই আমাদের যাত্রা শুরু। কর্নেল খুরশিদ, কর্নেল আলম ও কর্নেল শামসুল হক সাহেব সিএমএইচে কার্যক্রম শুরু করেন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পঙ্গু হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী ও সিএমএইচে স্থানান্তর করা হতে থাকে। সেটা তাঁরাই শুরু করেন।

১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব জার্মান সরকার (বর্তমানে এ নামে কোনো দেশ নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ভেঙে দুটি দেশ হয়। একটি পূর্ব জার্মানি, অপরটি পশ্চিম জার্মানি। ১৯৯০ সালে আবার তারা একীভূত হয়। বর্তমান নাম জার্মানি) মুক্তিযুদ্ধে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নত চিকিৎসাসুবিধা প্রদানের জন্য সহায়তার হাত বাড়ায়। বাংলাদেশ সরকার ২৪ জনকে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ব জার্মানিতে পাঠায়। ওই দলে আমিও ছিলাম। পূর্ব জার্মান সরকার চাটার্ড বিমান পাঠিয়ে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের বার্লিনে নিয়ে যায়। এই দলে মেজর হারুন আহমেদ চৌধুরী, ক্যাপ্টেন শরীফুল হক ডালিম (বীর উত্তম) ও শমসের মবিন চৌধুরীও ছিলেন। হারুন আমার সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু তখনো তিনি মেজর র‍্যাংক পাননি। তাঁর আগেই আমি মেজর র‍্যাংক পাই। আমাদের কারোরই কোনো পাসপোর্ট ছিল

না। মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মকর্তা তৌফিক (তৌফিক-ই-ইলাহি চৌধুরী) সিলযুক্ত মিনিস্টারিয়াল প্যাডে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম, ঠিকানা, পরিচয় দিয়ে বাংলাদেশের নাগরিক বলে প্রত্যয়ন করে দেন।

আমি দলনেতা ছিলাম। কিন্তু সবাইকে আমি চিনতাম না। বিমানে ওঠার পর পূর্ব জার্মান দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি আমাকে জানালেন, ২৪ জন যাওয়ার কথা। কিন্তু তোমরা এখানে ২৫ জনের ওপরে। হাসপাতালে ২৪ জনের জন্য সিট বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি শমসের মবিন চৌধুরীকে (তাঁকে আমরা 'সেরু' বলে ডাকতাম) বললাম, 'তুমি গুনে দেখো তো। শমসের গুনে এসে আমাকে জানাল, বিমানে আমরা মোট ২৬ জন আছি। এটা শুনে আমি বিব্রত হলাম। আমার কাছে তালিকা আছে ২৪ জনের। পূর্ব জার্মানদের কাছেও আছে ২৪ জনের। ভাবলাম, ২৬ জন হয় কী করে!

খোঁজাখুঁজির পর অতিরিক্ত দুজনকে খুঁজে পাওয়া গেল। একজনের নাম গোলাম মোস্তফা। সে যখন বিমানে ওঠে তখন তাঁকে আমি লক্ষ করেছিলাম। সে খুব কষ্ট করে বিমানে উঠেছে। তাঁর কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা ছিল। তাঁর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিজে সুপারিশ করেছেন। তাঁকে নিয়ে ২৫ জন হওয়ার কথা। কিন্তু ২৬ জন হবে কেন? পরে জানতে পারলাম, অতিরিক্ত লোকটিকে মোস্তফাই নিয়ে এসেছে। তাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে এসেছেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে ছেলেটি সে কীভাবে এখানে এল? তার তো কোনো অনুমতিপত্র নেই।' মোস্তফা বলল, 'আমাকে সাহায্য করার জন্য তাকে সঙ্গে নিয়েছি। সে আমার ভাগনে।' আমি বললাম, এটা তো ঠিক না। সরকারের কাছ থেকে একটা অনুমোদন নেওয়া উচিত ছিল। শেষ পর্যন্ত মোস্তফার ভাগনেও আমাদের সঙ্গে গেল।

পূর্ব জার্মানি পৌঁছার কয়েক দিন পর একদিন একজন জার্মান চিকিৎসক আমাকে জানালেন, একজন রোগীকে তোমার মিলিটারি ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আমি বললাম, কেন, কী হয়েছে? ডাক্তার বললেন, কোমরে আঘাতপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধার (গোলাম মোস্তফা) আঘাতটা ততটা গুরুতর নয়, যতটা তিনি বলছেন। তিনি অতি নাটকীয়তার ভান করেছেন। চিকিৎসক এ কথা বলার পর আমি মোস্তফার কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনাকে অবশ্যই আগামীকাল থেকে নিজে নিজে হাঁটতে হবে। নার্স আপনার হাত কাঁধে নিয়ে হাঁটাতে পারবে না।' তারপর দেখা গেল তিনি একাকী হাঁটতে শুরু করেছেন। মোটামুটি ভালোভাবেই হাঁটতে পারেন। কয়েক দিন পর মোস্তফা আমাকে অনুরোধ করলেন, তাঁর ওই ভাগনেকে বার্লিনের কোনো আর্ট কলেজে আমি

ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কি না। আরও নানা ধরনের তদবিরও করেছিলেন। আমি তাঁর কোনো সুপারিশই আমলে নিইনি এবং জার্মানদেরও বলিনি। পরে তাঁকে তাঁর ভাগনেসহ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়। বলা যায়, জোর করেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। যখন তাঁকে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, তখন তিনি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁকে খুঁজে বের করে। এ ঘটনা ছিল আমাদের জন্য পীড়াদায়ক। পূর্ব জার্মানিতে দুই মাসের চিকিৎসায় আমরা বেশির ভাগ যখন পুরোপুরি সুস্থ ও কর্মক্ষম হই, তখন আমাদের ফেরত পাঠানো হয়।

সেনাবাহিনীতে যোগদান ও দায়িত্ব গ্রহণ

আমি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল ফেরত আসি। জার্মানি থেকে ফেরত এসে আমি সেনা চাকরিতে যোগ দিই। আমাকে জয়দেবপুরে ১৬ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল, বাংলা নববর্ষের দুদিন আগে আমি দায়িত্বভার গ্রহণ করি। এর কয়েক দিন আগে, অর্থাৎ ৭ এপ্রিল নবগঠিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম প্রধান হিসেবে নিয়োগ পান মুক্তিযুদ্ধকালে এস ফোর্স কমান্ডার কর্নেল কে এম সফিউল্লাহ। স্বাধীনতার পর তাঁকে ঢাকায় ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর এক সপ্তাহ পর জেড ফোর্স কমান্ডার কর্নেল জিয়াউর রহমানকে উপ-সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

১৬ বেঙ্গলে থাকাকালে সেনাপ্রধানের অনুমতি নিয়ে মে-জুন মাসে আমি চারুকলা কলেজের (বর্তমানে চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব ফাইন আর্টসের অধীন) মাধ্যমে একটি ভাস্কর্য বানাতে শুরু করি। হামিদুজ্জামান তখন একটা স্কলারশিপ নিয়ে বাইরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তিনি এটি নির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন। তাঁকে সক্রিয় সহযোগিতা করে চারুকলা কলেজের একজন ছাত্র (তার নাম এখন আমার মনে নেই। পরে তিনি আর্কিটেকচার ডিপার্টমেন্টের হেড হয়েছিলেন)। ভাস্কর্যটি আর্ট কলেজের ভেতরে তৈরি করা হয়। পরে সেটা ক্রেন দিয়ে বড় ট্রাকে তুলে জয়দেবপুর নেওয়া হয়। ওই ভাস্কর্যটি জয়দেবপুর রাজবাড়ির ভেতরে স্থাপন করা হয়।

পরে সেনাপ্রধানের অনুমতি নিয়ে আরেকটি ভাস্কর্য নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় জয়দেবপুরের চৌরাস্তায়। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চে শহীদ হুরমত, মনু খলিফা, নিয়ামতসহ অন্যান্য শহীদের স্মরণে এটি নির্মাণ করা হয়। নির্মাণকাজে ছিলেন প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক এবং তাঁকে সহায়তা করে

অনারারি ক্যাপ্টেন আফতাব আলী বীর উত্তম ও মেজর মোহাম্মদ আলী। নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালের মে মাসে। শেষ হয় ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। মাটি খনন করে এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়। স্থানীয় ২০৮ জন শহীদের নাম সংগ্রহ করে শ্বেতপাথরে খোদাইয়ের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে ভাস্কর্যে প্রতিস্থাপন করা হয়। শ্বেতপাথরগুলো ছিল বর্তমান সংসদ ভবনের। সংসদ ভবনের পাশে এক জায়গায় পাথরগুলো স্তূপাকারে রাখা ছিল। সেখান থেকে সেগুলো আমরা নিয়ে আসি। সংসদ ভবনের পাথর নেওয়ায় পরবর্তী সময়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। যাহোক, এটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম ফ্রি স্ট্যান্ডিং স্ট্যাচু। এ ধরনের ভাস্কর্য বিভিন্ন রাজবাড়ির ভেতরে নির্মিত হলেও জনসমক্ষে কোথাও স্থাপন করা হয়নি। পরে সিমেন্ট-পাথর দিয়ে একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল ভাস্কর্যের অগ্রভাগে স্থাপন করা হয়। ভাস্কর্যটা বানাতে সাংঘাতিক কষ্ট করতে হয়েছে। তখন এত উঁচু ক্রেন ছিল না। বাঁশ দিয়ে মাচা বানাতে হয়েছে। মাটির ১১ ফুট নিচ থেকে ফাউন্ডেশন দিয়ে ভিত্তি তৈরি করা হয়। এর নামকরণ করা হয় 'জাগ্রত চৌরঙ্গী'।

ভাস্কর্য নির্মাণের চিন্তা আমার মাথায় আসে পূর্ব জার্মানি যাওয়ার ফলে। আমি বার্লিনে বিভিন্ন ওয়ার মিউজিয়ামে বড় বড় স্ট্যাচু দেখেছিলাম। তার পর থেকে আমার মাথায় খেলছিল মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতিসংবলিত একটি বড় ধরনের ভাস্কর্য স্থাপন করা। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ জয়দেবপুরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ হয়েছিল। এই প্রতিরোধে হুরমুজ বলে ১৪-১৫ বছরের এক বালক শহীদ হয়। জাগ্রত চৌরঙ্গী হুরমুজের নামে উৎসর্গ করা হয়। মনু খলিফাসহ আরও চারজন শহীদ হয় ওই প্রতিরোধে।

যাহোক, স্বাধীনতার কিছুদিন পর সরকার আমাকে বীর বিক্রম উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর একটি গেজেট হলেও সেটা চূড়ান্ত গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় একই বছর ১৫ ডিসেম্বর (গেজেট নম্বর বীর বিক্রম নং 8/25/D-1/72-1378, 15 December 1973)। এই বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর আমি লেফটেন্যান্ট কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পাই। ৯ অক্টোবর আমাকে চট্টগ্রামে ১৯ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ছিল ১৯ ইস্ট বেঙ্গলের। বন্দরে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথমবারের মতো আমি বুঝতে পারলাম, বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে কী সাংঘাতিক রকমের অনিয়ম ও দুর্নীতি হয়। অনেকে এই অনিয়ম বা নিয়মবহির্ভূত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। মুক্তিযুদ্ধের

সময় যে জাহাজগুলো ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বন্দর সচল করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আসা প্রকৌশলীরা সেগুলো উদ্ধার করছিল। আমরা তাদের সহযোগিতা দিতাম। পাশাপাশি অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল বন্দরের ট্রাফিক কন্ট্রোল ব্যবস্থা দেখা ও চোরাচালান বন্ধ করা। এসব কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল, বন্দরে ছোট ছোট ট্যাংকার ভর্তি হয়ে তেল আসার পর তেলের ট্যাংকারের নিচ দিয়ে পাইপ লাগিয়ে রাস্তা খনন করে ওপারে সবার অগোচরে পাচার করা হচ্ছে। ৩ ও ৫ নম্বর জেটিতে সিমেন্টের পাটাতনের নিচ দিয়ে কেটে আরেকটি স্লাব বানিয়ে সে পাটাতনের নিচে নৌকা নিয়ে এসে পাটাতনের ভেতর থেকে সিমেন্টগুলো পাচার করা হচ্ছে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হবে না। অভিনব সব কৌশল। দেখা যায়, বাইরে দিয়ে তালা দেওয়া আছে. কিন্তু ভেতরের সিমেন্ট অনেক সময়ই চুরি হয়ে গেছে।

এই সময়, অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে সরকার তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়। আমি আনোয়ারায় দায়িত্ব পালন করি। অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে আনোয়ারায় বেশির ভাগ বাড়িতে বহিরাগতদের পাওয়া গেল। তারা বিভিন্ন বাড়িতে জিনিসপত্র রাখত। জাহাজে নিষিদ্ধ মালামাল এনে বহির্নোঙর থেকে নৌকায় করে এনে লোকজন সমুদ্র বা কর্ণফুলী নদীসংলগ্ন গ্রামে লুকিয়ে রাখত। আমরা ওই সব গ্রাম যখন রেইড করলাম, তখন একটা জায়গায় পলিথিন ব্যাগের ভেতরে ভারী কোনো জিনিস ভরে নদীর তলদেশে ফেলে দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ একটা সুতলি বা মোটা সুতা ভাসতে আরম্ভ করলে আমরা সন্দেহ করি, কীভাবে সুতাটা এখানে এল। তারপর দেখি, সুতাটা একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা। সুতাটা টেনে আনার পর দেখি যে পুরো কনট্রা আইটেমের বিরাট এক কনসাইনমেন্ট পানির ভেতর থেকে বের হয়ে এল। ওই সময় আমরা নিষিদ্ধঘোষিত মালামালসহ ৪৩টি সাম্পান আটক করেছিলাম। সাম্পানের মালামাল যখন আমরা কাস্টমসের মাধ্যমে আনতে শুরু করি, তখন ৪৩টি সাম্পানের মধ্যে শেষ পর্যন্ত তিনটা না চারটা সাম্পানের মালামাল কনট্রা আইটেম হিসেবে এন্ট্রি পায়। বাকিগুলো বিভিন্ন হোমরাচোমরা ব্যক্তির সুপারিশে ছাড়া পেয়ে যায়। এগুলো যাঁরা করছিলেন, তাঁদের সবাই কিন্তু বর্ধিষ্ণু পরিবারের। অনেকেই ছিল বিভিন্ন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত লোকের নিকটাত্মীয়।

সেনাবাহিনীকে অস্ত্র উদ্ধারের দায়িত্ব দেওয়ার পর তখন বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা এলাকায় অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে মেজর শরীফুল হক ডালিমকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে

তাঁর ছাত্রজীবনের কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনের লোকদের মারধর করে। এর কিছুদিন পর ঢাকায় রেডক্রস-প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের সঙ্গে তার গন্ডগোল হয়। এই ঘটনার জেরে সে কিছু সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়িতে হামলা করে। এর জন্য তার চাকরি চলে যায়। এই ঘটনার সঙ্গে মেজর নূরও (বীর বিক্রম এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী) জড়িত ছিল। ফলে তারও চাকরি চলে যায়। মেজর নূর উপ-সেনাপ্রধান জিয়ার পিএস ছিল।

অন্যদিকে যশোর সেনানিবাসে ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল এম এ মঞ্জুর (মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর বীর উত্তম। পরে মেজর জেনারেল। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম জিওসি হিসেবে কর্মরত অবস্থায় নিহত হন)। যশোর ব্রিগেডের দায়িত্ব ছিল বৃহত্তর যশোর, খুলনা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন ও অস্ত্র উদ্ধার। সেনাবাহিনী খুলনা ও বরিশালে আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা-কর্মীকে অবৈধ অস্ত্রসহ আটক করে। এঁদের মধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালী ছিলেন এবং সরকারের উচ্চপর্যায়ে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। ফলে মঞ্জুরের সঙ্গে সরকারের ভুল-বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। এরপর তাঁকে ব্রিগেড কমান্ডার পদ থেকে সরিয়ে ভারতে বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম বন্দরে দায়িত্ব পালন করার সময় একদিন বন্দরের এক কেরানি রাত একটার দিকে আমার কাছে এসে বলল, 'আমি রিলিফের একটা কম্বল নেওয়ার কারণে আপনার জওয়ান আমাকে মেরেছে।' সে আরও বলল, 'আমার গায়ে যে চাদরটা দেখছেন, এটা ছাড়া আমার আর কোনো গরম কাপড় নেই। আমার ভাই আমার সঙ্গে থাকে, পড়াশোনা করে। আমি ভাবলাম, আমার ভাইটার জন্য রিলিফের একটা কম্বল দরকার। কিন্তু সেটা যদি আমি লাইনে দাঁড়িয়ে নিতে যাই, তাহলে আমার গায়ে যে চাদরটা আছে, সেটাও ছিঁড়ে যাবে। সুতরাং আমি একটা কম্বল এখান থেকেই নিলাম। আর তাই আপনার লোক আমাকে মেরেছে। আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আমি আমার নোটবুক থেকে আপনাকে দেখাতে পারব যে বাওয়ানিদের নামে যে মার্কারি আসছে, সেই মার্কারির দাম ৮০ হাজার টাকা (প্রতি কেজি না লিটার, তা আমার মনে নেই)। সেই দামি মার্কারি সব নিলামে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে একজন লোক নিয়ে গেছে। কাগজে সেই লোকের স্বাক্ষর ও তার নাম লেখা আছে। আপনি বলবেন, আমিও বলব তাকে আপনি

পানিশমেন্ট দিতে পারবেন না। তাহলে আমাকেই শুধু পানিশমেন্ট দেওয়া কেন?' আমার খুব ভালো লাগল যে লোকটার সাহস আছে।

আরেকটি ঘটনা, চট্টগ্রাম বন্দর সচল করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সার্বিক সহযোগিতা করে। এ কাজে নিয়োজিত সোভিয়েত নাগরিকেরা বন্দরের ভেতরই থাকত। কিছুদিন পর দেখা গেল, সেখানে তারা পতাকা ওড়াতে শুরু করেছে। কয়েক দিন পর তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে ডিউটি দিতে শুরু করল। আমি তাদের কমান্ডার জোরকোভকে বললাম, এ ধরনের কাজকর্ম, বিশেষ করে অস্ত্র হাতে নিয়ে দায়িত্ব পালন করা তো ঠিক নয়। তিনি আমাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। আমার কাছে খবর ছিল, কিছু সোভিয়েত নাগরিক চোরাচালানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত। তখন আমি আমার অধীন সেনাদের বললাম, রাতের বেলায় ওরা যেসব মূল্যবান জিনিসপত্র সমুদ্র থেকে ওঠায়, সেগুলো থেকে অনেক কিছু গোপনে তারা বাজারে বিক্রি করে। এ কাজে যারা নিয়োজিত তাদের অস্ত্রসহ ধরে ফেলবে। পরদিন রাত দুইটার ভেতরে সেনারা তাদের দুজনকে মূল্যবান জিনিসপত্র, অস্ত্রসহ ধরে ফেলে। তারপর জোরকোভ আসে আমার সঙ্গে কথা বলতে। আমি তাকে বলি, 'তোমরা দুটি অন্যায় করেছ। প্রথমত অস্ত্র বহন করছ, দ্বিতীয়ত স্মাগলিং করছ। অস্ত্র বহন করা থেকে তোমাদের অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। তোমরা তোমাদের নির্ধারিত এলাকাতেই থাকবে। বাইরে যেতে পারবে না। তোমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা নিশ্চিত করব।' এর কিছুদিন পর তারা অবশ্য ওখান থেকে পাহাড়তলী চলে যায়। তবে চট্টগ্রাম বন্দর সচল করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার ও নাগরিকদের বিরাট অবদান ছিল। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। চট্টগ্রাম বন্দরে যতগুলো জাহাজ ও পন্টুন ডোবানো হয়েছিল, সব তারা উদ্ধার করে। ছয় মাসের মধ্যেই তারা বন্দরের পূর্ণ কার্যক্ষমতা ফিরিয়ে আনে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালন

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে আমার ব্যাটালিয়নকে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় (তখন বর্তমান রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে জেলা) পাঠানো হয়। এর আগে কখনো সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে যায়নি। এমনকি পাকিস্তান শাসনামলেও সরকার কখনো পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে সেনাবাহিনী পাঠায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। যেমন—ওম, মারমা ও চাকমা। প্রতিটি সার্কেলে ছিলেন একজন করে রাজা। এই তিন রাজা তাঁদের সীমানা নিজেরাই নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের রীতিনীতি অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকা শাসন করতেন। সেনাবাহিনী তো বটেই, সরকারের সিভিল প্রশাসনও রাজার কাজে হস্তক্ষেপ করত না। এই প্রথম সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। ব্যাপারটা স্থানীয় লোকজন ভালোভাবে নেয়নি। এতে তারা মনে করে, তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্ট্যাটাস ক্ষুণ্ন হয়েছে। তাদের এই মনোভাব আমি কিছুটা আঁচ করি। তাই প্রথমেই একদম ভেতরে না গিয়ে রামগড়, কাপ্তাইসহ নির্ধারিত কিছু স্থানে সেনাদের রেখে কার্যক্রম চালিয়ে যাই।

আমাকে পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা সার্ভে করতে বলা হয়। এটা আমরা করতে থাকি। সার্ভে করার সময় আমাদের একটি দল প্যাট্রোলিংয়ে থাকত। একদিন সেনারা বিজয় সিং নামের একজনকে আটক করে। তার কাছে একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল পাওয়া যায়।

আমাদের কাছে ভারতীয় একটা হেলিকপ্টার ছিল। এটি দিয়ে সার্ভে করা হতো। তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিজস্ব কোনো হেলিকপ্টার ছিল না। ভারতীয় সেনাবাহিনী দুটি হেলিকপ্টার আমাদের ধার হিসেবে দিয়েছিল। তার একটি আমরা ব্যবহার করতাম। এই হেলিকপ্টার রাজু, রাজনসহ চারজন ভারতীয় পাইলট চালাতেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। তাঁদের

ব্যবহার বেশ ভালো ছিল। পরিশ্রমীও ছিলেন। তাঁরা খুব কষ্ট করে আমাকে এবং সার্ভে কাজে নিয়োজিত সেনাদের নিয়ে দুর্গম এলাকায় গেছেন। এই হেলিকপ্টার দুটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছুদিন পরপর কলকাতায় যেত। ১৯৭৫ সালের ১৪ আগস্ট ওই হেলিকপ্টার রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য কলকাতা যাচ্ছিল। তখন ফেনীতে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে চারজনই একসঙ্গে মারা যান।

এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে সেনাসদস্যদের স্থায়ীভাবে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এতে রাজারা সম্মত না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনটি ফ্রি স্টেশন ক্যান্টনমেন্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে অসম্মতি জানালেন না। সরকার সিদ্ধান্ত নেয়, খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় একটি সেনানিবাস স্থাপনের। আমি সেনানিবাস সাইটিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম। তখন ওই হেলিকপ্টারে দীঘিনালাতে আমি প্রথমবারের মতো যাই। জায়গাটি আমার কাছে খুব ভালো লাগে। বিশাল এক এলাকায় মাত্র চার হাজার লোকের বসতি। জানতে পারলাম, মানবেন্দ্র লারমার শ্বশুরবাড়ি ওখানে। ওই পরিবারের পক্ষ থেকে ওখানে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারা নিজেরাই স্কুলটি পরিচালনা করে। পরিবারের কয়েকজন সদস্য স্কুলের শিক্ষক। মানবেন্দ্র লারমার ভাই স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।

আমি একদিন মানবেন্দ্র লারমার শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁরা আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন। আমি তাঁদের বলে এসেছিলাম, সেনারা স্কুলের মাঠে তাঁবু করে আছে। প্রয়োজন মনে করলে বা সাহায্য চাইলে ট্রুপস আপনাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাবে। তা না হলে ট্রুপস ওখানেই থাকবে। কিন্তু তাঁরা আমার কথাটা কিছুটা বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। যদিও তাঁরা আমাদের গ্রহণ করেছিলেন ভালোভাবেই। স্কুলশিক্ষকেরা বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা কমিউনিটির দাবিদাওয়া আদায় করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দিতেন। একদিকে তাঁরা স্কুলে শিক্ষকতা করেন এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় নেতা বা কর্মী ছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই দীঘিনালা স্কুলের অপর পাশে একটা সুন্দর মালভূমি বা টিলার ওপর ছোট আকারে সেনানিবাস নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আমার ওপর দায়িত্ব ছিল নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধানের। মূলত সেনাসদস্যরাই এই কাজে জড়িত ছিলেন। স্থানীয় কয়েকজনকে টাকার বিনিময়ে শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছিল। নির্মাণসামগ্রীগুলো হেলিকপ্টারে করে সেখানে নিতে হয়। কারণ, সড়ক বা নৌপথে সেখানে যাওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা তখন ছিল না।

কিছুদিন পর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে খাগড়াছড়ি থেকে মাটিডাঙ্গা হয়ে দীঘিনালায় পিচ ঢালাই করে একটা রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

১৯৭৪ সালে দীঘিনালায় সেনানিবাস নির্মাণের কাজ চলাবস্থায় নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে আমাকে সেনাসদরে বদলি করা হয়। আমার পোস্টিং হয় এমও অধিদপ্তরের (ডাইরেক্টরেট) জি-১ হিসেবে। তখনো এমও অধিদপ্তর তেমনভাবে সংগঠিত হয়নি। পেশাদার সেনাবাহিনীর স্ট্র্যাটেজি ও অপারেশনের দায়িত্বে যে বিভাগ থাকে, তাকে বলা হয় এমও ডাইরেক্টরেট। তখন এমও অধিদপ্তরে ডিএমও ছিলেন মেজর মালেক (আবদুল মালেক। পরে কর্নেল ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র)। তিনি আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন। অন্যদের সঙ্গে পাকিস্তান থেকে এসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। কিন্তু তখনো তিনি র‍্যাংক পাননি। আমি এমও অধিদপ্তরে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর র‍্যাংক পান। র‍্যাংক পাওয়ার পর তিনি আমার সিনিয়র হয়ে যান। পরে তাঁর বদলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল নূরউদ্দীন খান (পরে মেজর জেনারেল ও সেনাপ্রধান। ১৯৯৬-২০০১ সালে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী) এমও অধিদপ্তরের ডিএমও নিযুক্ত হন। তিনিও পাকিস্তান-প্রত্যাগত ছিলেন। এমও অধিদপ্তরে থাকাবস্থায় ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আমি এসটিসি পড়ার জন্য যশোর সেনানিবাসে যাই। এপ্রিল মাসে যশোরে এসটিসি কোর্স সম্পন্ন করি। এরপর আমাকে যশোরেই একটি অ্যাসল্ট (Assault) স্কুলের একটি কোর্স পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ জন্য ওখানেই থাকতে হয় আরও এক মাস।

১৯৭৫ সালের মে মাসে আমি ঢাকায় আসি। এ সময় আমার বিয়ে ঠিক হয়। আমার স্ত্রীর বাবা ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুজ্জোহা। বিয়ের পর আমি দুই মাসের ছুটি নিয়ে কক্সবাজার ও বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যাই। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পর এই প্রথম আমি ছুটি নিলাম। ১৯৬৯ সালের পর থেকে আমার ছুটি নেওয়া হয়নি। ১৯৬৭-৬৮ সালে আমি দুই মাস ছুটি নিয়েছিলাম।

জুলাই মাসে আমার ছুটি শেষ হয়। আবার চাকরিতে যোগ দিই। এ মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বড় ছেলে শেখ কামালের বিয়ে হয়। এই বিয়েতে অনেক সেনা কর্মকর্তা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমিও আমন্ত্রিত ছিলাম এবং বিয়েতে যোগদান করি। শেখ জামালের বিয়েতেও আমরা আমন্ত্রিত ছিলাম। বিয়ের অনুষ্ঠান হয় গণভবনে। সেখানে আমি অনেককেই দেখেছি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পায়ে ধরে সালাম করতে। ১৫ আগস্টের পর তাঁদের অনেককেই দেখলাম তাঁর বিরুদ্ধে নানা ধরনের কটূক্তি করতে।

১৪ আগস্ট রাতে আমি কর্তব্যরত অবস্থায় সেনা হাসপাতালে ছিলাম। আগে বলেছি, এদিন একটি ভারতীয় হেলিকপ্টার নোয়াখালীতে বিধ্বস্ত হয়। হেলিকপ্টারের চারজন পাইলটই মারা যান। এ চার পাইলট পার্বত্য চট্টগ্রামে আমাদের সহায়তা করেন। পাইলটদের লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বিকেল পাঁচটার দিকে সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আমাকে টেলিফোন করে বললেন, নিহত পাইলটদের লাশ পাওয়া গেছে। সন্ধ্যার পর মরদেহগুলো তেজগাঁও বিমানবন্দরে আনা হবে। বিমানবন্দর থেকে তা সংগ্রহ করে সিএমএইচে নিয়ে যাওয়া হবে। রাতে সিএমএইচে যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মর্গে রাখতে হবে। ১৫ আগস্ট সকাল আটটার মধ্যে মরদেহগুলো কফিনে ভরে ফুলতলি নিয়ে যেতে হবে ভারতীয়দের কাছে হস্তান্তর করার জন্য। তিনি একটি গাড়ি পাঠালেন আমার কাছে। আমি সন্ধ্যার পর রাতের খাবার খেয়ে প্রস্তুত থাকি। খবর পেয়ে রাত সাড়ে নয়টা বা দশটার দিকে আমি তেজগাঁও বিমানবন্দরে যাই। তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। লাশগুলো সিএমএইচে নিয়ে গিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মর্গে রাখা হয়। লাশগুলোর অনেক জায়গায় সেলাই করা হয়। সিএমএইচের মর্গে সেগুলো রেখে রাত একটা বা দেড়টার দিকে আমি বাসায় ফিরে আসি।

১৯৭৫ সালের বিয়োগান্ত ঘটনা ও অন্যান্য

১৫ আগস্ট। তখনো ভোর হয়নি, অন্ধকার রয়ে গেছে। ঢাকা সেনানিবাসে আমাদের এলাকার অনেকগুলো বাড়ি লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদের (বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী দলের সদস্য) অনুগত সেনারা ঘেরাও করে ফেলে। রশিদ সম্ভবত আমার বাসাতেই আগে আসে। আমাকে ঘুম থেকে তুলে বলল, সে এবং ফারুক ব্যাটালিয়ন ট্রুপসকে ক্যু করার জন্য হুকুম দিয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই মুহূর্তে ট্রুপসের সঙ্গে তোমার কোনো যোগাযোগ আছে কি?' সে বলল, 'কোনো যোগাযোগ নেই।' আমি তাকে বললাম, 'এর পরিণতি কী হবে বুঝতে পারছ?' রশিদ আমাকে উল্টো বলল, 'আমি যে হুকুমটা দিয়েছি, সেটা এই মুহূর্তে ফিরিয়ে আনতে পারব না। কিন্তু আমাকে যদি সেনাবাহিনী গুলি করতে চায়, তাহলে এই স্টেন দিলাম। যে কেউ আমাকে গুলি করতে পারবে।'

সে নানা ইমোশনাল কথা বলছিল। ওই সব কথাবার্তা বাদ দিয়ে আমি তাকে বললাম, 'গো অ্যান্ড টক টু চিফ অব আর্মি স্টাফ অ্যান্ড দেন সেটেল দ্য ইস্যু। তোমার সারেন্ডার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।' আরও বললাম, 'তোমার এই অ্যাকশন সেনাবাহিনীকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।'

আমি বুঝলাম, সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে চায়। চিন্তা করলাম, আমি রশিদের অনুগত সেনাদের হাতে ঘেরাও হয়ে আছি। তার অনুগত সেনাদের কাছে মেশিনগানসহ অন্যান্য অস্ত্র রয়েছে। এ অবস্থায় কৌশলী হতে হবে। রশিদ আমাকে তাঁর সঙ্গে মেজর হাফিজের বাসায় যেতে বলল। আমি বেসামরিক পোশাক পরে তার সঙ্গে প্রথমে হাফিজের বাসায় গেলাম। মেজর হাফিজ এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে রশিদ কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায় গেল। তাঁর বাসাও রশিদের অনুগত সেনারা ঘেরাও করে রেখেছিল। রশিদ আগে কর্নেল শাফায়াত জামিলের বাসায় যায়। মেজর হাফিজ আর আমি পরে

ঢুকি। যখন ভেতরে ঢুকছি, তখন দেখলাম, রশিদ বলছে, উই হ্যাভ ক্যাপচারড স্টেট পাওয়ার আন্ডার খন্দকার মোশতাক। শেখ ইজ কিলড, ডু নট ট্রাই টু টেক অ্যানি অ্যাকশনস অ্যাগেইনস্ট আস। তখন শাফায়াত জামিল কিছুটা হকচকিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তাঁর এ অবস্থা কেটে যায়। এরপর তিনি খুব রাগান্বিত স্বরে রশিদকে বললেন, 'হু ইজ হি টু টেক দিজ টাইপ অব রাবিশ অ্যাকশন অ্যান্ড স্টুপিড অ্যাক্টিভিটি।' তিনি খুব জোরে জোরে ধমক ও শাসানি দিয়ে বললেন, 'আই উইল কোর্ট মার্শাল টু ইউ।' এরপর রশিদ তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। এই সময় সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ শাফায়াত জামিলের বাসায় ফোন করেন। তাঁদের দুজনের কথোপকথন আমার সামনে হয়নি। কারণ, টেলিফোন ছিল বেডরুমে। পরে জেনেছি, সেনাপ্রধান তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে কারা আক্রমণ করেছে, তা তিনি জানেন কি না। জবাবে শাফায়াত জামিল বলেন, তিনি জানেন না। তবে রশিদ তাঁকে এ কথা বলেছে। এরপর সফিউল্লাহ শাফায়াত জামিলকে বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁকে (সফিউল্লাহ) টেলিফোনে জানিয়েছেন যে আক্রমণকারীরা সম্ভবত শেখ কামালকে মেরে ফেলেছে। সফিউল্লাহর সঙ্গে কথা বলে শাফায়াত জামিল তাঁর অধীন তিন কমান্ডিং অফিসারকে ফোন করে ব্যাটালিয়নকে তৈরি হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি ড্রয়িংরুমে আসেন। তখন আমি শাফায়াত জামিলকে বললাম, 'স্যার, এই মুহূর্তে আপনার উচিত হবে প্রথমে ট্রুপসের কাছে যাওয়া। রশিদ বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে। তার অনুগত সেনাদের হাতে লোডেড আর্মস রয়েছে। বেশি রাগারাগি করতে গিয়ে সে যদি এখনই গোলাগুলি শুরু করে দেয়? আমরা তো সবাই নিরস্ত্র এখানে। তাই এই মুহূর্তে রাগারাগি করাটা ঠিক হবে না। বরং আমাদের কায়দা করে আগে ট্রুপসের কাছে যেতে হবে। কিন্তু রশিদ সে কাজ করার সুযোগ আমাদের দেবে না। সে আমাদের চোখে চোখে রাখছে।'

এরপর আমরা ওখান থেকে বের হয়ে হেঁটে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের বাড়িতে যাই। আমাদের পেছনে পেছনে রশিদও আসে। খুব কাছেই ছিল জিয়ার বাড়ি। তিনি তখন উপ-সেনাপ্রধান। যখন আমরা তাঁর বাসার দিকে যাচ্ছিলাম, তখন পথে রেডিওতে শুনতে পেলাম বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। পথে কোথাও একটি রেডিও অন করা ছিল। শুনে আমার খারাপ লাগল।

আমরা তিনজন একসঙ্গে জিয়ার বাড়িতে গেলাম। আমাদের দেখে গার্ড

গেট খুলে দিল। আমরা ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম। শাফায়াত জামিল কোনায় গিয়ে দাঁড়ালেন। জিয়া স্লিপিং পোশাকে প্রায় দৌড়ে এলেন। তিনি তখন শেভ করছিলেন। এক গালে শেভ করছেন, অন্য গালে সাবান। এসেই বললেন, 'শাফায়াত, হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন্ড?' শাফায়াত জামিল বললেন, 'অ্যাপেরেন্টলি টু ব্যাটালিয়ন হ্যাজ স্টেজ আ ক্যু।' জিয়া বললেন, 'শাফায়াত, উই আর নট ডেকোর, গেট ব্যাক দ্য ট্যাংকস', অর্থাৎ আমরা তো বসে থাকার জন্য এখানে আসি নাই, ট্যাংকগুলো এখনই ফেরত নিয়ে আসো।' এ কথা বলার পরপরই শাফায়াত বললেন, 'এইমাত্র রেডিওতে ঘোষণা করা হচ্ছে, দে হ্যাভ কিলড দ্য প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান', অর্থাৎ 'তারা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছে।' 'সো হোয়াট, লেট ভাইস প্রেসিডেন্ট টেক ওভার', অর্থাৎ 'তাতে কী হয়েছে, উপরাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা গ্রহণ করতে দিন।' এই কথাগুলো যখন হচ্ছিল, তখন কিন্তু রশিদ আরেকটা দরজার সামনে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমরা জিয়ার বাড়ি থেকে বের হলাম। তখন আবার রেডিওর ঘোষণা শুনতে পেলাম। রশিদ আমাদের ছেড়ে চলে গেল। শাফায়াত জামিল তাঁর ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে গেলেন। আমি বাসায় এসে তাড়াতাড়ি ইউনিফর্ম পরে সেনাসদরে গেলাম। সেখান থেকে গেলাম চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টারে। সেখানে তখন মিনি কনফারেন্স হচ্ছিল। খালেদ মোশাররফ সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। দুটি বিষয় আলোচিত হলো। এক. এই মুহূর্তে যদি তাদের নিরস্ত্র করা যায়, তাহলে ব্যাপারটা বেশিদূর গড়াবে না। আর যদি এই মুহূর্তে নিরস্ত্র করতে না পারা যায়, তাহলে যেসব সেনা বিদ্রোহ করেছে, তাদের বাদ দিয়ে বাকি সবাইকে সেনানিবাসের ভেতরে আনতে হবে। চেইন অব কমান্ড ঠিকমতো জারি করে সুযোগ বুঝে একটা কাউন্টার অ্যাকটিভিটিজ চালিয়ে তাদের নিরস্ত্র করতে হবে। এ ধরনের কথাবার্তা যখন চলছিল, তখন আরআরকে সজ্জিত জিপে করে একটা স্টেনগান হাতে মেজর শরীফুল হক ডালিম সেনাসদরে ঢোকে। ডালিম চাকরিচ্যুত হয়েও সেদিন ইউনিফর্ম পরিহিত ছিল। ডালিম যখন সেনাসদরে ঢোকে, তখন সেনাসদরে যত সেনা কর্মকর্তা ছিল, তাদের সবাই সরে যায়। ডালিম সরাসরি চিফ অব স্টাফের অফিসে ঢুকে যায়। সেখানে দুই-তিনজন অফিসারসহ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আর আমি ছিলাম। খালেদ মোশাররফ আমাকে সঙ্গে নিয়ে সেনাপ্রধানের রুমের ভেতরে ঢোকে। বাকি সেনা কর্মকর্তারা বাইরে থাকলেন। খালেদ মোশাররফ আমাকে সেনাপ্রধান ও ডালিমের মাঝখানে

দাঁড়াতে বললেন। ডালিম অত্যন্ত রাগান্বিত স্বরে কথাবার্তা বলছিল এবং স্টেনগান নাড়াচ্ছিল। এতে যেকোনো মুহূর্তে স্টেনগানের গুলি বেরিয়ে যেতে পারত। সেনাপ্রধানকে বলল, খন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য সে সেনাপ্রধানকে চাপ দিতে থাকে (হয়তো মোশতাকই ডালিমকে সেনাপ্রধানের কাছে পাঠিয়েছিল তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য)। এরপর সেনাপ্রধান কে এম সফিউল্লাহ ৪৬ ব্রিগেডে রওনা দেন। তাঁর পেছনে ডালিমও রওনা হয়। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে আমিও সেখানে গেলাম। একটু পর সেখান থেকে সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ডালিমের সঙ্গে রেডিও স্টেশনের দিকে যান। তখন রেডিও স্টেশন ছিল শাহবাগে (হোটেল রূপসী বাংলা ও বারডেম হাসপাতালের মাঝের ভবন)।

সেনাপ্রধান রেডিও স্টেশনের দিকে রওনা দেওয়ার পর চতুর্থ বেঙ্গলের সবাই আবার আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আলোচনার বিষয়বস্তু, এরকম একটা অভ্যুত্থান কী করে সম্ভব হলো, এখন আমাদের করণীয় কী ইত্যাদি। সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ ঘণ্টা খানেক পর ফিরে এলেন। এই সময় সেনা কর্মকর্তারা রক্ষীবাহিনী নিয়ে বেশ উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলছিলেন। সেনারাও রক্ষীবাহিনী নিয়ে নানা ধরনের জল্পনাকল্পনা করছিল। কেউ কেউ বলছিল, রক্ষীবাহিনী বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিশোধ নিতে পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে, যুদ্ধ করতে পারে ইত্যাদি। একপর্যায়ে দুই-তিনজন বললেন, বিমানবাহিনী দিয়ে রক্ষীবাহিনীর ওপর আঘাত বা আক্রমণ করা হোক। আমি এর বিরোধিতা করি। আমি বললাম, এই কাজটা করা কোনোক্রমেই যুক্তিসংগত হবে না। তরুণ যুবক নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী। একটা বড় ধরনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপার নিয়ে সেনাবাহিনী হাবুডুবু খাচ্ছে। এরপর যদি এই ধরনের কাজ করা হয়, তবে তা খুবই মারাত্মক হবে। আরেকটা ঘটনা না ঘটিয়ে আমরা যদি রক্ষীবাহিনীকে আশ্বস্ত করে বলি যে যা হয়েছে তা সেনাবাহিনীর কাজ নয়। যারা ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা অবসরপ্রাপ্ত লোক। সেনাবাহিনীতে কর্মরত অল্প কিছু সদস্য এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেনাবাহিনী কোনোক্রমেই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। আর বঙ্গবন্ধু যেহেতু মারা গেছেন, রক্ষীবাহিনী আর কার জন্য যুদ্ধ করতে যাবে? বরং সেনাবাহিনীতে তাদের আত্তীকরণ করলে ভালো হবে। বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে তাদের ভেতরে যে অস্থিরতা চলছে, সেটা কমে যাবে।

সেনাপ্রধান সফিউল্লাহ এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ইতিমধ্যে ১৬ বেঙ্গলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা সাভারে গিয়ে যেন রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করে।

সেনাপ্রধান আমাকে নির্দেশ দিলেন দ্রুত ১৬ বেঙ্গলের সঙ্গে মিলিত হতে এবং যেভাবে আলোচনা হলো, সেভাবে কাজ করতে। শাফায়াত জামিলও তাঁর কথায় সায় দিলেন। আমি একটা সামরিক গাড়ি নিয়ে দ্রুত রওনা হলাম ১৬ বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। তাদের অবস্থান ছিল জয়দেবপুরে। এদিকে আমি রওনা হওয়ার পর ১৬ বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন রউফকে শাফায়াত জামিল অফিশিয়ালি জানান যে আমাকে ১৬ বেঙ্গলের অধিনায়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি একটি লিখিত নিয়োগপত্রও পাঠান। সেটা আমি জানতাম না। জয়দেবপুরে ১৬ বেঙ্গলের হেডকোয়ার্টারে গিয়ে জানতে পারলাম, রক্ষীবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে সেনারা মির্জাপুর রওনা দিয়েছে। তখন সাভার যেতে হলে ঢাকা অথবা মির্জাপুর হয়ে যেতে হতো। আমি দ্রুত মির্জাপুর রওনা হলাম। মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের কাছে গিয়ে তাদের পেলাম। মেজর শাহজাহান ছিলেন ১৬ বেঙ্গলের সহ-অধিনায়ক। আমি তাঁকে সেনাসদরের সিদ্ধান্ত জানাই এবং অনুরোধ করি সেনাদের জয়দেবপুরে ফেরত পাঠাতে। তাঁকে আরও জানাই, আমি রক্ষীবাহিনীর সাভার হেডকোয়ার্টারে যাব। তিনি আমার সঙ্গে যেতে পারেন। শুধু মর্টার প্লাটুন আমার সঙ্গে থাকতে পারে। বাদবাকি সবাই লাইনে ফেরত চলে যাবে।

শাহজাহান আমাকে বললেন, 'আপনার একা যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমি আপনার সঙ্গে যাব।' তিনিই আমাকে রক্ষীবাহিনীর সাভার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গেলেন। রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারের গেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরারত রক্ষীরা (সেনা) আমাদের 'হল্ট' বলে থামায়। আমি গাড়ি থেকে নেমে বলি যে আমরা সেনাসদর থেকে সেনাপ্রধানের বার্তা নিয়ে এসেছি। এ কথা শোনার পর তারা আমাদের সম্মানের সঙ্গে ভেতরে ঢুকতে দেয়।

সাভারে রক্ষীবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে লেফটেন্যান্ট দেলোয়ার বলে একজন ক্যাম্পের অ্যাডজুট্যান্ট ছিল। সে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল। আমি তাকে বলি, 'এখানে তোমরা কত অফিসার ও সৈন্য আছ?' সে বলল, প্রায় আড়াই হাজার রক্ষী এবং দেড় শর মতো প্রশিক্ষণরত অফিসার রয়েছে। আমি তাকে বললাম, সবাইকে ফল ইন করাও। তার নির্দেশে সবাই মাঠে ফল ইন হতে থাকল।

এর আগে কয়েকজন আমাকে বলেছিল, আকাশে জঙ্গি বিমান ঘোরাফেরা করছে। কয়েকবার রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তর লক্ষ্য করে ডাইভ দিয়েছে। এ জন্য তারা আতঙ্কিত যে বিমান আক্রমণ হতে পারে। অবশ্য আমিই

ওয়্যারলেসের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলাম যে সাভারে যেন একটি জঙ্গি বিমান পাঠানো হয়। স্ট্রাইক করার কোনো প্রয়োজন নেই, শুধু দুইটা ডাইভ দিয়ে তোমরা চলে যাবে। জঙ্গি বিমানের পাইলট ছিল স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত আলী খান বীর উত্তম। সে সেভাবেই কাজ করেছিল। আমি তাদের আশ্বস্ত করলাম, ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বিমান আর আসবে না।

ফল ইনে থাকা অফিসার ও রক্ষীদের আমি বললাম, 'যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও নির্মম। সেনাবাহিনীর দুটি ব্যাটালিয়ন এর সঙ্গে জড়িত। সেনাবাহিনীর বাদবাকি আর কেউ এর সঙ্গে জড়িত নয়। এর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং আমরা ও রক্ষীবাহিনী সবাই ভাই ভাই। আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করব, যাতে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।' আমি আরও বললাম, 'তোমাদের পোশাকটা জনগণ পছন্দ করছে না। তাই এই পোশাকটা এখন না পরে প্যান্ট ও বেনিয়ান পরে থাকো।' তারা আমার নির্দেশ পালনের অঙ্গীকার করল। আমি আরও বললাম, 'তোমাদের অফিসার নির্দেশ দিয়েছে, এই মুহূর্তে তোমরা যারা যারা অস্ত্র হাতে নিয়েছ, প্রত্যেকে অস্ত্রগুলো জমা দিয়ে এই অফিসারের অধীনে কাজ করবে।'

পরে তারা আমাকে চা-বিস্কুট খাওয়াল। নিজেরাও খেল। যখন তাদের কয়েকজনের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিলাম, তখন দেলোয়ার এসে আমাকে বলল যে তাদের সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর আছেন প্রশিক্ষক হিসেবে। তাঁর নাম রেড্ডি। তাঁকে নিরাপদ স্থানে রাখা হয়েছে। আমি এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দেলোয়ারকে বললাম তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে। দেলোয়ার আমাকে রেড্ডির কাছে নিয়ে গেল। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি ইচ্ছা করলে রক্ষীর গার্ড নিতে পারেন।' পরে মেজর রেড্ডির পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এরপর আমি আবার ঢাকায় ফিরে যাই।

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আমি সেনাসদরেই ছিলাম। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সেনাবাহিনীর ভেতরে, বিশেষত ঢাকা সেনানিবাসে গুঞ্জন শুরু হয় যে ছয়জন মেজরকে অপসারণ করা হবে। ২৭ অক্টোবরের পর সে গুঞ্জন আরও প্রবল হয়। এর কয়েক দিনের মধ্যেই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। মোশতাক সরকারকে হটাতে সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার চতুর্থ বেঙ্গল ও ২২ বেঙ্গলের মাধ্যমে ৩ নভেম্বর এই সেনা-অভ্যুত্থান সংঘটন করে। এ সময় মোশতাক কৌশলী ভূমিকা গ্রহণ করেন। খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিলের সঙ্গে আলোচনার নাম করে মোশতাক কালক্ষেপণ করতে

থাকেন। এর মধ্যে ওই রাতেই জেলখানায় বন্দী অবস্থায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে হত্যা করা হয়। এটা আমরা তখন জানতাম না। ৫ তারিখে জানতে পারি। ইতিমধ্যে খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল এবং তাঁদের সঙ্গে অন্য যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যস্থতায় ছয়জন মেজরকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অভ্যুত্থানের দিন জিয়াকে গৃহবন্দী করা হয়। তাঁকে হাউস অ্যারেস্ট করাতে কিছুসংখ্যক সেনা ও অফিসারের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এটা ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হতে থাকে।

অন্যদিকে কর্নেল তাহের তাঁর গণবাহিনীকে সংগঠিত করেন। বলা যায়, ১৪ আগস্টের পর থেকেই কর্নেল তাহের তাঁর গণবাহিনীকে সুসংগঠিত করে পাল্টা অভ্যুত্থান করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। জিয়াকে বন্দী করায় সাধারণ সেনাদের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা তিনি কাজে লাগান। ইতিমধ্যে মোশতাককে সরিয়ে প্রধান বিচারপতি এম এ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান ও মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে (ডিসিএমএল) নিয়োগ দেওয়া হয়। ৬ নভেম্বর রাতে কর্নেল তাহেরের গণবাহিনী স্লোগান দিয়ে সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং ওই রাতে ১২ জন সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা (খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম) ও হায়দার (লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তম) নিহত হন। রাতে গোলাগুলির সময় কর্নেল ওসমানের (আবু ওসমান চৌধুরী, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের প্রতিরোধযুদ্ধ চলাকালে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে ৮ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক [আগস্ট পর্যন্ত]) স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। সিএমএইচের একজন নারী চিকিৎসকও গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ সময় সেনাসদর ও সেনানিবাসে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সেনা কর্মকর্তারা নিজেদের বাসায় যত দূর সম্ভব নিজেরাই গার্ড ডিউটি দিতে থাকেন। কেউ কেউ রাতে বাইরে থাকতে শুরু করেন।

জিয়ার সঙ্গে আরও কয়েকজন গৃহবন্দী ছিলেন। ৭ নভেম্বর সকালবেলা জিয়াকে মুক্ত করা হয়। তখন অন্যরাও মুক্তি পান। জিয়াকে মুক্ত করে টু ফিল্ড আর্টিলারির হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। ৭ নভেম্বর টু ফিল্ড আর্টিলারি অধিনায়কের অফিসে আমরা রীতিমতো অফিস ও রাতযাপন করি। ৯ নভেম্বরের মধ্যেই

জিয়া সেনাসদরসহ সেনানিবাসের সবকিছু নিজের আয়ত্তে নিতে সক্ষম হন। ১১-১২ নভেম্বরের দিকে কর্নেল তাহেরের অনুগতরা জিয়াকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর আগে ৭ নভেম্বর সকালেও কর্নেল তাহের সেনানিবাস থেকে জিয়াকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে গিয়ে বক্তব্য দেওয়ানোর জন্য খুব চাপাচাপি করেছিলেন। কিন্তু লে. কর্নেল এ জে এম আমিনুল হক বীর উত্তম জিয়াকে সেনানিবাসের বাইরে যেতে বাধা দেন। তিনি কর্নেল তাহেরকে ভারতের বি টিম হিসেবে আখ্যায়িত করে জিয়াকে বলেন, তিনি যেন কোনো অবস্থাতেই টু ফিল্ড আর্টিলারির হেডকোয়ার্টারের বাইরে না যান। কারণ, চারদিকে গোলাগুলি হচ্ছে।

শাফায়াত জামিল ১৫ আগস্ট ভোর থেকেই বঙ্গবন্ধু হত্যাসহ সেনা আইন ভঙ্গের অপরাধে ছয় মেজরকে অভিযুক্ত করে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অন্যদিকে, সেনাবাহিনীর আর্টিলারি ও ট্যাংক রেজিমেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ ও মেজর ফারুকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অবিচল ছিল। ঢাকা সেনানিবাসে তখন তিনটি পদাতিক ব্যাটালিয়নে সেনাসংখ্যা দুই হাজারের মতো। তাঁদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাঁরা কর্নেল শাফায়াত জামিলের কমান্ডের প্রতি অনুগত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও আদর্শবান সৈনিক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অসাধারণ অবদান ছিল। সম্মুখসমরে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রতি অধীন সেনাদের অবিচল আস্থা ছিল।

কিন্তু সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় শাফায়াত জামিল ও পরবর্তীকালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফ পাকিস্তান-ফেরত অফিসার ও সেনাদের গণনার মধ্যে আনেননি। তখন পর্যন্ত অনেকের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, এঁরা সবাই কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে অপারগ। তাঁরা বাতাস যেদিকে বইবে, সেদিকে ধাবমান হবে। নিজের থেকে তাঁরা কিছু করার ক্ষমতা রাখেন না। ১৫ আগস্টের আগে রশিদ ও ফারুক সম্পর্কেও একই ধরনের ধারণা পোষণ করা হতো। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান-ফেরত ২৮ হাজার সদস্যকে সশস্ত্র বাহিনীতে আত্তীকরণ করা হয়। এতে একই বাহিনীতে সমান্তরাল দুই মনমানসিকতা লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দীর কাউকে চাকরিতে রাখেনি। আমরা মহানুভবতা দেখাতে গিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছি।

ডিভাইড অ্যান্ড রুল পদ্ধতি গ্রহণ না করে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে পুরো বাহিনী সাজানো অথবা শুধু পাকিস্তান-ফেরত সেনা দিয়ে সশস্ত্র বাহিনী গড়া

উচিত ছিল। তা না করে মুক্তিযোদ্ধা সেনাদের দুই বছরের সিনিয়রিটি দেওয়া হয়। তাতে গোড়াতেই এক সশস্ত্র বাহিনীতে দুই বাহিনী সৃষ্টি করা হয়। পাকিস্তান-ফেরত অনেক সেনা কর্মকর্তা ও সেনা পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে অনড় ছিলেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগ দিতে না পেরে তাঁরাও হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধারা বয়সে ছিলেন নবীন। মুক্তিযুদ্ধকালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের পাকিস্তান-ফেরত কর্মকর্তাদের মোটেও সহ্য করার কথা নয়। মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তারা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যা অর্জন করেছেন, পাকিস্তান-ফেরত সেনাদের সেই অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে, অনেক মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা শুরু থেকেই তাঁদের অবজ্ঞার চোখে দেখতে শুরু করেন। ফলে, মনে মনে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান-ফেরতরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৯৭৪ সাল থেকেই তাঁরা সেনাসদর থেকে শুরু করে গোয়েন্দা সংস্থাসহ ডিভিশনাল কমান্ড পদগুলো সুকৌশলে দখল করতে থাকেন।

১৫ আগস্ট এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও পাঁচ মেজরের কর্মকাণ্ডে সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যখন হতভম্ব ও বিহ্বল, তখন পাকিস্তান-ফেরতরা নিজেদের গুছিয়ে ধীরে ধীরে ষড়যন্ত্রের জাল আরও বিস্তৃত করে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে থাকেন। সামরিক আইন ও দৃষ্টিকোণ থেকে এবং আইনের সূক্ষ্ম বিচারেও এ ধরনের কার্যকলাপ ছিল অপরাধজনক। কিন্তু ক্ষমতার লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এটা কোনো দোষের ব্যাপার ছিল না।

১৫ আগস্টের পর সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন স্তরে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সেই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যেও ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকে। সেটা ছিল 'ব্যাটল অব উইট' বা বুদ্ধির লড়াই। সেই লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের অধিকাংশই ক্রমান্বয়ে চাকরি হারান। যাঁরা টিকে যান, তাঁরাও নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা বলতে ভয় পেতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত মুক্তিযুদ্ধের সেই অভূতপূর্ব গান শুনতে পর্যন্ত ভয় পেতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরি হারানো বা অকারণে অপঘাতে নিহত হওয়ার ঘটনা শুরু হয় ৩ নভেম্বর থেকে এবং ৬ ও ৭ নভেম্বরে তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। পরবর্তীকালে এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো জিয়া ও মঞ্জুরকে হত্যা করে দেড় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে (১৩ জনের ফাঁসিসহ) চাকরিচ্যুত করা হয়। সেই থেকে প্রায় এক যুগ মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীতে করুণার পাত্র হয়ে ছিলেন। এই প্রক্রিয়ার শুরুটা

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকেই।

৩ নভেম্বর শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খালেদ মোশাররফের তত্ত্বাবধানে অবৈধ মোশতাক সরকারকে উৎখাত করার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মেজর ইকবাল (পরে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী। প্রয়াত) বঙ্গভবন থেকে তাঁর প্রথম ইস্ট বেঙ্গল নিয়ে সরে পড়েন। পরে লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবদুল গাফফার হালদার বীর উত্তমের নেতৃত্বে বঙ্গভবন ঘেরাও করে মোশতাককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। তখন মন্ত্রিপরিষদের সভা চলছিল। ইকবাল মোশতাককে হেস্তনেস্ত করেন। কথিত আছে, আবদুল গাফফার হালদার খন্দকার মোশতাককে ধাক্কা মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দেন এবং শাফায়াত জামিল স্টেনগান নিয়ে মোশতাকের দিকে তেড়ে যান। এই সময় মোশতাক ও শাফায়াতের মাঝখানে ওসমানী দাঁড়িয়ে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এনে বঙ্গভবনকে রক্তাক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেন।

যাহোক, সেদিন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) বানানো হয়। ৫ নভেম্বর খালেদ মোশাররফকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেলের পদ থেকে মেজর জেনারেলের পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান করা হয়। ইতিমধ্যে গৃহবন্দী সেনাপ্রধান (৩ নভেম্বর থেকেই তিনি গৃহবন্দী) জিয়াউর রহমান ব্রিগেডিয়ার আবদুর রউফ ও কর্নেল এম এ মালেকের মাধ্যমে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ধুরন্ধর মোশতাক পদত্যাগ করলেও রশিদ-ফারুকসহ তাঁদের অন্য সাথিদের নিরাপত্তা বিধানের নিমিত্তে সংলাপ চালিয়ে যান। এটা চলে ৩ থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত। এই সময় দেশে কোনো সরকার ছিল না। কেউই কিছু জানতে পারছিল না। সেনাসদরসহ সবাই যখন অন্ধকারে নানা ধরনের গুজবের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখনই ৫ নভেম্বর জেলহত্যার কথা সেনাসদর জানতে পারে। এর আগেই (৪ নভেম্বর) খুনিরা দেশ ছেড়ে যায়। খন্দকার মোশতাকের ইশারায় কর্নেল রশিদের নির্দেশে সুবেদার মোসলেমের নেতৃত্বে জেলখানায় চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের একটি এই জেলহত্যা। ঘাতকেরা খন্দকার মোশতাকের জিঘাংসা চরিতার্থ করার জন্যই এমন নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, না এর পেছনে আরও কোনো ষড়যন্ত্র ছিল, তা আজও রহস্যাবৃত। অভিযোগ আছে, আওয়ামী লীগ তথা দেশকে নেতৃত্বশূন্য করার জন্যই এই জঘন্য হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। তবে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে খন্দকার মোশতাক প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ঠান্ডা মাথায় এই হত্যাযজ্ঞের নির্দেশ

দেন। এই হত্যাযজ্ঞের সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল যখন রাষ্ট্রপতি ও নতুন সেনাপ্রধান নিয়োগ নিয়ে ব্যস্ত, সেনানিবাসে তখন পাল্টা অভিযানের প্রস্তুতি চলছিল। ঢাকা সেনানিবাসে দুই হাজার মুক্তিযোদ্ধা পদাতিক সেনার বিপরীতে তখন আর্টিলারি ও ক্যাভলরি সৈনিকসহ অন্যান্য আর্মস ও সার্ভিসের সেনাসংখ্যা ছিল সাত-আট হাজার, যাদের ৯৫ শতাংশই ছিল পাকিস্তান-ফেরত। তদুপরি সিওডি, অস্ত্র তৈরির কারখানা, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি জায়গায় অনেক সিভিলিয়ান কাজ করছিল। আর্মি ক্লার্ক কোরের অনেক সেনা, যাঁরা সৈনিকদের চেয়ে শিক্ষিত (অন্তত ম্যাট্রিক পাস), তাঁদের অনেকেই তখন রাজনৈতিক দর্শনচর্চায় ব্যাপৃত হয়ে সেনাদের একত্র করার প্রয়াসে লিপ্ত হন। কর্নেল আবু তাহের তাঁর গণবাহিনীর (জাসদ-সমর্থিত) বার্তা সেনাসদস্যদের মধ্যে ছড়াতে থাকেন। তিনি রীতিমতো ক্লাস নেওয়া শুরু করেছিলেন সেই ১৯৭৪ সাল থেকে। কর্নেল তাহের পাকিস্তান-ফেরত সেনা কমান্ডো, নৌ-কমান্ডো, ফ্রগম্যানসহ সিওডি, অস্ত্র তৈরির কারখানা এবং তাঁর বড় ভাই ইউসুফ, যিনি পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে ছিলেন, তাঁর মাধ্যমে বিমানবাহিনীসহ তিন বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে প্রয়াসী হন।

৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ ও তাঁর অনুগামীরা বঙ্গভবন ঘেরাও করেন। কিন্তু এর আগে অক্টোবর মাসে তাঁকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে খুনিদের শায়েস্তা করা কোনো ব্যাপারই নয়। কিন্তু তাঁকে বাদ দিয়ে করতে গেলে সেনাবাহিনীতে বিভাজন দেখা দেবে। ফলাফল নৈরাশ্যজনক হবে। তদুপরি চেইন অব কমান্ড স্থাপন করতে গিয়ে সেনাপ্রধানকে বাদ দিয়ে অপারেশন শুরু করলে তা চেইন অব কমান্ড ভঙ্গেরই শামিল হবে। তাতে অপারেশন শুরু করার আগেই অপারেশন ভেস্তে যাবে। তিনি হেসে বলেছিলেন, চিফ ওঁদের (এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও পাঁচ মেজর) বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে এ-ও বলা হলো যে সিরাজ শিকদার ও জাসদের গ্রুপ বহুদিন থেকে সেনাবাহিনীর ভেতরে তৎপর, তারাও অরাজকতার সুযোগ নিতে পারে। বিশেষ করে, কর্নেল তাহের তাঁর সেনা ব্যাকগ্রাউন্ডকে কাজে লাগিয়ে একটা অঘটন ঘটাতে পারেন।

জবাবে আত্মপ্রত্যয়ী খালেদ মোশাররফ বলেন, তাহের একজন আরবান গেরিলা, ব্যাপক আকারে (জাতীয় পর্যায়ে) কিছু করার ক্ষমতা তাঁর নেই। মিসেস খালেদ মোশাররফও জেনারেল খালেদকে সতর্ক করে দিয়ে

বলেছিলেন, তিনি যেন জিয়ার বিরুদ্ধে কিছু করতে না যান। শাফায়াত জামিলও ব্যক্তিগতভাবে জিয়াকে পছন্দ করতেন। ফলে, জিয়াকে গৃহবন্দী করেই তাঁরা তাঁদের অপারেশন শুরু করেন।

অনেকেই মনে করেন, খালেদ-শাফায়াত গোড়ায় গলদ করে বসেছিলেন। সেনাদের মধ্যে জিয়ার ইমেজ ঈর্ষণীয় পর্যায়ে ছিল। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে জিয়ার ভারী গলায় ঘোষণা সেনাসহ সর্বস্তরের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, ফলে তাঁর একটা আলাদা ইমেজ ছিল। কর্নেল আবু তাহের এই সুযোগ আগ বাড়িয়ে গ্রহণ করেন। তাহেরের সঙ্গে জিয়ার যোগাযোগ সব সময়ই ছিল। তাহের রুশ বিপ্লবের তারিখকে স্মরণ করে তাঁর বিপ্লবের তারিখ আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন ৬ নভেম্বর (ঘড়ির কাঁটা অনুসারে ৭ নভেম্বর) রাত ১২টা। এর মধ্যে নভেম্বরের অভ্যুত্থান তাঁকে সুবর্ণ সুযোগ করে দেয়। তাহের আগে থেকেই ওসমানী, জিয়া ও খালেদের মধ্যে জিয়াকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর বিপ্লবের নায়ক হিসেবে। জিয়াকে গৃহবন্দী থেকে উদ্ধার করতে হবে—এই দাবি সামনে নিয়ে এসে সেনানিবাসে সেনা ও সিভিল কর্মচারী-কর্মকর্তাদের একত্র করেন তিনি। সঙ্গে রাখেন সৈনিকদের ১২ দফা দাবি। রাত ১২টায় প্রথম গোলাগুলি শুরু হয়।

এ সময় শাফায়াত জামিল বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে জানতে চাইলেন, সত্যিই কোনো ফায়ারিং শুরু হয়েছে কি না। তারপর তিনি বঙ্গভবন ত্যাগ করেন। খালেদ মোশাররফ, কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা বীর বিক্রম ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ টি এম হায়দার বীর উত্তম বঙ্গভবন থেকে বের হন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। খন্দকার নাজমুল হুদা রংপুরে কর্মরত ছিলেন। হায়দার চট্টগ্রামে। তাঁরা দুজন ৩ নভেম্বরের পর ঢাকায় আসেন। খন্দকার নাজমুল হুদা সেনাসদরে বৈঠকে যোগ দিতে রংপুর থেকে ঢাকায় আসেন। খালেদ মোশাররফের অনুরোধে তিনি বঙ্গভবনে ছিলেন। হায়দার ছুটি নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছিলেন বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে। এ ঘটনা আমি জানতাম না। পরে জেনেছি। সম্ভবত ৫ নভেম্বর তিনি ঢাকায় আসেন। পরদিন ৬ নভেম্বর হায়দারের সঙ্গে আমার দেখা হয়। ওই দিন তিনি আমার বাসায় ফোন করেন। তখন আমি ছিলাম না। আমার স্ত্রীকে হায়দার জানান, রাতে তিনি আমাদের বাসায় আসবেন এবং খাবেন। তিনি আমার স্ত্রীকে বলেন, আমি স্যারের মতো সাহেব না, মুরগি খাই না। আমার জন্য ছোট মাছ রান্না করবেন। সেদিন সন্ধ্যার পর তিনি আমাদের বাসায় আসেন। আমাদের বাসা থেকে হায়দার নতুন সেনাপ্রধান খালেদ মোশাররফের বাসায়

ফোন করেন। ঘটনাচক্রে তখন খালেদ মোশাররফ বাসায় ছিলেন। তাঁরা দুজন কিছুক্ষণ কথা বলেন।

মুক্তিযুদ্ধকালে খালেদ মোশাররফ ও হায়দার একসঙ্গে যুদ্ধ করেন। এ ছাড়া খালেদ মোশাররফকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন হায়দার। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কথা বলার পর হায়দার তাঁর বাসায় যান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। যাওয়ার আগে হায়দার আমাদের বলে যান, তিনি খালেদ মোশাররফের সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন। ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে খাবেন। আমরা যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করি। হায়দারের আর সেই খাওয়া হয়নি।

পরে খালেদ মোশাররফের সঙ্গে বঙ্গভবনে যান হায়দার। রাতে সেনানিবাসে গোলাগুলি শুরু হলে খালেদ মোশাররফ, খন্দকার নাজমুল হুদা ও হায়দার বঙ্গভবন থেকে বের হওয়ার পর শেরেবাংলা নগরে অবস্থানরত ১০ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টারে এসে হঠকারিতার শিকার হন। ৭ নভেম্বর সকালে তাঁরা তিনজন নির্মমভাবে নিহত হন। মুক্তিযুদ্ধের কে ফোর্স কমান্ডার কিংবদন্তি এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের এই করুণ পরিণতি সবাইকে ব্যথিত করেছিল।

এদিকে গৃহবন্দী অবস্থা থেকে বের হয়ে জিয়া শক্ত হাতে হাল ধরার চেষ্টা করতে থাকেন। কর্নেল তাহের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড কাঠামোর একেবারে কোমরে আঘাত করেছিলেন। সেই সময় লে. কর্নেল আমিনুল হক বীর উত্তম তাঁর ব্যাটালিয়ন নিয়ে অতন্দ্র প্রহরীর মতো জিয়ার পাশে না দাঁড়ালে জিয়া হয়তো তাঁর ভাগ্য তাহেরের হাতেই সমর্পণ করতেন।

৭ নভেম্বরের ঘটনার কয়েক দিন পর ১২ নভেম্বর আমাকে রংপুরে বদলি করা হয়। সেখানে তখন সেনাবিদ্রোহ চলছিল। বদলির নির্দেশ পেয়ে আমি সেখানে যাই। সেনাসদস্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সেনা কর্মকর্তারা রীতিমতো ইউনিট লাইনে রাত যাপন করতে থাকি। এই সময় জিয়া নিজেও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সেনানিবাসে যেতে থাকেন। রংপুরেও তিনি আসেন। এসে ধমকের সুরে বলেন, সবাই যেন নিজ নিজ অস্ত্র অস্ত্রাগারে জমা দিয়ে দেয়। তার পর থেকে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করে।

এর মধ্যে সেনাবাহিনীর কাঠামো ও চরিত্র নিয়ে জিয়ার সঙ্গে তাহেরের বিরোধ চরমে ওঠে। ১২ নভেম্বরের পরই জিয়া কর্নেল তাহেরের কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করেন। ২৪ নভেম্বর জিয়া তাহেরকে বন্দী করেন। কিছুদিনের

মধ্যেই সামরিক আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। দ্রুততার সঙ্গে, ১৯৭৬ সালের ২১ জুলাই তাহেরের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

এদিকে জিয়ার প্রচেষ্টায় সামরিক বাহিনীতে কিছুটা শৃঙ্খলাও ফিরে আসে। কিন্তু এই শৃঙ্খলা বেশি দিন থাকেনি। আবার একের পর এক নানা ঘটনা ঘটতে থাকে।

১৯৭৬ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী রশিদ-ফারুক বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসে। ফারুক সরাসরি বগুড়ায় চলে যায় এবং সেখানে সেনাবিদ্রোহ ঘটায়। তখন আমাকে ২৪ ইস্ট বেঙ্গলকে সঙ্গে দিয়ে বগুড়ায় পাঠানো হয় সেনাবিদ্রোহ দমনের জন্য। এটা করার জন্য কিছুটা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল। সেই কৌশল হলো, ফারুককে আটক বা বগুড়া থেকে নিয়ে গেলেই বিদ্রোহী সেনারা মনোবল হারিয়ে ফেলবে। তখন অনায়াসেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে। পাইলট ইয়াসমিন ছিল ফারুকের বোন। ইয়াসমিনের বেশ প্রভাব ছিল ফারুকের ওপর। জিয়ার নির্দেশে সেনা কর্তৃপক্ষ ইয়াসমিনকে ফ্লাইং ক্লাবের প্লেনে বগুড়ায় পাঠায়। তিনি বগুড়ায় গিয়ে তাঁর ভাইকে জোর করে প্লেনে উঠিয়ে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এরপর বিদ্রোহী সেনারা মনোবল হারিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে বেশির ভাগ সেনা আত্মসমর্পণ করে। সেনাবাহিনীর ওই ইউনিট কেন বিদ্রোহ করে, তার কারণ জানার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আমার ওপর তদন্তের দায়িত্ব পড়ে। এই সময় আমি কয়েক দিন বগুড়া সেনানিবাসে অবস্থান করি। সেনাবিদ্রোহ করার অপরাধে আনুমানিক ৪২ জনকে গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ফারুক ও রশিদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। জিয়াউর রহমানের নির্দেশে রশিদ ও ফারুককে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৭৭ সালে আমাকে বার্মায় (বর্তমান নাম মিয়ানমার) বাংলাদেশ দূতাবাসে ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমি দূতাবাসে যোগ দেওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই রোহিঙ্গা সমস্যার সৃষ্টি হয়। তখন দুই দেশের সম্পর্কের বেশ অবনতি হয়। রোহিঙ্গা ইস্যুকে কেন্দ্র করে দুই দেশের মধ্যে টানাপোড়েন চলতে থাকে। এই টানাপোড়েন চলাবস্থায় একদিন ২৪ ঘণ্টার নোটিশে বার্মা সরকার আমাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। আমি বাংলাদেশে ফিরে আসি। বার্মায় ডিফেন্স অ্যাটাশে নিয়োগ পাওয়ার আগে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইনফ্যান্ট্রি স্কুলে চিফ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলাম। ফিরে এসে আবার সেখানেই যোগ দিই। ১৯৭৮ সালের ৪ এপ্রিল কর্নেল হিসেবে আমার পদোন্নতি হয়। ১০ এপ্রিল ৭২ ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার হিসেবে

আমাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার ছিল সৈয়দপুরে। এখান থেকে আমি আর্মি স্টাফ কলেজে কোর্স করতে আসি। আমার কোর্স শুরু হয় ৭ আগস্ট। শেষ হয় ১৯৭৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। কোর্স শেষে ১৯ ফেব্রুয়ারি আমাকে সিলেটে নতুন সেনানিবাস তৈরির দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। ইনফ্যান্ট্রি স্কুল যশোর থেকে সিলেটে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সালের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত আমি সিলেট সেনানিবাসে ছিলাম।

সিলেট সেনানিবাস তৈরির সময় দুটি ভাস্কর্য নির্মাণ করার উদ্যোগ নিই। ভাস্কর্য দুটি হলো 'অনুশীলন' এবং 'হামলা'। প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক নির্মাণ করেন 'অনুশীলন' এবং প্রফেসর হামিদুজ্জামান খান নির্মাণ করেন 'হামলা', যা পরবর্তী সময়ে নামকরণ করা হয় 'ঝাটকা'। তা ছাড়া অফিসার্স মেসে নির্মিত টেরাকোটা সম্পন্ন করেন চিটাগাং ইউনিভার্সিটির অলক রায়।

সিলেট সেনানিবাসের গেট ডিজাইন করা হয়েছে বেয়নেটের আদলে এবং Parabolic twin bulding-এর ডিজাইন করেছে শহীদুল্লাহ অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস এবং সুপারভিশনে ছিলেন প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং স্থপতি রবিউল হুসাইন।

১৯৮০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বড় ধরনের একটা যুদ্ধের মহড়ার (এক্সারসাইজ) আয়োজন করে। যুদ্ধের এই মহড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হয়েছিল। এই সময় আমাকে আম্পায়ার হিসেবে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হয়। সেখানে যুদ্ধ-মহড়ার যে পরিকল্পনা আমরা করেছিলাম, সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বিশাল মহড়া হয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীরা ১৯৮০ সালের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর জিয়াউর রহমানই এঁদের বিদেশে বিভিন্ন দূতাবাসে চাকরি দিয়েছিলেন। তবে রশিদ-ফারুক সেই চাকরি নেয়নি। অন্যরা নিয়েছিল। জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টার পর এবার তারা সবাই চাকরিচ্যুত হয় এবং বিদেশে ফেরারি জীবন যাপন করতে থাকে। ১৯৮১ সালের পর এরশাদ আবার তাদের পুনর্বাসন করেন এবং বকেয়া বেতন দেন। তাদের এই সুযোগ-সুবিধা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল।

এর কিছুদিন পর ইবিআরসিতে অফিসারদের একটি রি-ইউনিয়ন হয়। এই রি-ইউনিয়নে আমি যোগ দিই। জেনারেল এম এ জি ওসমানী, লেফটেন্যান্ট জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দীন, জিয়াউর রহমানসহ সবাই এতে উপস্থিত ছিলেন। এই রি-ইউনিয়নে আমরা কিছুটা সমস্যায় পড়ি। আমরা

ইবিআরসির সাবেক অফিসাররা চিন্তা করেছিলাম, যেহেতু এটা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসারদের রি-ইউনিয়ন, তাই খাজা ওয়াসিউদ্দীন এবং জেনারেল ওসমানীকে প্রধান আসনে বসানো হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট জিয়াও সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি নিজেও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ছিলেন। এই অবস্থায় ওসমানীকে কেমন করে প্রধান আসনে বসানো হবে, তা নিয়ে সবাই চিন্তিত ছিলেন। পরে দেখা গেল, জিয়া নিজেই ওসমানীকে প্রধান আসনে বসানোর পর তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়াকে মাঝখানে রেখে একদিকে ওসমানী, আরেক দিকে খাজা ওয়াসিউদ্দীনকে বসিয়ে তিনি নিজে অন্য পাশে চলে গেলেন। এতে সবাই হাঁপ ছাড়েন। এত সহজে বিষয়টির সমাধান হবে, কেউ ভাবেননি। সবার কাছে বিষয়টি খুব ভালো লেগেছিল। জেনারেল ওসমানীও খুশি হয়েছিলেন। পরে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'Master Zia behaved well'।

জিয়া ও মঞ্জুর হত্যা এবং এরশাদের ক্ষমতা দখল

১৯৮১ সালের ২৯ মে কুমিল্লার জিওসি মেজর জেনারেল আবদুস সামাদ সপরিবারে সিলেটে বেড়াতে আসেন। এর মাত্র কয়েক দিন আগে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনিও সেই সময় মাজার জিয়ারত ও রাজনৈতিক সভা করতে সিলেটে অবস্থান করছিলেন। সিলেটে এসে শেখ হাসিনা সার্কিট হাউসে ওঠেন। এ জন্য আমরা সার্কিট হাউসের পরিবর্তে টি-গার্ডেনের একটি বাংলোতে জিওসি মেজর জেনারেল সামাদের থাকার ব্যবস্থা করলাম। ৩০ তারিখ সকালে জিওসিসহ আমরা শাহজালালের (র.) মাজারে যাই। এখানেই ওয়্যারলেসের মাধ্যমে আমরা খবর পেলাম, প্রেসিডেন্ট জিয়া চট্টগ্রামে নিহত হয়েছেন। এটা শোনার পর জিওসি সামাদ খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা খোঁজ করে জানতে চেষ্টা করলাম জিয়া সত্যি নিহত হয়েছেন, না অ্যারেস্ট অবস্থায় আছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা সঠিক খবর জানতে পারলাম। প্রেসিডেন্ট জিয়া সত্যি মারা গেছেন। আরও জানতে পারলাম, মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর বীর উত্তম এর সঙ্গে জড়িত। পরদিনই মেজর জেনারেল সামাদ সিলেট থেকে কুমিল্লায় চলে গেলেন।

জিয়া অত্যন্ত সাহসী সেনানায়ক এবং কঠোর নিয়মতান্ত্রিক ও শৃঙ্খলাবদ্ধ লোক ছিলেন। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধে পাকিস্তানের খেমকারানে সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পাকিস্তানের খেমকারান ভারত দখল করেছিল। তিনি খেমকারান পুনরুদ্ধার করেছিলেন। ১৯৭১ সালে চট্টগ্রামে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধযুদ্ধে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছিলেন। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। সেই ঘোষণা প্রথমবার নিজের নামে দিলেও দ্বিতীয়বার তিনি বঙ্গবন্ধুর নামে দিয়েছিলেন।

এর ফলে তাঁর যে ভাবমূর্তি দেশে এবং বিদেশে গড়ে ওঠে, সেটা আজও অম্লান। দেশ ও জাতির চরম বিপদের সময় তাঁর কণ্ঠস্বরে জনগণ উজ্জীবিত হয়েছিল। এটা তাঁর এক বিরাট অবদান। অবশ্য এই কাজটি তখন যে কেউই করতে পারতেন। কিন্তু ভাগ্যবান বলে তিনি এটা করেছিলেন। তাঁর সেই ভরাট গলার আহ্বানে বাঙালি জাতির মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়েছিল।

কিন্তু চাকরিজীবনে রাজনীতি বা রাজনৈতিক দর্শনচর্চার সঙ্গে জিয়া সম্পৃক্ত ছিলেন না। ফলে, রাজনীতির দায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে এসে পড়ে, তখন তিনি শিখতে চেষ্টা করেন। এটা শিখতে গিয়ে তিনি ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত নানা ধরনের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তাতে বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদের সমাগম ঘটে। নানা ধরনের লোকের সমাগমের কারণে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনচর্চাটা খুব শক্তভাবে গড়ে ওঠেনি। একটা জগাখিচুড়ি ভাব নিয়ে তিনি বাম-ডান এবং উত্তর-দক্ষিণ সবাইকে এক করে একটা পাঁচমিশালি দল সৃষ্টি করেন। এটা সব সময় রাজনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। যদিও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দর্শনে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির প্রয়াস হাজার বছর ধরে বিদ্যমান। যেহেতু তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাই সেখানে চীনপন্থীসহ সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদেরা তাঁর দলে এসে ভেড়ে। আবার দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীরাও তাঁর দলে এসে যোগ দেন। একই সঙ্গে তাঁদের সমসাময়িক যাঁরা পাকিস্তানপন্থী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরাও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হওয়ার জন্য জিয়ার দুয়ারে এসে উপস্থিত হন। আওয়ামী লীগকে কোণঠাসা করার জন্য বা রাজনীতিতে নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য কিংবা নিজের দল গঠন করার জন্য রাজনৈতিক চোঙাবাজদের সঙ্গে নেওয়ার চিন্তা থেকেই হোক জিয়া তাঁদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। যেটা তাঁর জন্য একটা মারাত্মক ভুল ছিল বলে আমি মনে করি। তাঁর জন্য এই কাজটি করার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তিনি সম্পূর্ণ নতুনভাবে তরুণ প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করতে পারতেন। প্রথম থেকেই যদি নির্ভেজাল গণতন্ত্রের প্রতি অবিচল আস্থা প্রকাশ করতেন, তাহলে তিনি রাজনৈতিকভাবে আরও বড় ধরনের জোয়ার সৃষ্টি করতে পারতেন। কারণ, তখন রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল একেবারেই খালি। তার পরও যতটুকু তিনি করেছিলেন, সেটা করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সততা, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা দিয়ে এবং রাজনীতিতে প্রচণ্ড এক প্রভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক রাজনীতির যে স্রোত তিনি আনতে

পারতেন, যেই স্রোতে গণতন্ত্রের সব ভিত্তি ও অবকাঠামোগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারত, সে ক্ষেত্রে পাঁচমিশালি রাজনীতির কারণে ব্যর্থ হন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার ক্ষেত্রে যদি তিনি আরও কঠোর হতেন, তাহলে তিনি অমর হয়ে থাকতে পারতেন।

অন্যদিকে ব্যক্তিগতভাবে জিয়ার দেশপ্রেম, সততা, ঐকান্তিকতা ছিল সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে। যদিও কর্নেল তাহেরের বিচার নিয়ে একধরনের বিভ্রান্তি ও ধূম্রজাল রয়েছে। কর্নেল তাহের সেনাবাহিনীর ভেতরে যেভাবে হত্যাযজ্ঞ শুরু করেছিলেন, সেটা ছিল এক ঘৃণ্য অপরাধ। অনেক নিরীহ মানুষকে তাঁর বিপ্লবী সংস্থা হত্যা করেছে। নিহত কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীতে দুর্নীতির কোনো অভিযোগও ছিল না। অন্যদিকে জনগণের মধ্যে কর্নেল তাহেরের কোনো ভিত্তি ছিল না। জাসদের যে গণবাহিনী ছিল, তারা বিভ্রান্তিকর বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠালগ্নে জাসদের এই হঠকারী ভূমিকা গণতন্ত্রকে অনেক দূর পর্যন্ত ধসিয়ে দিয়েছিল। সমাজতন্ত্রেরও সমাধি দিয়ে দিয়েছিল। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে কোনো সমাজতন্ত্র নেই। সমাজতন্ত্র itself scientific organization, সেটা মূলত নির্ভর করছে অর্থনীতির ওপর। এই সব স্লোগান দিয়ে তাঁরা সামন্তবাদ উৎখাত করার একটা স্লোগান দিয়েছেন। বাংলাদেশে কখনো সামন্তবাদ প্রসারিত হয়নি। পঞ্চাশের দশকেই জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল।

তাহেরের কাজটি কোনো মূল্যবোধের পর্যায়ে পড়ে না। এটা কোনো ধরনের রাজনৈতিক দর্শন হতে পারে না। ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাতে তাঁর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা স্লোগান দিয়েছে, 'অফিসারের রক্ত চাই/সুবেদারের ওপরে অফিসার নাই'। অর্থাৎ এটা প্ল্যানটেড কোনো স্লোগান। বিদেশ থেকে আমদানি করা স্লোগান, যাতে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী শক্ত ভিতের ওপর গড়ে উঠতে না পারে। সেনাবাহিনী যদি গড়ে উঠতে না পারে, তাহলে যাঁরা সুবিধাটা নেবেন, তাঁরাই এই কাজটা করিয়েছিলেন। এ কারণেই জিয়া তাঁদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অ্যাকশনে চলে যান। সেনাবাহিনীতে ডিসিপ্লিন বরখেলাপ করে যখনই কেউ কাজ করবে, ডিসিপ্লিন ভঙ্গের যে ধারাগুলো আছে সেটা তার ওপরই বর্তাবে। সুতরাং বিচারে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। কেউ তাঁকে জোর করে মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণেই বিচার। সেটা সংক্ষিপ্ত আকারেও সেনাবাহিনী করতে পারে। কোর্ট মার্শাল যেটা হয়, সেটা বৈধ এবং আইনগতভাবে এটার বৈধতা আছে।

যাহোক, জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হলো। তদন্তের পর জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে বিচার শুরু হলো শুধু মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের বিরুদ্ধে। জিয়া হত্যার জন্য ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হলো। শতাধিক জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে প্রায় বিনা কারণে সেনাবাহিনী থেকে অবসর, বলা যায়, বের করে দেওয়া হলো। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার অপরাধে উচ্চপদস্থ আমরাও তখন কোণঠাসা অবস্থায়। অথচ জেনারেল মঞ্জুর নিজে যখন আত্মসমর্পণ করলেন, তখন তাঁকে পুলিশ হেফাজত থেকে সেনা হেফাজতে এনে হত্যা করা হলো। আজ পর্যন্ত তারও কোনো বিচার হয়নি। সেনাপ্রধান এরশাদ এটাকে অত্যন্ত কৌশলে ধামাচাপা দেন এবং ১৩ জন মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে ফাঁসি দিয়ে ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ ক্ষমতা দখল করেন। আমরা কয়েকজন এর প্রতিবাদ করেছিলাম। এ কারণে সেনাপ্রধান ও মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এরশাদের নির্দেশে আমাকে সেনাবাহিনী থেকে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

এরশাদ ১৯৭৪ সালে ভারতে গিয়েছিলেন এনডিসি কোর্স করতে। সেখানে থাকাবস্থায় তিনি দুবার পদোন্নতি পেয়ে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশে ফেরত আসেন ১৯৭৫ সালের শেষ দিকে। ১৯৭৪ সাল থেকেই তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগী পাকিস্তানি স্টাইলে 'ক্যু' করার মতলব এঁটে আসছিলেন। এ জন্য খুব নীরবে তাঁরা সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদ দখল করছিলেন। পাকিস্তানের সেনাশাসক আইয়ুব খান ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত যেভাবে নিজ বলয়ের সেনা কর্মকর্তাদের একের পর এক নানা ধরনের কোর্স বা ট্রেনিং করিয়ে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ-পকেটগুলোতে তাদের পোস্টিং দিয়েছিলেন, তারপর ক্যু করেছিলেন, এরশাদও ঠিক একইভাবে জেনারেল জিয়াকে গুড হিউমারে রেখে তাঁর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণের সব জায়গায় তিনি তাঁর নিজের লোকদের বসান। এরপর জিয়ার বিরুদ্ধে ক্যু সংঘটিত করেন। এই ক্যুয়ের সঙ্গে মঞ্জুর কতটা জড়িত, প্রমাণিত নয়। এরশাদ এ ক্ষেত্রে কৌশলী ভূমিকা রাখেন। আত্মসমর্পণের পর সেনা হেফাজতে মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি বেশ রহস্যজনক। পরবর্তী সময়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অকর্মণ্য ও তাঁর ক্যাবিনেটকে অযোগ্য ঘোষণা করে এরশাদ মার্শাল ল ঘোষণা করেন। মেজর জেনারেল মান্নাফ, মেজর জেনারেল আবদুস সামাদ, আমিসহ আরও কয়েকজন এর প্রতিবাদ করেছিলাম। তিনি তা মানেননি।

মূলত এরশাদই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে সামরিক আইনের মাধ্যমে দেশ শাসন করেছিলেন। এর আগ পর্যন্ত সামরিক আইনের মাধ্যমে কেউ দেশ শাসন করেননি। জিয়া সামরিক আইন জারি করেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাক ক্ষমতায় এসে সামরিক আইন জারি করেন। জিয়া তাঁর অধীনে ছিলেন। পরে তিনি সায়েমের অধীনে ছিলেন। পরে যদিও জিয়া প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হয়েছেন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি নিজে কোনো ফরমান জারি করেননি। খালেদ মোশাররফও কোনো সামরিক ফরমান জারি করেননি। এরশাদ প্রথম থেকেই সামরিক ফরমান জারি করে দেশ শাসন করেন। জিয়া দ্রুত সামরিক আইন প্রত্যাহার করে গণতন্ত্রে ফিরে গিয়েছিলেন। আর এরশাদ এই দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে নষ্ট করেছেন। টাকাপয়সার বিনিময়ে প্রকল্প গ্রহণ ও নীতিনির্ধারণ এরশাদের আমলেই শুরু হয়। তিনি ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দেওয়ার নামে রীতিমতো অঙ্ক কষে পয়সা খেতে শুরু করেন। রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী থেকে শুরু করে বেসামরিক-সামরিক প্রশাসনের সকল স্তরের বেশির ভাগই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেটা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। এ থেকে আমরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি। তবে এরশাদ অনেক অপকর্মের পরও দৃশ্যমান অবকাঠামোর কাজগুলো ভালোভাবেই করেছিলেন। যার জন্য লোকে এখনো তাঁর কথা মনে রেখেছে।

সেনাপ্রধান এরশাদ ক্ষমতা দখল করার কয়েক মাস পর ১৯৮২ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়। আমি সেখানে কয়েক বছর যুগ্ম সচিব হিসেবে কাজ করি। ১৯৮৬ সালের ১৫ মার্চ আমি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিযুক্ত হই। ১৯৮৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। এখানে থাকাকালে এরশাদ আমাকে প্রস্তাব দিলেন ট্রাস্টের সম্পত্তি হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে বিক্রি বা লিজ দিতে। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বচসা হয়। আমি তাঁকে বলি, এটা সরকারি সম্পত্তি। আই ক্যান নট ডিল ইট। তা ছাড়া এটা দেবোত্তর সম্পত্তি। এমন সম্পত্তি আল্লাহও নিতে পারেন না। আপনার আত্মীয়কে এই সম্পত্তি কী করে দেব! এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে বেশ উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। এ ঘটনার কিছুদিন পর সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে আমি যাই এবং বক্তৃতার একপর্যায়ে এরশাদকে উদ্দেশ করে বললাম, মুক্তিযোদ্ধাদের যদি প্রমোশন না দেওয়া হয়, তাহলে তো এটা ভারতের খড়ম

রাজ্য বা রামরাজত্ব করার মতোই হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধার নাম নিয়ে আপনি বলছেন, তাঁরা দেশ স্বাধীন করেছে, তাঁরা সূর্যসন্তান। আবার যখন চাকরিতে তাঁরা যাচ্ছেন, তখন তাঁদের হেয় করা হচ্ছে, তাঁদের বের করে দেওয়া হচ্ছে।

সিভিল সার্ভিস একাডেমিতে এই কথা বলায় এরশাদ মৌখিকভাবে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চাকরি থেকে ডিসমিসড করেন। কিন্তু চাকরিচ্যুতির লিখিত আদেশ জারি হয়নি। ফলে, আমি মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বহাল থাকি। এরপর আমি ট্রাস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিয়াসহ ছয়জনের ছবিসংবলিত একটি ক্যালেন্ডার বের করি। এ ছাড়া ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গাওয়া গানগুলো ১৯৮৭ সালে পুনরায় রেকর্ড করে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করি। অ্যালবামের নাম ছিল *মোরা একটি ফুলকে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি*। এ কারণে তিনি আবার আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে আর্মি হেডকোয়ার্টারকে লেখেন। আমার সৌভাগ্য বলতে হয়, আর্মি হেডকোয়ার্টার তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় আদেশ কোনোটাই মানেনি। যার জন্য তিনি আমাকে চাকরি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন।

১৯৮৯ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আমাকে বাংলাদেশ টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে বদলি করা হয়। তখন এর প্রধান কার্যালয় ছিল চট্টগ্রামে। পরে প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বাংলাদেশ টি বোর্ডে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পর থেকে দেখতে পেলাম এরশাদের বিরুদ্ধে মধ্যম স্তরের সেনা কর্মকর্তারা ক্রমশ সোচ্চার হচ্ছেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তখন সেনাবাহিনীর ৪৬ ব্রিগেডে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সালাম। তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। তিনিও আমার কাছ থেকে কয়েকবার মতামত নেন। এরশাদের কর্মকাণ্ডের একটা মূল্যায়নও তিনি চান। পরে সালাম (পরবর্তী সময়ে পদোন্নতি পেয়ে মেজর জেনারেল এবং সিজিএস নিযুক্ত হন) চিফ অব জেনারেল স্টাফের দপ্তরে ছিলেন। তখন মেজর জেনারেল নূরউদ্দীন চিফ অব জেনারেল স্টাফ ছিলেন। নূরউদ্দীনও ১৯৭৪ থেকে এরশাদের সঙ্গে নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালের নভেম্বরে এরশাদ নূরউদ্দীনকে সেনাপ্রধান করেন।

১৯৯০ সালের ২৭ নভেম্বর ডা. মিলন হত্যার পর সেনাবাহিনীতে নানা ঘটনা ঘটতে থাকে। মধ্যম স্তরের সেনা কর্মকর্তারা প্রকাশ্যে মেজর জেনারেল সালামের মাধ্যমে এরশাদকে জানিয়ে দেন যে সেনাবাহিনী তাঁকে আর সমর্থন দিতে পারবে না। যদি তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকতে চান, তাহলে সমস্যাগুলো তাঁকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করতে হবে। সেনাবাহিনী

এরপর রমনা পার্কে অবস্থান নেয় এবং আইএস ডিউটি (শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশকে সহায়তা করা) থেকে বিরত থাকে। এদিকে এরশাদ চেষ্টা করছিলেন সামরিক আইন জারির। কিন্তু তাঁকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, সামরিক আইন জারি করা হলে সেটা তারা বাস্তবায়ন করবে না। ২ ডিসেম্বর রাত একটা-দুইটার দিকে আমাকে ডেকে পাঠানো হয় আর্মি হেডকোয়ার্টারে। তখন আমি সেখানে যাই এবং বুঝতে পারি, সেনাসদর এরশাদের বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত করার চেষ্টা করছে। সারা রাত সেখানে আলোচনা হয়। সকালবেলা আমি আমার বন্ধু মেজর জেনারেল মতিনকে (আবদুল মতিন) বলে আসি যে তিনি যেন এরশাদের পক্ষে কোনো রকম অবস্থান না নেন। ৪ ডিসেম্বর রাতে এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দেন। ওই দিন গভীর রাতে সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরউদ্দীন আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর কাছে যাই। তিনি আমাকে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার কাছ থেকে দুটো বিবৃতি (স্টেটমেন্ট) নিয়ে আসতে বলেন বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারের জন্য। তখন সংবাদপত্রে ধর্মঘট চলছিল। নূরউদ্দীনের নির্দেশে আমি শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার খোঁজ করতে থাকি। শেখ হাসিনা তাঁর বিবৃতি দেন। কিন্তু খালেদা জিয়াকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পরদিন সকালবেলা আমি সাইদ ইস্কান্দারের মাধ্যমে খালেদা জিয়ার কাছ থেকে বিবৃতি সংগ্রহ করি। সেটি রেডিও ও টিভিতে প্রচারিত হয়।

এরশাদকে পদত্যাগ করাতে মেজর জেনারেল সালাম অত্যন্ত শক্তভাবে সচেষ্ট ছিলেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তাঁর যে অবদান, তা অভূতপূর্ব। তিনি ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডারসহ তরুণ অফিসারদের মোটিভেট করে তাঁর দিকে রেখেছিলেন। এটা তাঁর একক প্রচেষ্টার ফলে হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর এই অবদানের মূল্যায়ন করা হয়নি।

৪ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েও ক্ষমতা নিজের আয়ত্তে রাখার জন্য নতুন একটি চাল চালেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমদের মাধ্যমে সেনাপ্রধান নূরউদ্দীনকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন সামরিক আইন জারি করার। তারপর মওদুদ প্রেসিডেন্ট হবেন আর নূরউদ্দীন হবেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। কিন্তু সেনাসদর এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। ফলে মওদুদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর আগে এরশাদ মেজর জেনারেল সালামকে বলেছিলেন, 'তোমরা তাহলে অ্যাসেমব্লি ডাকো, আমি বক্তব্য দেব।' সালাম বলেছিলেন, 'স্যার, এটা আর সম্ভব নয়। আপনি ভাইস প্রেসিডেন্টের কাছে

ক্ষমতা হ্যান্ডওভার করেন।' মওদুদ আহমদের পদত্যাগের পর রাজনৈতিক নেতাদের সম্মতিতে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করে এরশাদ তাঁর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। প্রথমে অবশ্য রাজনীতিকদের পক্ষ থেকে এ কে খন্দকারের (এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আবদুল করিম খন্দকার বীর উত্তম) নাম বলা হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিএনপি তাঁর ব্যাপারে আপত্তি জানায়।

সাহাবুদ্দীন আহমদের একটা কাজ সঠিক হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে। সেটা হলো, প্রধান বিচারপতি থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর আবার সংবিধান পরিবর্তন করে প্রধান বিচারপতির পদে ফিরে যাওয়া। এটা আমার কাছে শুধু দৃষ্টিকটু নয়, আইনগতভাবে বৈধ বলে মনে হয়নি। প্রেসিডেন্ট প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন। তিনি কীভাবে আবার প্রধান বিচারপতি হন? বাংলাদেশে সবই সম্ভব! তাঁর মতো একজন প্রধান বিচারপতির এই কাজটা করা উচিত হয়নি বলে আমি মনে করি।

এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আমি তখনো বাংলাদেশ টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলাম।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনার প্রয়োজন, তা করতে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন অনেক চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই নির্বাচন করেন। বিএনপি নির্বাচনে জয়ী হয়। বিএনপির নেত্রী খালেদা জিয়া প্রথমবার যেভাবে দেশ পরিচালনা করেছিলেন, তাতে বলা যায়, বাংলাদেশে পুনরায় গণতন্ত্রের শুরুটা কোনোক্রমেই খারাপ ছিল না। ভালোই ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি আবার ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কারসাজির চেষ্টা করলেন। এটা করতে গিয়ে তিনি তাঁর ভোট হারালেন। এটা না করলে আবার তিনি ক্ষমতায় আসতে পারতেন।

যাহোক, ১৯৯২ সালের ৯ জুন আমাকে সেনাবাহিনীতে প্রভোস্ট মার্শাল হিসেবে নিযুক্ত করা হয় আর্মি হেডকোয়ার্টারে। একই বছর অক্টোবর মাস থেকে আমি অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত হই। তখন আমার ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক ছিল বলে ভারপ্রাপ্ত অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে কাজ করে যাই।

ওই বছর ১৫ ডিসেম্বর প্রথমবারের মতো মুক্তিযুদ্ধে বীর খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের আনুষ্ঠানিকভাবে পদক দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশিত হলেও তাঁদের পদক দেওয়া হয়নি। পদক বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিচালনার দায়িত্ব আমার ওপর

অর্পিত হয়। সুষ্ঠভাবে আমি এই দায়িত্ব পালন করি।

পরদিন ১৬ ডিসেম্বর আমি মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি পাই। অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল ১০টি ক্যাডেট কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন, সেনা কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান ও সেনাবাহিনীর সার্বিক প্রশাসনিক বিষয় দেখা।

আমি অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তার স্বীকৃতিস্বরূপ জার্মানির অর্থোপেডিক সার্জন ও এনটিওর প্রতিষ্ঠাতা ড. আর জে গাস্টকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করি। ১৯৯৩ সালে ইউএন-এর অধীনে কুয়েতে শান্তিরক্ষা মিশনে বড় আকারের মিলিটারি কনটিনজেন্ট পাঠানোর জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রতিনিধিদল নিয়ে কুয়েতে যাই।

এ ছাড়া ঢাকা সিএমএইচ-এর মাস্টার প্ল্যান তৈরি এবং সেনা কল্যাণ সংস্থার অধীনে মংলায় এসকেএস সিমেন্ট ফ্যাক্টরি চালু ও ট্রাস্ট ব্যাংক গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করি। ১৯৯৯ সালে ট্রাস্ট ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়। একটি পাঁচ তারা হোটেল নির্মাণের উদ্যোগও তখন নেওয়া হয়। এ জন্য জেভি ফাইভ স্টার হোটেল হলিডে ইনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান র‍্যাডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেল নির্মিত হয়েছে। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনাও তখন নেওয়া হয়। ১৯৯৯ সালে এটি চালু হয়।

১৯৯৫ সালের ১৯ জুলাই আমাকে ওমানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ২০০০ সালের ৩১ ডিসেম্বর আমি সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিই। ওমানে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনকালে আমি রাজধানী মাস্কটে থাকতাম। সেখানে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি বিভিন্ন জেলায় কর্মরত ছিলেন। তাঁদের অনেকে সপরিবারে থাকতেন। বাংলাদেশি যাঁরা পরিবার নিয়ে থাকতেন, তাঁরা প্রায় সবাই তাঁদের সন্তানদের ভারতীয় স্কুলে পাঠাতেন। ভারতীয় স্কুল খুব ভালো করছিল। একদিন বাংলাদেশি একটি ছাত্রীকে আমি সেন্ট মার্টিনের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলে ঠিক উত্তরটা সে জানে না। তবে এটা ভারতের কোথাও হতে পারে। এ ঘটনার পর আমি উপলব্ধি করলাম যে বাংলাদেশের একটি স্কুল হওয়া খুব জরুরি। বহু চেষ্টায় ওমানে বাংলাদেশ স্কুল মাস্কাট নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। পরবর্তী সময়ে অন্য তিনটি শহরেও বাংলাদেশ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। সেগুলো হলো বাংলাদেশ স্কুল সোহার, বাংলাদেশ স্কুল সাহাম ও বাংলাদেশ স্কুল জালান-বু-আলী।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ স্কুল মাস্কাট থেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ২০১১ সালে

'ও' লেভেল পরীক্ষায় এবং ২০১৩ সালে 'এ' লেভেল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ মার্ক পায়। বর্তমানে এই স্কুলটি খুব ভালো চলছে এবং মাস্কাটে একটি উঁচু মানের স্কুল হিসেবে গণ্য করা হয়। স্কুলের সব শাখা মিলে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তিনবার সাফ গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবারই সাফ গেমসে ডিসপ্লের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। এই দায়িত্ব পালন আমার জীবনে উল্লেখযোগ্য এক ঘটনা। এটা করার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭০ হাজার ছেলেমেয়েকে আনা হয়। তারা ড্যান্স করেছে স্টেডিয়ামের ভেতরে। সাঁওতালদের এনে ইলা মিত্রের ওপর ড্রামাটাইজ একটা ইভেন্ট করেছি ঢাকা স্টেডিয়ামে। সাড়ে সাত শ সাঁওতাল এবং সাড়ে তিন শ বাঙালি ছেলেমেয়েকে এনে ইলা মিত্রের কাহিনিটা আমরা গড়ে তুলে তাঁর প্রতিচ্ছবি প্রতিস্থাপন করেছি ২০১০ সালের সাফ গেমসে। সেটা আমার একটা উল্লেখযোগ্য কাজ। কারণ, সেখানে অর্কেস্ট্রাশন আছে, মিউজিক আছে, প্রি-রেকর্ডেড মিউজিক আছে। এসব কিছুর সঙ্গে কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে বিষয়টিকে অন্তরঙ্গভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আমি ওমানের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হওয়ার প্রায় এক বছর পর ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। শেখ হাসিনাও প্রথম দিকে খুব ভালোভাবেই দেশ চালিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মেয়াদে এসে ওই ধারা আর অব্যাহত রাখতে পারেননি। দলীয়করণ, আত্মীয়করণ, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, হিংসা, লোভ-লালসা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। রাজনীতি করার জন্য টাকাপয়সার প্রয়োজন। নির্বাচন অথবা জনগণের কল্যাণ, যা-ই বলি না কেন, সব ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ জোগাড় করতে হবে বিধিবদ্ধ আইন মেনে এবং সহনশীল অবস্থায় থেকে। ক্ষমতার জোরে আইনকানুনকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে রাস্তাঘাটের গুন্ডার মতো টাকা বানানোর যে প্রচেষ্টা, তা থেকে কোনো রাজনৈতিক দলই বিরত থাকতে পারেনি। এটা দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, রাজনীতির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য কখনোই মঙ্গল নিয়ে আসতে পারে না। বরং ভোগান্তি বাড়াবে। গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে, কিন্তু জনগণের ভোগান্তি ও কষ্ট বেড়েই চলেছে। ফলে, জনগণ এই ব্যবস্থার প্রতি অতিষ্ঠ এবং সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বকে একটা পরিকল্পিত, সুষ্ঠু ও সুন্দর দিকনির্দেশনার মাধ্যমে, দর্শন ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে, রুল অব বিজনেস,

অর্থাৎ করপোরেট বডি যেভাবে পরিচালিত হয়, ঠিক সেভাবেই শক্ত হাতে আইনকে প্রাধান্য দিয়ে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দিতে হবে। সংসদকে সমস্ত বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু করে সমস্ত নীতিনির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে মন্ত্রিপরিষদকে করপোরেট বডি হিসেবে রেখে দেশ পরিচালিত হলে এবং ভিন্ন মতামত ও মতবাদকে যদি সহনশীল মনোভাব নিয়ে সহ্য করা হতো, তাহলে বিবর্তনের মাধ্যমে রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন আসতে পারত। প্রধানমন্ত্রী হবেন সমন্বয়ক। তাহলে দেশ থেকে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি দূর হতো। এই কাজটি প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলই করতে পারত। কিন্তু তা না করে দুই দলের প্রধান দুজনই ব্যক্তিগত রেষারেষি, ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য, ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে গিয়ে দুজনেই দলকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। রাজনীতিকে কলুষমুক্ত ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন থেকে বের করে আনার পথ প্রায় রুদ্ধ করে দিয়েছেন। বিবর্তনের ধারা বন্ধ হয়ে গেলে বিপ্লব আসন্ন হয়ে পড়ে। আমার মনে হয়, বর্তমান রাজনীতিকেরা এ কথা ভুলে গেছেন।

পরিশিষ্ট ১

Personal

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ
সরকার

16 Nov 71

My dear Amin,

Do forgive my delay in replying your application of 14 Oct 71 which I received after return from visits to different areas.

I have asked for your articles and am also arranging for payment of patients — may do it myself soon.

How are you and Khalid?

Hoping to see you all soon and well on your way to recovery.

Yours sincerely

Osmany

লেখককে লেখা মুক্তিবাহিনীর প্রধান এম এ জি ওসমানীর চিঠি।

পরিশিষ্ট ২

Comilla
17 Feb

My dear Amin,

My regards & love for all of you. Many thanks for your kind letter dt 3 Jan received here two days ago. I am confident that you have fully recovered by now. May God bless you all. I am sure that you will enjoy every bit of your stay in East Germany.

By the grace of God we are well. Things are shaping well with the usual jerks and jolts. I have not yet decided my future.

Everybody else here are doing fine. Please let us know if we could do something for you or for your family. It will be a great pleasure.

Please do write whenever you have time. That's for the day. Wishing you all a very fine stay in E Germany.

Yours Sincerely
Rahman

Pl do not mind for slipping Shamshers letter in your envelope. Pl give my love to other bros.

লেখককে লেখা জিয়াউর রহমানের চিঠি। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২